পূর্ব বাঙলার গণআন্দোলন ও শেখ মুজিব

ইন্দু সাহা

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার ০ ঢাকা

প্রথম সংস্করণ

২০শে মার্চ, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
কাদির খান
নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার
ঢাকা—১

মুদ্রণে ঃ
এম. আলম
ইডেন প্রেস
৪২/এ, হাটখোলা রোড,
ঢাকা—৩

পূর্ব বাঙলার গণআন্দোলন ও শেখ মুজিব

যাঁরা ইয়াহিয়ার, যাঁরা ইন্দিরার ও শেখ মুজিবের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ॥

"জানি
রক্তের
পিছনে
ডাকবে
সুখের
বান"

বাঙলাদেশে প্রকাশিত লেখকের কয়েকটি বই

গঙ্গাপারের খেয়া

কিষাণ বউ

ঝড় আসছে

কনভয়

স্ফুলিঙ্গের আলিঙ্গন

মরিয়ম আমাকে অভিশাপ দাও

বেকার নিকেতন

বাস্তুত্যাগ

লেখকের কথা

আমার পরিচিত যাদের হাতে এই বই পৌছুবে, তারা হয়তো প্রথমেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠবেন। চমকে উঠবেন এই জন্যে যে, তারা জানেন বিগত যুদ্ধে আমি নিহত হয়েছি। এতদিনও আমি নিহতই ছিলাম। পূর্ববাঙলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা জার্ণালে আমার মৃত্যুর খবর আমি পাঠ করেছি। বিশেষ করে 'বাঙলাদেশ লেখক শিবির' কর্তৃক বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত দেশাত্মবোধক কবিতা সঙ্কলন 'হে স্বদেশ'-এর ভূমিকায় রয়েছে আমি শহীদ হয়েছি। তাতে চারজন কবির শহীদ হওয়ার উল্লেখ আছে, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, শহীদ সাবের, মেহেরুন্নিসা ও আমি। আমার 'ঝড় আসছে' কবিতার বই থেকে একটি কবিতাও তাতে রাখা হয়েছে। অথচ সব চাইতে বিস্ময়ের ঘটনা হচ্ছে—'হে স্বদেশ' কবিতার সঙ্কলনটির সম্পাদক প্রগতিবাদী কবি হুমায়ুন কবির, যিনি আমার শহীদ হওয়ার খবর লিপিবদ্ধ করেছিলেন না জেনে, তিনি ওই সঙ্কলনটি প্রকাশ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ফ্যাসিষ্ট গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হন। এই ভূমিকায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ। তবুও দুঃখ করে বলতে হচ্ছে, আমি শহীদ হয়েও বেঁচে রইলাম, আর তিনি বেঁচে থেকেও শহীদ হলেন। এ এক আশ্চর্য দুঃখময় অনুভূতি। আমি না হয় পাক সেনাদের হাতে শহীদ হয়েছিলাম বলে খবর রটেছিলো; কিন্তু হুমায়ুন কবিরকে কেন জীবন দিতে হলো 'স্বাধীন দেশে'? এরকমভাবে গুপ্তঘাতকদের হাতে আরো অনেক হুমায়ুন কবিরকে জীবন দিতে হয়েছে। আরো প্রচুর হুমায়ুন কবিরকেও জীবন দিতে হবে আগামী দিনে। জহীর রায়হানের মতন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

না, আমার এই বই পেয়ে কারোরই চমকে উঠবার কোনো হেতু নেই। আমি জীবিত রয়েছি এখনো। জীবিত না থাকলে এই বই লিখলাম কি করে। আশ্চর্য, আজ আমাকে ঢাকায় বসে পশ্চিম বাঙলায় বই ছাপিয়ে, তার ভূমিকায় আমার বেঁচে থাকার খবর জানাতে হচ্ছে। সূর্যালোকের জগত থেকে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে অন্ধকারের নক্ষত্র জগতে। আমার পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন থেকেও আজ আমি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। আমি

জানি না তারা ভালো আছেন কিনা। তাতে আমার দুঃখ করার কিছু নেই। আমার দেশ, আমার প্রাণপ্রিয় মেহনতি জনতাই আমার পরিবার-পরিজন-পরমআত্মীয়। এই অনুভূতি-উপলব্ধি নিয়েই তো আমাকে ঘর ছাড়তে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে মা-বাবা, ভাই-বোনদেরকেও। আমার মতো হাজারো তরুণ প্রাণকে আজ তাদের সংসারের সঙ্গে সমস্ত রকমের সম্পর্ক-বন্ধন ছিন্ন করে নিরাপত্তা বিহীন জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলার অবস্থাও উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে সি.পি.আই.এম.এল-এর হাজার হাজার কর্মী ও সি. পি. এম-এর প্রায় চল্লিশ সহস্রাধিক কেডার স্ব-স্ব এলাকা থেকে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডামীর জবরদস্তির মুখে বিতাড়িত। সেই একই দৃশ্য আজ পূর্ববাঙলার বুকে।

বিভিন্ন কারণে পূর্ববাঙলা সম্পর্কে কিছু লেখার তাগিদ অনেকদিন থেকেই অনুভব করছিলাম। লেখাও শুরু করেছিলাম। কিন্তু কঠিন একটা সমস্যায় পড়েছিলাম আমি; তা হলো বই লিখলেও তা কিছুতেই পূর্ববাঙলায় কোনো প্রকাশককে দিয়ে ছেপে বের করা সম্ভব নয়। ছাপার কোনো পরিবেশই এখানে নেই। কারণ একটাই, তা হলো যারা ছাপবেন তাদের জানের ভয়। এসব ভেবেই লেখায় বিরতি টেনেছিলাম; এইরকম সময়েই, আনুমানিক জুন ১৯৭২-এর তৃতীয় সপ্তাহের দিকে কলকাতার নবজাতক প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী মজহারুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে ঢাকায় আমার আলোচনা হয়। আলোচনায় তাঁকে আমি আমার এই বইটির কথা বলি। তিনি উৎসাহিত হয়ে আমার ওই সময় যতটা লেখা হয়েছিলো—তা পড়ে দেখে ছাপতে রাজি হন। পরবর্তীতে তাঁরই উৎসাহে আমি ধীরে ধীরে এই বই লিখে কলকাতার লোক সহবতে পাঠাতে থাকি। এই বইয়ের ভূমিকা লেখার আগে জানতে পারলাম বই ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; কেবল ভূমিকা লিখে পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছেন মজহারুল ইসলাম সাহেব। জানি না এই ভূমিকা যথাযথভাবে তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছুবে কি না।

আমার বিশ্বাস এতটা দুঃসাধ্য প্রয়াস যখন সম্ভব করে তুলেছেন সুহৃদ মজহারুল ইসলাম সাহেব; পরবর্তীর সামান্য কাজটুকুও তিনি সম্পাদন করতে পারবেন। না, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবো না। তাঁকে বজ্রমুঠ অভিনন্দন আমার।

যেহেতু এই বই পশ্চিমবাঙলায় আত্মপ্রকাশ করছে; সেইহেতু

সেখানকার বামপন্থী প্রগতিশীলদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, এই বইকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাঙলার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যে অপপ্রচার শুরু করবে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে আপনারা নিশ্চয়ই তাতে বিভ্রান্ত হবেন না ; আমি বা পূর্ববাঙলার আমরা আপনাদের নৈতিক সহযোগিতা চাই একান্ত ভাবেই। আমি বা আমরা বিশ্বাস করি, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের বিশ্বাসী সহযোগী হিসেবে আমরা আপনাদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিবিধানের যথাযথ পদক্ষেপ নিশ্চয়ই পাবো।

অনেকের ধারণা হতে পারে, আমি ইয়াহিয়া খানের পক্ষে কথা বলেছি ; আসলে ঘটনা তা নয়। ইয়াহিয়া খান পূর্ববাঙলায় যা করেছে, সমগ্র বিশ্ববাসী তা ভালোভাবেই জানে। এই জন্যেই আমি ইয়াহিয়া খানের অপকীর্তির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার গুরুত্ব খুব কমই দিয়েছি। আমি আলোচনা করতে চেয়েছি কমিউনিষ্ট বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের নেপথ্য দিকটা ; যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হচ্ছে বর্তমান 'বাঙলাদেশ'। তস্কর ইয়াহিয়ার একটাই অপকীর্তি করার ছিলো ; সে তা করেছে এবং মঞ্চ থেকে বিতাড়িতও হয়েছে। তাই ইয়াহিয়া খান আমার আলোচনার মুখ্য ব্যক্তি নয়। আমি শেখ মুজিবকে নিয়ে আলোচনা করেছি ; এবং এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আমার কাছে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে। যেহেতু ইয়াহিয়া খান কি—এটা সবাই জানেন ; কিন্তু সবাই জানেন না শেখ মুজিব কি।

এই বইয়ের উৎসর্গের লেখা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। যেহেতু ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর নাম এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইয়াহিয়া খান যেমন জনগণের ওপরে নির্বিচার আক্রমণ চালিয়েছে, তেমনি ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পরে—ইন্দিরা গান্ধীর সেনাবাহিনীও আক্রমণ চালিয়েছে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের ওপরে। এবং আওয়ামী লীগের মুক্তিবাহিনীর পথনির্দেশে কয়েক হাজার কমিউনিষ্টকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এটা করেছে ইন্দিরা সরকারের নির্দেশেই ; এই জন্যে উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ইন্দিরা গান্ধীর নাম উল্লেখ করেছি ; ঠিক এই একই কারণে শেখ মুজিবের নামটিও এসেছে।

এই বই লেখাকে কেন্দ্র করে অনেকে মন্তব্য করেছেন 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিকোণ থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত হলে ভালো হয় নাকি? কিন্তু আমার বিশ্বাস,

আজকের দুনিয়ায় 'নিরপেক্ষ' থাকার কোনো অবকাশ আছে কি? কোনো কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন হিসেবে 'নিরপেক্ষতা' দাবী করা হলেও সেই 'দাবী' প্রকৃত পর্যায়ে—ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক মননশীলতার যে কোনো একটি নীতির পক্ষপুষ্ট হতে বাধ্য। আজকের পৃথিবীর দুই শিবির। একটি ধনতান্ত্রিক—অপরটি সমাজতান্ত্রিক। পরিষ্কারভাবে যার প্রথমটির চরম বিকাশ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী, দ্বিতীয়টি সুসম অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার, অর্থাৎ সমাজবাদী। এই পযায়ে প্রগতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোশ উন্মোচন করতে গেলে অবশ্যই 'নিরপেক্ষতা'র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না। আমি নিজেও এদিক থেকে 'নিরপেক্ষ' নই। কিন্তু তার অর্থ আবার এই নয় যে, আমি ইতিহাসকে বিকৃত করেছি। আমি যেমনটি দেখেছি, বুঝেছি, উপলব্ধি করেছি; তেমনটিই আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনার কোথাও কোথাও স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্কের ঝড় সৃষ্টি করবে—তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তবে সেই বিতর্কের তথ্য ভিত্তিক যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি নিশ্চয়ই দিতে সক্ষম। কারণ, ইতিহাস যা ঘটে তাই; যা ঘটনাবিহীন 'রটনামাত্র' তা ইতিহাস নয়। আমি সেই ইতিহাসের আলোকেই যে কোনো বিতর্কের সঠিক বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে তুলে ধরতে পারবো। অবশ্য কারো সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধীতার ক্ষেত্রে আমার উত্তর দেয়ার কিছু নেই।

প্রসঙ্গক্রমে আমি আবারও উভয় দেশের প্রগতিশীলদের কাছে আবেদন জানাই—পূর্ববাঙলায় ফ্যাসিবাদের যে অশুভ তৎপরতা চলছে তার বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে প্রগতির প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। এখনো সময় আছে, 'বাঙলাদেশে' ও ভারতে ফ্যাসিবাদের চরম বিকাশকে প্রতিহত করার। এটা সম্ভব একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ দুর্বার লড়াইকে এগিয়ে নেয়ার মধ্যে। 'বাঙলাদেশ' সম্পর্কে এখনো অনেকে গুরুত্বহীনভাবে আলোচনা-সমালোচনা করছেন; কিন্তু 'বাঙলাদেশে' চীন বিরোধী ঘাঁটি ঢাক ঢোল পিটিয়ে তৈরী করা না হলেও প্রকাশ্যে 'কমিউনিষ্ট বিরোধী' বাহিনী তৈরী করা হয়েছে এবং এটা দ্ব্যর্থহীন ভাবেই মনে করতে হবে যে, শেখ মুজিব গভর্ণমেণ্টই হচ্ছে গণচীন বিরোধী ঘাঁটি। শেখ মুজিব "নকশাল দেখামাত্র গুলি করো" এটা বলেছেন কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদেরকে উদ্দেশ্য করেই অর্থাৎ একমাত্র মস্কোপন্থীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য বিপ্লবী কমিউনিষ্টদেরকে কিছুতেই শেখ মুজিব ও তার

ফ্যাসিষ্ট বাহিনী জীবিত রাখতে রাজি নয়। এ ব্যাপারে ভারতের ফ্যাসিষ্ট ইন্দিরা সরকার আজ আর একা নয়, সঙ্গে 'বাঙলাদেশ'কে পেয়েছে। সুতরাং 'বাঙলাদেশে'র অভ্যন্তরেই এখন চলতে থাকবে সমগ্র 'ভারত-বাঙলাদেশ'-এর কমিউনিষ্ট তৎপরতা নির্মূল করার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র।

এই বই-এর পরেও আরো অনেক কিছু 'বাঙলাদেশ' সম্পর্কে আমার বলার রয়েছে। মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে আমি পরবর্তী খণ্ডে অনেক অজানা ও অলিখিত তত্ব ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করবার ইচ্ছে রাখি। যার দ্বারা 'বাঙলাদেশ' ও পশ্চিমবাঙলার বামপন্থীদের অনেক সুফল হতে পারে বলে আশা করি।

আমার ব্যক্তিগত আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তাত্বিক দ্বন্দ্ব কারো কারো ঘটতে পারে; তবুও আজকের এই কমিউনিষ্ট নিধন ষড়যন্ত্রের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হলে, আমার অনুরোধ, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনা না করে গঠনমূলক সমালোচনা করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে এগিয়ে আসতে। আমি বিশ্বাস করি—'ঐক্য-সমালোচনা-ঐক্য' এই নীতিতে। আমি বিশ্বাস করি 'প্রত্যাঘাতই আত্মরক্ষার সব চাইতে ভালো উপায়।' তাই উপসংহারে আমার আবেদন, আত্মরক্ষা করতে হলে প্রগতিশিবিরকে আজ বিপ্লবী চিন্তায় ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে, এই মুহূর্তে বামপন্থী অনৈক্য—হবে আত্মঘাতী প্রয়াস। 'বিপ্লবী কমিউনিষ্ট ঐক্য' স্থাপনে আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা যদি কিছুটাও সহযোগিতায় আসে, তাহলেই আমি কৃতার্থ হবো। পরিশেষে ফ্যাসিবাদের রক্তাক্ত আগ্রাসনের খড়্গের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই সেই সমাগত 'বিপ্লবী ঐক্য ফ্রণ্টকে'।

ঢাকা
১৫ই মার্চ ১৯৭১

ইন্দু সাহা

এক

'শেখ মুজিব আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। আমরা তাকে বিশ্বাস করে সব চাইতে বেশী ভুল করেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম আমরা তার কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবো। কিন্তু এখন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছি, তিনি সহযোগিতার বদলে আমাদের মেরুদণ্ডটাই গুড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ জনগণ বিভ্রান্ত। আমরা প্রকাশ্যে কিছুই বলতে পারছি না। বলার মতো অবস্থাই নেই। কারণ সারা দেশে এখন উগ্র বাঙালী জাতীয়তার বন্যা চলেছে। শেখ মুজিব সেই বন্যার চূড়ামণি। তার বিরুদ্ধে কথা বললে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। বরং আওয়ামী লীগ তার ফ্যাসিবাদী নগ্ন গুণ্ডামী চালাবে আমাদের ওপরে। আয়ুব খানের অত্যাচারের চাইতেও তার রূপ হবে আরো ভয়াবহ। আমরা সময়ের প্রতীক্ষা করছি।'

ওপরের কথাগুলো আমার নয়। তথাকথিত 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার' অন্যতম প্রধান আসামী পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তার এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেছিলেন।

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে সেই আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎকার। ১৯৭১ সনের একুশে ফেব্রুয়ারী। আমি পিলখানা থেকে একুশে ফেব্রুয়ারীর একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁর বাড়িতে এসেছিলাম নির্দ্ধারিত সময়ে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম। সামরিক বাহিনীর অনেক গোপন তথ্য তিনি ফাঁস করে দিয়েছিলেন আমার কাছে। বলেছিলেন, 'না, আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা বালোয়াট ঘটনা হলেও তার নেপথ্যে একটা প্রচণ্ড অস্তিত্ব আছে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সেই অস্তিত্বের সূত্র ধরেই আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার একটা নাটক সাজিয়েছে।'

পাকিস্তান নৌবাহিনীতে বাঙালী অফিসারদের সংখ্যা তুলনামূলক বেশী। কারণ পূর্ববাঙলার মানুষ নদীমাতৃক দেশের আবহাওয়ায় লালিত। জলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শৈশব থেকেই। এমন বাঙালী কমই আছে যে সাঁতার

জানে না। নদী, পুকুর, দীঘির সঙ্গে পরিচয় নেই শারীরিক। পদ্মা-যমুনা-ধলেশ্বরী, মেঘনা, তিতাস, আড়িয়ালখাঁর দেশের অগ্নিময় মুখগুলোয় তাই দারুণ একটা ঋজুতা। জলের সঙ্গে নিবিড়তাও যেমন দস্যুতাও ঠিক তেমন।

পাঞ্জাবী প্রাধান্যে পরিচালিত সামরিক বাহিনীর প্রতিটি বিভাগে অন্যান্য জাতিসত্তাগুলির চাইতে বাঙালীরা প্রথম থেকেই অপেক্ষাকৃত বেশী উপেক্ষিত। সব ক্ষেত্রেই একটা ব্যবধান, একটা পৃথক আচরণ। বিমাতা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী। মর্যাদা নেই। প্রতিবাদ করলে সামরিক ট্রাইবুন্যালের সামনে দাঁড়াতে হয়। এই সব কারনেই নৌবাহিনীর বাঙালীদের মধ্যে ১৯৬৮ সন থেকেই একটা গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যাদের চূড়ান্ত কর্মসূচী হচ্ছে 'স্বাধীন পূর্ব বাঙলা' কায়েম করা।

১৯৫৮ সন থেকেই তারা একটা গোপন ফাণ্ড সৃষ্টি করে। এবং প্রত্যেক মাসে এই গোপন দলের সদস্যরা নিয়মিত সেই ফাণ্ডে তাদের মাইনের নির্দিষ্ট একটি অংশ প্রদান করেছে। গোপন সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে।

মওলানা ভাসানী পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কোনো কোনো নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমরা যোগাযোগ করেছেন। কেউ তাদের স্বাধীন পূর্ববাঙলার সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদীর নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গেও এরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলো। বললেন কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম— "আমরা সি, আই, এ'র এজেণ্ট নই। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবুও মোহাম্মদ তোয়াহা সাহেব আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। আমরা মিলিটারী, আমাদের মাথায় নাকি রাজনীতি নেই। তবে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা মোহাম্মদ তোয়াহার কিছু উপদেশ গ্রহণ করেছি। তিনি জনগণের সঙ্গে আমাদেরকে সম্পর্কিত হওয়ার জন্যে বলেছেন। জনগণের কাছে আমাদের কথা ব্যক্ত করতে বলেছেন। আমরা প্রথম থেকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা' কায়েমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা অত্যন্ত সচেতনভাবেই মনে করি—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চুলচেরা তাত্ত্বিক প্রয়োগ পদ্ধতিতে আমাদের

পাণ্ডিত্য না থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ তেইশ পরিবারের নির্মম শোষণের অবসান ঘটিয়ে কিছুতেই বাঙালী তেইশ পরিবারের জন্ম হতে দেবো না। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছাড়া পূর্ব বাঙলার মেহনতি জনতার প্রকৃত মুক্তি অসম্ভব। কিন্তু জনগণের মধ্যে আমরা সাংগঠনিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেও খুব বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। তার কারণ আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা। আমরা তাই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হই। আমরা কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদীর সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। আমাদের সাংগঠনিক অক্ষমতার জন্যই আমরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমরা মনে করেছিলাম একটা দেশ স্বাধীন করার জন্তে জনগণের সমর্থন প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন সামরিক শক্তি। আমরা সেই শক্তি প্রস্তুত করে ফেলেছিলাম। নির্দ্ধারিত সময়ে আমাদের নৌবাহিনীর বাঙালী অফিসার ও সৈনিকরা অনেকেই (যারা গোপন দলের সদস্য) পূর্ববাঙলায় চলে আসবার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। চলেও এসেছিলাম অনেকেই।'

'শেখ মুজিবর রহমান আমাদের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তিনিই হবেন আমাদের নেতা। তিনিই হবেন স্বাধীন পূর্ববাঙলার নায়ক। কিন্তু আমরা তখন জানতাম না যে, তিনি বিদেশী ক্রীড়নক। বামপন্থীরা তার সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী আঁতাতের কথা বললেও আমরা সঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার পরামর্শ অনুসারেই পরবর্তীতে শেখ মুজিব যোগা-যোগ করে আমাদেরকে বোঝালেন-ভারতের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছাড়া পূর্ববাঙলা স্বাধীন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে না। আমরা প্রতিবাদ করিনি। প্রতিবাদ করার কোনো কথাই আমাদের মনে আসেনি। মাথার মধ্যে একটাই তখন ঝড় 'স্বাধীন পূর্ববাঙলা।' আমাদের মাথা এতবেশী গরম হয়ে উঠেছিলো যে, যে কোনো উপায়েই হোক না কেন—পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্কের অবসান কামনা করছিলাম।'

'বুঝতে পারি নি কতবড় সর্বনাশের পথে আমরা 'মুক্তি'র কথা চিন্তা করছি। বুঝতে পারিনি যাকে আমরা 'মুক্তি' মনে করছি—সেটাই আসলে 'মুক্তি' হত্যার ফাঁদ।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কাঁদ। মোহাম্মদ তোয়াহা খুবই সঠিক বলেছিলেন—আমাদের মিলিটারীদের গরম মাথা। আমাদের মগজে রাজনীতি নেই। শেখ মুজিবের চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে আজ বুঝতে পারছি আমরাই 'মুক্তি' হত্যাকারীর কাছে মুক্তিলাভের জন্যে সমবেত হয়েছিলাম।'

বলছিলেন কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ব্যর্থ ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে। আমি শুনছিলাম। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলাম। কোনো মন্তব্য করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলাম। কেন বিরত ছিলাম—সে কথা পরে আলোচনা করবো। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন যেমন করে বলেছিলেন আমি এখানে তাই লিপিবদ্ধ করছি।

'জানেন চট্টগ্রামের টেকনাফ থেকে দিনাজপুরের তেতুলিয়া যখন ১৯৬৯ সনে প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানে উত্তাল, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান যখন পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছিলো না, মওলানা ভাসানী যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে ঘোষণা করলেন—"মুজিবকে ছেড়ে না দিলে আমি ক্যাণ্টনমেণ্ট ভেঙে তাকে মুক্ত করে আনবো," ঠিক সেই সময়ে আয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকের টোপ গিলে ফেললো শেখ মুজিব। তাও প্যারোলে মুক্তি। মুজিব তাতেই রাজি। সেখানে আমাদের মুক্তির কোনো প্রশ্নই নেই। আমরা মুজিবকে বললাম তুমি কিছুতেই প্যারোলে বাইরে যেতে পারবে না। তুমি আয়ুবকে বলে দাও আগে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা বিনাশর্তে প্রত্যাহার করো, সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দাও, তারপরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো। মুজিব আমাদের কথা শুনবে না কিছুতেই। সে আয়ুবের সঙ্গে আলোচনার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠলো। প্যারোলেই গোল টেবিলে যোগ দেবে। আমরা আরো শক্ত হলাম। সমস্ত বিচারাধীন বন্দীরা জোটবদ্ধ হলাম। চাপ সৃষ্টি করলাম মুজিবের ওপরে।'

'মুজিব বলছে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবো। কিন্তু অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আমরা মুজিবকে তখন পুরো-পুরি চিনে ফেলেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি চেপে ধরলাম তাকে। ভয় দেখালাম, তুমি আমাদেরকে ক্যাণ্টনমেণ্টে ফেলে রেখে বাইরে গেলে—তোমার স্বদেশ প্রেমের সব দলিল আমি দেশের সামনে ফাঁস করে দেবো। এমন কি আমি শারীরিক শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলাম মুজিবের ওপরে। আমাদের ভাই সার্জেণ্ট জহুরুল হককে ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে গুলি করে হত্যা করবার পেছনে যে কারণ, দেশবাসী আজও তা জানে না। আপনারা সাংবাদিক

মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী, লিখুন আপনারা এসব ইতিহাস। আমি আপনাকে সমস্ত দলিল প্রমান এনে দেবো।'

আমার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বলছিলেন কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম 'হ্যাঁ, সি. আই. এ'র যে দলিল ভাসানী ন্যাপ এবং সি. পি. এম. এল-এর নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার বিরুদ্ধে যে সব বাজে কথা সুবিধাবাদী কিছু লোকজন বলছে, লিখছে—তার আসল কারণ পেন্টাগণেরই নতুন চাল। মোহাম্মদ তোয়াহার মতো একজন বিপ্লবী নেতাকে একবার সি. আই. এ-র সঙ্গে সোগসাজশের লাইনে ফেলতে পারলেই বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন অনেকখানি ব্যাহত হবে। পার্টি ভেঙে যাবে। ভেতরে দলাদলি সৃষ্টি হবে। অযথা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ করবে। সংগঠন একটা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।'

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম। মনে মনে বলছিলাম যেন হঠাৎ করে থেমে না যান কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম। যদি তিনি মনে করেন—এসব আমাকে বলা ঠিক নয়, তাহলে তিনি বিরত থাকবেন। কিন্তু থামলেন না। আমি কিছু কিছু কথা নোট করছিলাম ডায়েরীতে। তিনি বললেন—'সি. আই. এ'র ওই দলিলের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং।'

আমি এখানে একটি প্রশ্ন করেছিলাম—সি. আই. এ'র হাতে লেখা ইংরেজি দলিলটি এবং পরে সাইক্লোষ্টাইল কপি আমি পড়েছি। ওই দলিলে ভারতের অন্তর্ভূক্ত আসাম ও পশ্চিম বাঙলা নিয়ে নেয়ার কথা ছিলো তথাকথিত 'স্বাধীন বেঙহাম' এর মধ্যে। শেখ মুজিব যদি ওই দলিলের নায়ক হয়, তাহলে সে ভারতের সঙ্গে যোগসাজশ করবে কেমন করে? ভারতের সঙ্গে মার্কিনী আঁতাত থাকলেও সে কি আসাম ও পশ্চিমবাঙলা ছেড়ে দেবে 'বেঙহাম' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য?

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম বললেন—'আমি রাজনীতিবিদ নই। তবুও বলছি—শেখ মুজিবের কোনো আদর্শের বালাই নেই। সে ক্ষমতার লোভী। এবং আমেরিকার একনিষ্ঠ সেবাদাস। যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে শেখ মুজিব তার প্রভুকে খুশী করার জন্যেই নীরব ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো ভয়ংকর একটা ষড়যন্ত্রকে সফল করে তোলা। পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করে—গণচীনের বিরুদ্ধে পাক ভারত যৌথ সামরিক শক্তি গড়া।

কিন্তু সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরে আমেরিকা ৬ দফার ফাঁদ পাতে। উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের আগ্রাসনে জনতাকে বিপথগামী করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানকে সহসা চীন বিরোধী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয় দেখে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে আমেরিকা বদ্ধ পরিকর হয়। এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক প্রভাব বিস্তারের জন্যে ও চীনকে দুর্বল করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত এই ৬ দফার পেছনে গোপনে মদত যোগাতে থাকে।'

'আমেরিকা এক রকম মরীয়া হয়েই কাজে নেমেছিলো। এবং মুজিবকে একমাত্র বিশ্বাসী বলে তারা কোটি কোটি টাকা জুগিয়ে বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে মুজিবকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে দিয়েছিলো। ভারতও এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের পেছনে পরোক্ষভাবে খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে এসেছে। বর্তমানে আমেরিকার দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের জন্যেই শেখ মুজিব ভারত প্রেমিক সেজেছে। ভারতের প্রচারের ধারাতেই আমার কথার প্রমান পাবেন, এক কথায় বলা যায়, শেখ মুজিব আমেরিকার তৈরী একটি পুতুল মাত্র। আমেরিকা যেমন করে নাচতে বলে—সে তেমনি করে নাচে। পেন্টাগন চাইছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পূর্ববাঙলায় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তীব্রতর হামলা চালাতে। মুল লক্ষ্যস্থল হচ্ছে কমিউনিষ্ট চীন। আর কমিউনিষ্ট ঠ্যাঙানোর সুযোগ্য নেতৃত্ব যে দিতে পারে সে একটিমাত্র ব্যক্তি—'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমান।'

'পূর্ব বাঙলায় বামপন্থীদের আরো সচেতন আরো সতর্ক হয়ে কাজ করা দরকার। পরস্পরে কাদা ছোড়াছুড়ি ছেড়ে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখন সব থেকে বেশী প্রয়োজন।'

'১৯৬৫ সনে বামপন্থীরা বেশী ঐক্যবদ্ধ ছিলো বলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিলো। নইলে চীন বিরোধী যুদ্ধজোটে পাকিস্তানকে অবশ্যই ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে হতো। পারেনি বামপন্থীদের দৃঢ়তর সাংগঠনিক তৎপরতার জন্যেই। আমেরিকা সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। এখন সে নতুন পথে, নতুন কৌশলে এগুচ্ছে। শেখ মুজিব প্রস্তুত। নির্বাচনে পূর্ববাঙলায় এককভাবে জয়লাভ করে ইতিমধ্যেই তারা তাদের ফ্যাসিবাদী ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছে।'

'একটা কথা দেশবাসী জানে না যে, নির্বাচনী অভিযানে শেখ মুজিব লক্ষ

লক্ষ টাকা কোথায় পেয়েছে। আমার মনে হয় সারা ভারতবর্ষে এককভাবে কোনো দল আজ পর্যন্ত কোনো নির্বাচনী প্রচারে এত অর্থ ব্যয় করেনি। এত ঢাক-ঢোল মারপিটও হয়নি। এর পেছনে কার হাত ছিলো? কারা মঞ্চের নেপথ্যে বসে সুতো ধরে পুতুল নাচিয়েছে? জানেন কি—আমেরিকার তেরো কোটি টাকার একটা অঙ্ক পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কে ছিলো। নির্বাচনের আগে এই টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে নিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু কিসের জন্যে হঠাৎ করে এত টাকা তুলে নিলো আমেরিকা? বামপন্থী মহলের কেউ কেউ পল্টনের জনসভায় প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তুলেছে—তেরো কোটি টাকা কি করেছে আমেরিকা? দানছত্র করেছে? না, ফ্যাসিবাদের হাতকে সুদৃঢ় করার পেছনে, পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন, তথাকথিত স্বাধীন করার জন্যে এই টাকাটা ব্যয়িত হয়েছে? নির্বাচনের পূর্বে ও পরে আওয়ামী লীগের তথাকথিত স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীর লাঠির মিছিল এবং কমিউনিষ্ট বিরোধী শ্লোগান থেকে কি পরিষ্কার বোঝা যায়নি—এই 'স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্য কি? শেখ মুজিব প্রকাশ্যেই কমিউনিষ্টদেরকে 'লাল শেয়াল' বলে গালি দিয়ে এদেশ থেকে তাঁদেরকে সমূলে নির্মূল করার হুমকি দিয়েছে। এলাকায় এলাকায় বিপ্লবী বামপন্থীদের নাম তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় 'স্বেচ্ছাসেবক' 'লাল বাহিনী'র কমাণ্ডারদের হাতে গোপনে গোপনে অস্ত্র পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। ক্ষমতায় যাওয়ার পরেই ইন্দোনেশীয়ার কায়দায় কমিউনিষ্ট নিধনযজ্ঞ শুরু করার পরিকল্পনা এবং তার নক্শা পর্যন্ত হয়ে রয়েছে।'

'ইয়াহিয়া খান প্রকাশ্যে জনসভা করার অনুমতি দেয়ার পরে—উগ্রধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক জামাতে ইসলামের পল্টনের মিটিঙে এই 'স্বেচ্ছাসেবক' নামধারীরা যে সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করেছে—এবং রক্ত ঝরিয়েছে—সেটা ছিলো বখ্রার লড়াই। মার্কিনী প্রভুকে তার দুই বিশ্বস্ত এজেন্ট ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছে। জানেন তো, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার—বিশ্বে তাদের দু'টো ফ্রন্ট হাতে রেখেছে। একটি ইন্দোনেশিয়ার নাসুসান—সুহার্তো চক্রের মতো উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ফ্রন্ট, অন্যটি অন্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদী মুসোলিনী, হিটলার তেজোচক্রের ফ্যাসিবাদী ফ্রন্ট। এদেশে নাসুসান সুহার্তো চক্রের প্রতিবিম্ব হচ্ছে মওলানা আবুল আলা মওদুদী ও অধ্যাপক গোলাম আজম, আর মুসোলিনী, হিটলার, তেজো চক্রের প্রতিবিম্ব হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমান।'

'মার্কিনী প্রভু বুঝতে পেরেছে পল্টনের জনসভায় আওয়ামী লীগের সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণে বিধ্বস্ত সশস্ত্র জামাতে ইসলামীর পাণ্ডারা কমিউনিষ্ট ঠ্যাঙানোর মতো শক্তি রাখে না। একমাত্র কিছুদিন টিকে থাকতে পারে শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ। সুতরাং মদত জোগাতে হলে আওয়ামী লীগকেই যোগাতে হবে। আমেরিকা পুরোপুরি ভাবে তার সি. আই. একে উগ্রজাতীয়তাবাদের স্রোতকে উত্তাল তরঙ্গে রূপ দেয়ার কাজে নিয়োজিত করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মার খেয়েছে জামাতে ইসলাম। এছাড়া আমেরিকা পরিষ্কার জানে যে, জামাতে ইসলাম তার বিশ্বস্ত সেবাদাস হলেও পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ তাদের দিয়ে অসম্ভব। প্রথম কথা, এদের পেছনে গণ সমর্থন নেই। দ্বিতীয় কথা, এরা কিছুতেই ভারতের সঙ্গে আঁতাত করতে রাজি হবে না। অথচ পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সব থেকে বেশী প্রয়োজন। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার পুরোনো সেবাদাস শেখ মুজিবকেই মদত দিতে থাকে।'

'ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট হত্যা যজ্ঞের নরখাদক জহ্লাদ মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ড এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। আমেরিকা খুবই সঠিক সময়ে ওই নরখাদকটাকে এদেশে পাঠিয়েছে। এবং সেই নরখাদকটার সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানের কয়েকদফা রুদ্ধদ্বার কক্ষ বৈঠক হয়েছে। তার সব কথা না জানলেও এইটুকু জানি যে, মুজিবকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে। আরো একজন মার্কিন জেনারেল গোপনে নয়াদিল্লী থেকে ঢাকায় এসেছিলো বলে জানা গেছে। পাকিস্তান সরকারও একথা জানে। সেই জেনারেলের সঙ্গে বরিশালের নিভৃত অঞ্চলে দেখা করেছে শেখ মুজিব। অথচ প্রচার করা হয়েছে—এই দু'দিন শেখ মুজিব অসুস্থতার জন্যে কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেনি।'

'ষড়যন্ত্র হচ্ছে চারদিকে। আর এ ষড়যন্ত্র বামপন্থী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে। শেখ মুজিব ক্ষমতায় গেলেই এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ভারত এতদিন এই মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষা করে রয়েছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এবং কেন্দ্রের সরকার গঠন নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্নে যে বাদানুবাদ চলেছে—তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় ফারল্যাণ্ড তার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র সফল করতে পারবে।'

'বলছিলাম ভারত এই মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে। পেছনে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এবং আমেরিকা বিশ্বজনমতকে ধোকা দেবার জন্যে প্রকাশ্যে পাকিস্তান সরকারের বন্ধুর মুখোশ পরে থাকলেও নেপথ্যে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হচ্ছে পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা। পাকিস্তান সরকারের চীনঘেষা নীতি থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। কারণ পূর্ব-বাঙলা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপরে প্রচণ্ড চাপ আসবে। আর পাকিস্তান সরকার তখন বাধ্য হবে তার ব্যাপক বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে। অর্থাৎ আমেরিকার কাছে দাসখৎ লিখে দিতে বাধ্য হবে পাকিস্তান। সরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে চীনঘেষা নীতি থেকে। ভারতও তাই চেয়েছে। পূর্ববাঙলা ভারত দ্বারা সামরিক ভাবে তিন দিক থেকে অবরুদ্ধ। অন্য দিকে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিম পাকিস্তান একলা হয়ে পড়লে ভারত অনেকখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। পূর্ববাঙলার বুকে অবাধ বাণিজ্যিক নিপীড়ন চালাতে পারবে। আর গণ চীনের প্রভাবযুক্ত পূর্ববাঙলার বুকে আসন্ন সর্বহারা বিপ্লবকেও নির্মূল করা যাবে। ভারতও তাই শেখ মুজিবকে তাদের বন্ধু বলে মদত দিয়ে আসছে।'

'আমরা 'স্বাধীন পূর্ব বাঙলা' চাই, কিন্তু তার বিনিময়ে কোনো আন্ত-র্জাতিক ষড়যন্ত্রের স্বীকার হতে চাই না। ভারত, সোভিয়েত কিম্বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—আমরা কারোরই দাসত্ব চাই না। আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক চাই—দাসত্বের সম্পর্ক নয়।'

'আমি আপনাকে কিছু গোপন বিদেশী দলিল এবং তথ্য দেবো। দেশের স্বার্থে সেগুলো আপনারা নির্ভীক সাংবাদিকতার শক্তি নিয়ে প্রকাশ করুন। জনগণ বুঝুক—সব কিছু।'

১৯৭১ সনের একুশে ফেব্রুয়ারী। রাত তখন প্রায় এগারোটা। এর পরে আমার সঙ্গে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের আর দেখা হয় নি। রাজনৈতিক ডামাডোল ও চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তখন পূর্ব বাঙলার আকাশ-বাতাসকে অস্থির করে তুলেছে। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে পঁচিশে মার্চ রাত্রে নির্মম ভাবে খুন হয়েছেন। নইলে এমন কিছু দলিল তার কাছ থেকে পাওয়া যেতো—যার আলোকে একটা কুৎসিত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করা যেতো। চেনা যেতো নিরামিষাসী সন্ন্যাসীর ঝোলা থেকে কোন্ দেশের বেড়াল বেরোয়। কারা সেই বেড়ালবাহী স্বদেশী সন্ন্যেসী?

দুই

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমার আলোচনার মুখ্য দিক নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাত্র। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের মৃত্যু হলেও এবং তার কাছ থেকে কিছু দলিল পত্র না পেলেও পূর্ব বাঙলা তথা পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসের মৃত্যু হয় নি। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের জন্ম থেকে ১৯৭২ সন 'বাঙলা দেশ' সৃষ্টি পর্যন্ত যে ইতিহাস তার বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করার আগে ১৯৭১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ব বাঙলা থেকে প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী'র প্রকাশ্য মুখপত্র সাপ্তাহিক গণশক্তির সম্পাদকীয়টির এখানে উল্লেখ প্রয়োজন মনে করছি। তাহলে 'বাঙলা দেশ' সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে। উদ্‌ঘাটিত হবে শেখ মুজিব কে? ইয়াহিয়া-মুজিব-ইন্দিরা-নিকসনের মধ্যে কোনো আন্তর্জাতিক হটলাইন আছে কি নাই। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার সঙ্গে আমেরিকার 'বাঙলা দেশ' প্রশ্নে প্রকাশ্যে বিরোধীতা কেন? কেন গণচীন প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব বাঙলার জনগণের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারলো না?

পূর্ব বাঙলাকে নয়া উপনিবেশবাদী
শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার
জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার
পদলেহীদের বিতাড়িত করুন—

২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবসে শহীদ মিনারের এক সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছেন, 'বাঙলা দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আজো শেষ হয়ে যায় নি।... বিগত নির্বাচনের ফল দেখেও চক্রান্তকারীদল ও কায়েমী স্বার্থ আজো নিবৃত্ত হয়নি। চক্রান্তকারীরা বাঙলাদেশকে আজো তাদের উপনিবেশ ও বাজার করে রাখতে চায়।' চব্বিশে ফেব্রুয়ারীর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একে আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'বাঙলাদেশকে ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্যেই ছয় দফা। বৈদেশিক বাণিজ্য, বিদেশী সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারাই প্রধানতঃ দেশের অপর অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থ-বাদীরা বাঙলাদেশের সাত কোটি জনগণের ওপর ঔপনিবেশিক শোষণ

চালাচ্ছে এবং বাঙলাদেশের সম্পদ পাচার করছে।'

'পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শিল্পপতি বাঙলাদেশকে তাদের সংরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করছে। তাই, পূর্ব বাঙলাকে ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য' এবং তার ছয় দফা আদায়ের জন্য তিনি পূর্ব বাঙলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন: 'অধিকার আদায়ের জন্যে ভবিষ্যতে অধিকতর রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।'

আমরাও বলি ষড়যন্ত্র চলছে:

আমরাও বলি পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের বিরুদ্ধে আজ এক সুগভীর ষড়-যন্ত্র চলছে। পূর্ব বাঙলার বাজারকে দখলে রাখা ও দখল করা নিয়ে দেশী বিদেশী শকুনীর দল কামড়া কামড়ি করছে। তারা পূর্ব বাঙলাকে নয়া উপ-নিবেশবাদী শাসন ও শোষণের কব্জায় বেধে রাখার জন্যে একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ আদায়ের জন্যে তারা পূর্ব বাঙলার শতকরা নিরানব্বুই জন লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। একে প্রতিরোধ করতে হবে। জনগণের দুষমণ দেশী বিদেশী শোষকদের সকল ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ধোকাবাজী ও দমন নীতিকে পরাজিত করে, পূর্ব বাঙলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-যুবক বুদ্ধিজীবি এবং সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী দেশ প্রেমিক ছোট ছোট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অধিকার অবশ্যই আদায় ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পূর্ব বাঙলাকে নয়া উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণ থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। পূর্ব বাঙলার ভাগ্য নির্দ্ধারণের ভার সম্পূর্ণরূপে পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের হাতে আনতে হবে।

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত শোষিত বঞ্চিত মেহনতী মানুষেরাই হবেন পূর্ব বাঙলার শাসক। বড়লোক শোষকদের রাজত্ব আমরা বরদাস্ত করবো না। গরীবের রাজত্ব আমরা কায়েম করবোই করবো। জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারই হবে পূর্ব বাঙলার কৃষি, শিল্প ব্যবসা, ব্যাঙ্ক, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সকল সম্পদের মালিক, বৈদেশিক বাণিজ্য, পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ই থাকবে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে।

এর পথে বাধা কারা? কারা শত্রু?

কিন্তু এর পথে বাধা কারা? কারা পূর্ব বাঙলার বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে এবং এখনো ষড়যন্ত্র করছে? পূর্ব বাঙলার শোষক কারা? পূর্ব বাঙলার স্থায়ী খাদ্য সঙ্কট, বাণিজ্য সঙ্কট, কৃষি সঙ্কট, শিল্প সঙ্কট, বছর বছর বন্যা, শিক্ষা-সংস্কৃতির

ক্ষেত্রে সঙ্কট, জনগণের অধিকার হরণ প্রভৃতির জন্যে দায়ী কারা? কারা পূর্ব বাঙলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে? শেখ মুজিবের ছয় দফা দাওয়াই দিয়ে পূর্ব বাঙলার সমাজ দেহ থেকে এসব দুষ্ট রোগ কি দূর করা সম্ভব? সম্ভব কি শোষকদের শাসন ও শোষণ থেকে পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করা?

শেখ মুজিবের বক্তব্য:

শেখ মুজিবের ছয় দফা এবং তার সকল বক্তব্যের মূল কথাই হলো পূর্ব-বাঙলার সকল চক্রান্ত, সঙ্কট এবং পূর্ববাঙলাকে "উপনিবেশ" ও বাজার করে রাখার জন্যে দায়ী হচ্ছে: পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীরা।

বড় ধনীকেরা অন্যতম শোষক:

নিঃসন্দেহে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় ধনিক পরিবার পূর্ব বাঙলাসহ পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান শোষক। আদমজী, দাউদ, সায়গল, দাদা, বাওয়ানী, ইস্পাহানী, হারুন, আগাখানী গ্রুপ প্রভৃতিমাত্র ২২টি পরিবার পাকিস্তানের সমস্ত শিল্পের তিন ভাগের দুই ভাগের এবং ব্যাঙ্কসমূহের পাঁচ ভাগের চার ভাগের মালিক। পূর্ব বাঙলার শিল্প, ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কে এরাই প্রধান। এরা সকলেই অবাঙালী। এরা পূর্ববাঙলার জনগণকে শোষণ করে তাদের মুনাফার একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করছে। এরা পূর্ববাঙলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে। এরা পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষম্য, বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে। এসবই সত্যি। এও সত্যি যে, পূর্ববাঙলা সহ সারা পাকিস্তানের বাজার নিজেদের দখলে রাখার জন্যে তারা 'অখণ্ড পাকিস্তান' 'শক্তিশালী কেন্দ্র' ও 'ইসলামী সংহতির আওয়াজ তুলে গত তেইশ বছর যাবৎ পূর্ব বাঙলাসহ সারা পাকিস্তানের জনগণকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে আসছে। এরাই পূর্ববাঙলা সহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করছে। ১৯৫৪ সনে পূর্ববাঙলার ৯২ (ক) ধারা অনুযায়ী গভর্ণরী শাসন কায়েম, ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র বাতিল, ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন, দশ বছর যাবৎ আয়ুবের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী শাসন, আবার সামরিক শাসন—এসবের পেছনে এদেরই হাত রয়েছে। নিজেদের বাজার ও মুনাফার স্বার্থে তারা এসব গণবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করছে। পূর্ববাঙলাকে শোষণমুক্ত করতে হলে পূর্ববাঙলার বুক থেকে এই দুশমণদের অবশ্যই বিতাড়িত করতে হবে। এই লুণ্ঠনকারীদের শিল্প, ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি

কেড়ে নিয়ে তা পূর্ববাঙলার জনগণের হাতে আনতে হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র এই শোষকদের বিতাড়িত করলেই কি পূর্ববাঙলা শোষণ-মুক্ত হবে? শেখ মুজিবের ছয়দফা অনুযায়ী পূর্ববাঙলার শিল্প আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, বিদেশী সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রার উপর এই বড় ধনিকদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে তা বাঙালী ধনিক ও জোতদার মহাজনদের হাতে তথা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের সরকারের হাতে এলে, পূর্ব বাঙলার জনসাধারণ কি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবেন? মার্কিনের পদলেহী ক্ষমতাসীন অবাঙালী বড় ধনিক ও জমিদার জায়গীরদারের স্থলে পূর্ববাঙলার বাজার মার্কিনের পদলেহী বাঙালী ধনিক ও জোতদার-মহাজনদের হাতে এলে পূর্ববাঙলা কি শোষণমুক্ত হবে? এর ফলে পূর্ববাঙলার কৃষক, শ্রমিক-ছাত্র-যুবক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ কি শোষণ মুক্ত হবেন? তাঁরা কি তাঁদের জীবন ও জীবিকার এবং গণতন্ত্রের অধিকার পাবেন? সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি এবং শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাও কি স্বাধীন বিকাশের সুযোগ পাবেন?

না, এসব কিছুই হবে না। অবাঙালী বড় ধনিকদের স্থলে দালাল বাঙালী ধনিকেরা পূর্ববাঙলার বাজারের মালিক হলে মার্কিনী পদলেহী একটি শোষকের পরিবর্তন হবে, কিন্তু শোষণের অবসান হবে না। বন্ধ হবে না নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ; বন্ধ হবে না জোতদার মহাজনদের শোষণ, বন্ধ হবে না সাম্রাজ্যবাদের দালাল ধনিকদের শোষণ। বন্ধ হবে না এই গণ-দুষমণদের ষড়যন্ত্র।

নয়া ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও ষড়যন্ত্রের নায়ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঃ

একথা সত্যি যে, পাকিস্তানকে একটি "স্বাধীন দেশ" হিসেবে ঘোষণা করা হলেও পাকিস্তান কায়েমের প্রথম দিন থেকেই পূর্ব বাঙলাসহ সারা পাকিস্তান আবদ্ধ রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের নয়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলে। এই শাসন ও শোষণ জনগণের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। এর কারণ হলো, পূর্ব বাঙলাসহ সারা পাকিস্তান আজ কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সরাসরি উপনিবেশ নয়। ১৯৪৭ সনের চৌদ্দই আগষ্টের আগে পাক-ভারত উপমহাদেশ ছিলো ব্রিটিশের সরাসরি উপনিবেশ। পাক-ভারতের জনগণের সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলে যখন ব্রিটিশের শাসন-শোষণ ভেঙে পড়ার উপক্রম

হয়, তখন ধূর্ত ব্রিটিশরা তাদের সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়; বাধ্য হয় নতুন ধরণের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কায়েম করতে। এ ব্যাপারে তারা নির্ভর করে তাদের দুই বিশ্বস্ত অনুচরের ওপর—সামন্তবাদী জমিদার-জোতদার এবং তাদের দালাল ধনিকদের উপর; নির্ভর করে তাদের বাছাই করা এবং শিক্ষা দেয়া এজেন্টদের উপর। তাই এই নয়া উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণের আমলে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদেরকে সামনে দেখা যায় না, তারা আড়ালে থেকে তাদের বিশ্বস্ত অনুচরদের মাধ্যমেই চালায় শাসন ও শোষণ। আর এই শাসন-শোষণ চালাবার জন্যেই তারা নেয় আর্থিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি 'সাহায্যে'র আবরণ। এই আবরণ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা আড়ালে থাকার দরুণই তাদের শাসন-শোষণ জনগণের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। এই নয়া উপনিবেশবাদী শাসন-শোষণ অতীতের ব্রিটিশের সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের তুলনায় আরো মারাত্মক ও জঘন্য।

পূর্ববাঙলা তথা সারা পাকিস্তানের সর্বপ্রধান নয়া ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ব্রিটিশ, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহ ও পূর্ববাঙলা তথা পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক শোষক। এই নয়া ঔপনিবেশিক শোষকদের, বিশেষ ভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-শাসন কত মারাত্মক, তা গত দুই দশকের পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি ভালোভাবে তাকালে ধরা পড়ে। এই প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করবো না। শুধু কয়েকটি বিশেষ ঘটনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) পাকিস্তান যখন কায়েম হয়, তখন পাকিস্তানে মার্কিনের একটি পয়সাও ছিলো না। আজ পাকিস্তানে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা খাটছে; আবার এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা আমেরিকার। আমেরিকা হলো বর্তমান দুনিয়ার সবচাইতে বড় সাম্রাজ্যবাদী দস্যু। লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা তথা সারা বিশ্বকে পদানত করার জন্যে তারা টাকা ও অস্ত্র হাতে নেমেছে। ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়াকে দখল করার জন্যে তারা ঐ সব দেশের লাখ লাখ লোককে

হত্যা করছে, ইন্দোনেশিয়ায় লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা আমাদের দেশে নিশ্চয়ই দানছত্র খুলতে আসেনি। তারা টাকা খাটাচ্ছে মুনাফা লুণ্ঠনের জন্যে; সর্বোচ্চ মুনাফা লুণ্ঠনের জন্যে। এই লুণ্ঠনের স্বার্থেই তারা আর্থিক ও সামরিক "সাহায্য" দেয়ার সময় সঙ্গে দেয় গোলামীর শর্ত। গ্রামের মহাজন যেমন জমি বন্ধক ছাড়া টাকা ধার দেয় না ঠিক তেমনি পৃথিবীর সবচাইতে ধনী মার্কিনীরা অন্য দেশকে তাদের গোলামীর শৃঙ্খলে বাঁধার ব্যবস্থা ছাড়া সেই দেশকে টাকা ধার এবং আর্থিক ও সামরিক "সাহায্য" দেয় না।

মার্কিনীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের মারাত্মক ও জঘন্য রূপ লক্ষ্য করুন:

মার্কিনীরা আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে "খাদ্য সাহায্য" দেয়ার পরে এবং তাদের তথাকথিত "উপদেষ্টাদের" পরামর্শ অনুযায়ী "কৃষি উন্নয়ণ পরিকল্পনা" গ্রহণের পরে পূর্ববাঙলার খাদ্য সঙ্কট বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৬ সনে পূর্ববাঙলায় খাদ্য ঘাটতির পরিমান ছিলো দুই লক্ষ টন; সেই ঘাটতি বাড়তে বাড়তে গত বছর হয় পঁচিশ লক্ষ টন। আর বর্তমান বছরের ঘাটতির পরিমান তিরিশ লক্ষ টন। ১৯৫৬ সনে চাউলের দাম ছিলো মন প্রতি চৌদ্দ টাকা। আর এখন দাম চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সন থেকে ১৯৫৭-৫৮ সন এই দশ বছরে পূর্ববাঙলায় বিদেশ থেকে ছত্রিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচ শত ছিয়াশি টন গম এবং দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত ষোলো টন চাউল আমদানি করা হয়। আর ১৯৫৭-৫৮ সন থেকে ১৯৬৭-৬৮ সন এই দশ বছরে পূর্ববাঙলায় এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত কুড়ি টন গম এবং উনিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার ছয় শত তিন টন চাউল আমদানি করা হয়। অর্থাৎ আগের দশ বছরের তুলনায় পরবর্তী দশ বছরে গমের আমদানী প্রায় তিন গুণ এবং চাউলের আমদানি প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। আর এর মধ্যে আমেরিকার 'পি, এল, ৪৮০ পরিকল্পনা' অনুযায়ী এসেছে প্রায় সব গম ও চাউল। মার্কিনীরা তাদের উদ্বৃত গম ও চাউল বিক্রি করে মুনাফা লুণ্ঠনের জন্তেই 'পাবলিক ল ৪৮০ পরিকল্পনা' গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা গ্রহণের আগে ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমান ছিলো দেশের সমগ্র খাদ্যশস্যের মাত্র একশত ভাগের দুই ভাগ। আর 'পি, এল ৪৮০' অনুযায়ী খাদ্য আমদানি শুরু করার

পর তা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে এর পরিমান দাঁড়িয়েছে একশত ভাগের প্রায় দশ ভাগ।

এর ফলে একদিকে পূর্ব বাঙলা উজাড় হয়ে যাচ্ছে, পূর্ববাঙলার অন্নদাতা গরীব ও ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক এবং গরীব মধ্যবিত্তরা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে ধুকে ধুকে মরছেন, পেটের দায়ে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে গিয়ে নিজেদের সামান্য সম্বলটুকু পর্যন্ত হারাচ্ছেন। আর প্রতিবছর খাদ্য আমদানি করতে গিয়ে দেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি সকল উন্নয়নমূলক কাজ ব্যহত হচ্ছে। অন্যদিকে পূর্ববাঙলাকে লুট করে মার্কিনীরা তাদের মুনাফার পাহাড় দিন দিন উঁচু করছে। 'পি এল ৪৮০' অনুযায়ী খাদ্য বিক্রি করে আমাদের দেশেই মার্কিনী কোষাগারে যে টাকা জমা হয়েছে, তার পরিমান আমাদের দেশের প্রচলিত টাকার অর্ধেক। এই টাকা মার্কিনীরা আমাদের দেশে তাদের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করে। এই খরচ কোথায় কি ভাবে হচ্ছে, তা তদারক করার এক্তিয়ার পাকিস্তান সরকারের নেই। এই টাকা দিয়ে তারা তাদের দালাল তৈরী করছে বলে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের খবরে প্রকাশ। এত বড় লাভের ব্যবসা মার্কিনীরা কোনোদিনই ছাড়তে পারে না। তাদের মুনাফার স্বার্থেই তারা আমাদের দেশে খাদ্যসঙ্কট, কৃষিসঙ্কট, বন্যাসঙ্কট স্থায়ী ও দিন দিন গভীর করার চেষ্টা করছে। তাদের মুনাফার স্বার্থে খাদ্য সঙ্কট ও কৃষি সঙ্কটের মূল স্রষ্টা সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থা এবং তার মালিক জোতদার-মহাজনদের তারা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ও করবে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, এই দুই দুশমন মিলেই সুজলা-সুফলা সোনার পূর্ববাঙলাকে চির দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করছে।

শেখ মুজিব বলবেন, পশ্চিম পাকিস্তানি ধনীরা বিদেশী সাহায্য নিয়ে তথা মার্কিনী টাকা নিয়ে তাদের ওখানে বিরাট বিরাট বাঁধ তৈরী করছে, পূর্ব বাঙলার বাঁধ তৈরীর জন্যে টাকা দেয়নি। তাই এই খাদ্যসঙ্কট। আসলে ঘটনা কি? মার্কিনীরা যে টাকা দেয় তা কোন্ খাতে ব্যয় হবে, তারাই সেটা ঠিক করে দেয়। বড় ধনিকদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার ও মুনাফার স্বার্থেই মার্কিনীরা এতদিন পশ্চিম পাকিস্তানে বেশী টাকা ঢেলেছে আর পূর্ব বাঙলায় বাঁধ নির্মানে তারা সব সময়েই দিয়েছে বাধা। পূর্ব বাঙলায় বাঁধ নির্মানের জন্যে চীন এবং অন্যান্য বহু দেশ বারবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু, মার্কিনী বাধার দরুণই ক্ষমতাসীনেরা ঐসব প্রস্তাবকে কার্যকরী করেনি।

আর মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী 'বিশেষজ্ঞরা' বাঁধ নির্মানের নামে পূর্ববাঙলার নিদারুণ ক্ষতি করছে ও নিজেরা মুনাফা লুটছে, তা আমরা চোখের সামনেই দেখছি।

তা ছাড়া, মার্কিনীরা 'আর্থিক সাহায্য' এর নামে আমাদের দেশকে 'পাক-মার্কিন মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি' নামে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৬০ সালের ১২ই নভেম্বর। আয়ুব সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব ভুট্টো এই চুক্তিটিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ১৯৬১ সনের ১২ই জানুয়ারী আয়ুবের সামরিক সরকার এই চুক্তি অনুমোদন করে এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে তা বলবৎ হয়। এই চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ দশ বছর। যদি কোনোপক্ষ দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার এক বছর আগে চুক্তির মেয়াদ শেষ করার জন্যে লিখিত নোটিশ না দেয় তাহলে তা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বলবৎ থাকবে। ইয়াহিয়া সরকার এই চুক্তির মেয়াদ শেষ করার জন্যে কোনো নোটিশ দিয়েছে কিনা তা আজ পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। ফলে, এই চুক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বলবৎ হয়েছে।

এই চুক্তির ধারা অনুযায়ী মার্কিনীরা পাকিস্তানে শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা, ধর্মপ্রচার, সমাজসেবা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পাকিস্তানী নাগরিকের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করছে এবং মার্কিনীদের আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা 'সুবিধা-ভোগী জাতি' হিসেবে গন্য করা হচ্ছে। নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের চাইতে মারাত্মক ও জঘন্য রূপ আর কি হতে পারে? কোনো স্বাধীন জাতি কোনো দেশপ্রেমিক এরূপ গোলামী চুক্তি মেনে নিতে পারেন কি? কিন্তু বাঙলা-দেশকে ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে মুক্ত করার ধ্বজাধারী শেখ মুজিব এই চুক্তিটির বিরুদ্ধে একটি কথাও আজ পর্যন্ত বলেন নি।

তারপর মার্কিনী "সাহায্য" এর আসল রূপটি কি? মার্কিনীরা যে টাকা দেয়, তা কোন্ খাতে ব্যয় হবে তা ঠিক করে দেয়। তাদের 'সাহায্য' এর শতকরা আশি ভাগই হলো মার্কিন পণ্য ক্রয়ের জন্যে। আর বাকি টাকা ব্যয় করা হয় 'কৃষি উন্নয়ন' রাস্তাঘাট নির্মান, 'উপদেষ্টাদে'র বেতন, তথা মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থে এমন ভাবে পরিকল্পনা করে, যাতে আমাদের দেশ খাদ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, যাতে সবসময় মার্কিনের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়।

কম দামে জিনিস কেনার স্বাধীনতা নেই

এই 'সাহায্য' দানের শর্ত হলো—যে অর্থ দেবে, তা মার্কিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে; ঐ টাকা দিয়ে মার্কিনের নিকট থেকে জিনিস আনতে হবে তাদেরই জাহাজে করে। তাদের জাহাজ ভাড়া ও জিনিসের দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী, এবং তা তারা দিন দিন বাড়াচ্ছে। তবু মার্কিনী অর্থ নিয়ে অন্য দেশ থেকে কম দামে জিনিস কেনার স্বাধীনতা নেই।

এর ফলে আমাদের দেশের কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন বিকাশ লাভ সম্ভব হচ্ছে না। দেশ থাকছে মার্কিনের উপর নির্ভরশীল হয়ে; প্রতিটি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বাড়ছে; বাণিজ্যে হচ্ছে ঘাটতি।

মার্কিনীরা যে 'সাহায্য' দেয়, তার সুদের হারও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। সুদে টাকা ধার দেয়া নয়া উপনিবেশবাদী শোষণের একটি প্রধান রূপ। ব্রেল্‌স কোর্ড তার 'দি ওয়ার অব স্টীল অ্যাণ্ড গোল্ড' বইতে লিখেছেন: 'পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ কর ধার্য করতো, আর নতুন সাম্রাজ্যবাদ সুদে টাকা ধার দেয়।' সরকারী হিসেব অনুযায়ী পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার একশত ভাগের প্রায় কুড়ি ভাগ ব্যয় করা হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের জন্যে। ১৯৬৬-৬৭ সনে বিদেশী ঋণের সুদ বাবদ পাকিস্তানকে দিতে হয়েছে তিনশত ষাট কোটি সত্তর লক্ষ টাকা। তা বেড়ে ১৯৬৯-৭০ সনে দাঁড়িয়েছে চারশত পঁচাত্তর কোটি সত্তর লক্ষ টাকায়। পাকিস্তানী প্রতিটি লোকের মাথায় বিদেশী ঋণের বোঝা হলো প্রায় পঞ্চাশ টাকা এবং তা দিন দিনই বাড়ছে।

মার্কিনী ডলারের সাথে আসে তার 'উপদেষ্টা'। এরা থাকে রাজার হালে, আর তাদের সব খরচ 'সাহায্য'র টাকা থেকেই যায়। এই তথাকথিত 'উপদেষ্টারা' স্বভাবতই কাজ করে তাদের নিজেদের স্বার্থে। মার্কিনের নয়া উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণের স্বার্থে।

এই মার্কিনী বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে অন্যতম বৃহৎ ধনিক এম, এইচ, ইস্পাহানী তার 'চীনে সাতাশ দিন' পুস্তিকায় লিখেছেন: "কারিগরি সাহায্যের নামে আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে সব লোককেই পাঠানো হয় যাদের নিজ দেশে বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই; যাদের জ্ঞান খুবই কম, তারা যদি আদৌ কিছু শেখায় তাহলেও তা খুব কম। তারা যতদিন পারে আমাদের দেশে অবস্থান করে। নবাবদের ন্যায় অসম্ভব রকম উচ্চ

বেতন নেয় এবং বিরাট ধন সঞ্চয় করে নিজ দেশে ফিরে যায়।

তাই মার্কিনীরা আর্থিক ও খাদ্য 'সাহায্য' এর নামে যে অর্থ ও খাদ্য আমাদের দিচ্ছে, তার ফলে তারা একদিকে আমাদের দেশে তাদের নয়া উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণকে আরো দৃঢ় করার চেষ্টা করছে; অন্যদিকে বিভিন্ন শর্ত, অসম বাণিজ্য চুক্তি, সস্তাদরে আমাদের দেশ থেকে কাঁচামাল ক্রয় ও বেশী দরে তাদের জিনিস বিক্রি, উচ্চহারে সুদ প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা বিশেষভাবে মার্কিনীরা আমাদের দেশকে চরম ভাবে শোষণ করছে। তারা এক হাতে যা দিচ্ছে, তার চারগুণ অন্য হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের কৃষকদের পাট ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল পানির দরে বিক্রয় হওয়া এবং খাদ্যসহ প্রতিটি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধিরও প্রধান কারণ হলো সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষ ভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন। মার্কিনীরা প্রতি বছর তাদের যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করছে এবং আমাদের দেশের পাট ও অন্যান্য কাঁচামালের দাম কমাতে বাধ্য করছে। সাহায্য শর্ত অনুযায়ী বেশী দামে তাদের নিকট থেকে জিনিস কিনতে বাধ্য করছে, এভাবে দুই শোষণের জাঁতাকলে পিষে মেরে আমাদের দেশ থেকে তারা সবকিছু লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

মার্কিনের এই নয়া উপনিবেশবাদী শোষণ এত তীব্র যে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর লোকেরাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। আয়ুবের মন্ত্রী থাকাকালীন জেড. এ. ভুট্টো সাহেবও জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে ১৯৬০ সনে বলেন "গত বহু বছর ধরে বাণিজ্যের শর্তসমূহ ক্রমাগত কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ সমূহের বিরুদ্ধে গিয়েছে। বাস্তবে আমরা যা সাহায্য লাভ করছি, তার তুলনায় বাণিজ্যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।"

মার্কিনের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ কত মারাত্মক রূপ নিতে পারে, তার নমুনা সম্প্রতি খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। রিলিফ দেয়ার নামে [১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর বাঙলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চল নোয়াখালি, সন্দীপ, হাতিয়া, বরিশাল, ভোলা, খুলনা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দিয়ে যে ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় বয়ে যায়—যার প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়—তারই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিনী সৈন্য আমদানি করা হয় রিলিফ দেয়ার নাম করে—লেখক] মার্কিনী সৈন্যরা পূর্ববাঙলার বুকে নামে। রিলিফ, কৃষি উন্নয়ন এবং আরো নানা রকম বেরঙের 'উন্নয়ন' ও 'পরিকল্পনা'র নামে মার্কিনী

সাপেরা আজ পূর্ববাঙলার আনাচে-কানাচে ফোঁস ফোঁস করে বেড়াচ্ছে। "পাক-মার্কিন মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনীরা সর্বাপেক্ষা সুবিধা-ভোগী জাতি।" তারা পাকিস্তানের নাগরিকের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করছে। তাদের গতিবিধি ও কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকার পাকিস্তানের সরকারের নেই। তারা অবাধে পূর্ববাঙলার সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছে। আমাদের নিজ দেশে আমরা হলাম পরাধীন। আমাদের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার এমন কি বুদ্ধিজীবি শিল্পপতি ব্যবসায়ীদেরও স্বাধীনভাবে বিকাশের অধিকার নেই। কিন্তু মার্কিনীরা অবাধে আমাদের দেশের উপর খবরদারী করে বেড়াচ্ছে।

তাদের খবরদারী যে কতো বাস্তব, তাদের নয়া-উপনিবেশবাদী শাসন যে কতো মারাত্মক, তা পাকিস্তানের গত ২৩ বছরের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ডলারের সাথে সাথে মার্কিনীরা অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, সব ক্ষেত্রে চাপ দেয়। ডলারের সাথে আমাদের দেশে এসেছে মার্কিনের বন্দুক, একের পর এক যুদ্ধ জোট।

মার্কিনীরা যে এদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা খাটাচ্ছে, তার নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ মুনাফা আহরণের জন্যে তারা চায় তাদের অনুগত সরকার, শোষণ—আরো শোষণ, মুনাফা—আরো মুনাফা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনার স্বার্থে ১৯৫৩ সন থেকে তারা তাদের বাছাই করা ও শিক্ষা দেয়া এক দালালের পর আরেক দালালকে গদিতে বসিয়ে চলেছে। পূর্ববাঙলা তথা সারা পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির নায়ক হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বস্তুতঃ মার্কিনীরাই হলো পাকিস্তানের নয়া উপনিবেশবাদী শাসক। পাকিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে মার্কিনীরাই করছে খবরদারী। তার বিশ্বস্ত দুই অনুচর বড়ো জমিদার-জোতদার ও বড়ো ধনী এবং বাছাই করা ও শিক্ষা দেয়া দালাল দিয়েই মার্কিনীরা পাকিস্তানের উপর প্রভূত্ব করছে। ১৯৫৩ সনে নাজিমুদ্দীনকে সরিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে গদিতে বসানো, ১৯৫৪ সনে পূর্ববাঙলায় ৯২ (ক) ধারা জারী করে গভর্ণরী শাসন কায়েম, তারপর চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভা, আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাবর্দ্দীর মন্ত্রীসভা, আই, আই, চুন্দ্রীগড়ের মন্ত্রীসভা, ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রীসভা, ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন, বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে আয়ুবের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী শাসন, আবার সামরিক শাসন; আর এখন

ভোট, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের পায়তারা এবং শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানোর প্রচেষ্টা—এসব কিছুরই পেছনে রয়েছে মার্কিনের হাত। 'খাদ্য ও ডলার সাহায্য'র নামে ওয়াশিংটন থেকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে উড়িয়ে এনে তাকে প্রধানমন্ত্রী করে আমাদের দেশকে আবদ্ধ করা হলো মার্কিনের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন সামরিক জোটে—পাক-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি ও সিয়াটো যুদ্ধ জোটে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে গদিতে বসিয়ে সেণ্টো যুদ্ধ জোটের গাটছড়া বাঁধা হলো।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তৎকালীন কেন্দ্রীয় পরিষদে ঐ যুদ্ধ জোটগুলি অনুমোদন করাতে না পারায়, তাদের একে একে সরিয়ে দিয়ে [মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিজের হাতে গড়া বিশ্বস্ত সেবাদাস —লেখক] বসানো হলো সোহরাবর্দ্দী সাহেবকে। তাকে দিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে যুদ্ধ জোটগুলি অনুমোদন করাবার পর শেষাবধি তাকেও সরিয়ে দেয়া হলো। তারপর বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একের পর এক মন্ত্রীসভাকে সরিয়ে—ইস্কান্দার মীর্জাকে দিয়ে জারী করানো হলো সামরিক শাসন। পরে পর্দার অন্তরাল থেকে আয়ুবের মঞ্চে আবির্ভাব ও ইস্কান্দার মীর্জার নির্বাসন। এবং আয়ুবই "বাধ্যতামূলক মার্কিন পণ্য ক্রয় চুক্তি" এবং "পাক-মার্কিন মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তিতে" অনুমোদন দিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মার্কিন ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটি প্রস্তুত করার পথ করে দিলো। মার্কিনীরা তাদের গণচীন বিরোধী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিকল্পনার স্বার্থে তাদের বিশ্বস্ত অনুচর বড়ো ধনিক ও বড়ো জমিদার-জোতদারদের প্রতিভূ আয়ুব সরকারের উপর চাপ দিতে লাগলো গণচীনের বিরুদ্ধে পাক-ভারত যৌথ যুদ্ধজোট গঠনের জন্যে। বড়ো ধনিক ও পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার-জায়গীরদারেরা তাদের বাজারের স্বার্থে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে গণ-চীনের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধজোট গঠন করতে রাজি হচ্ছে না, তখনই মার্কিনীরা পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে পঙ্গু করানোর জন্যে ভারতকে দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। চরম সঙ্কটে নিপতিত মার্কিনীরা পূর্ববাঙলাসহ সারা পাকিস্তানে তাদের নয়া ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কব্জা আরো দৃঢ় করার জন্যে এবং তাদের গণচীন বিরোধী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্যেই এখন শেখ মুজিবকে বেছে নিয়েছে, ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে, পূর্ববাঙলাকে বিরাট পরিমান আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তবে বড়ো ধনিকদেরও তারা

ছাড়ে নি ; তাদেরও প্রচুর পরিমান ডলার সাহায্য দিয়ে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ বজায় রাখা এবং যুদ্ধ পরিকল্পনায় সামিল হবার জন্যে চাপ দিচ্ছে।

কাজেই :

(১) পূর্ব বাঙলাসহ সারা পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষক হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতির নায়ক। পূর্ব বাঙলাসহ সারা পাকিস্তানের জনগণের এরা হলো অন্যতম প্রধান দুশমন। এরাই পূর্ববাঙলাসহ সারা পাকিস্তানে জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন কায়েমে, বাঙালী জাতিসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং পূর্ববাঙলার কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ ও আত্মনির্ভরশীলতার পথে, জনগণের জীবন-জীবিকা, ভাত-কাপড়, শিক্ষা-বাসস্থান ও চিকিৎসার সমস্যা সমাধানের পথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই হলো সর্বপ্রধান বাধা।

(২) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নয়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাচ্ছে তার দুই বিশ্বস্ত অনুচর জমিদার-জোতদার ও বৃহৎ ধনিকদের মাধ্যমে।

(৩) ক্ষমতাসীন বড়ো ধনিক ও জমিদার-জোতদারেরা ডলারের নিকট দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়েছে। মার্কিনী ডলার এবং সরকারী সাহায্যে জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ করে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আদমজী, দাউদ প্রভৃতি ধনীরা অতি অল্পসময়ে বড়ো ধনিকে পরিণত হয়েছে। মার্কিনের ছত্র-ছায়ায় থেকে তারা পূর্ব বাঙলাসহ সারা পাকিস্তানের বাজারকে গত তেইশ বছর যাবৎ শোষণ করছে। এই শোষণ তারা আপন ইচ্ছায় কখনো ছেড়ে দেবে না। এই শোষণ বজায় রাখার জন্যেই তারা শেখ মুজিবের ছয় দফার বিরোধীতা করেছে।

(৪) অন্যদিকে শেখ মুজিব ও তার ছয় দফা নিয়ে মার্কিনের সাহায্যে পূর্ববাঙলার বাজার দখল করতে চাইছেন। মার্কিনের খুঁটির জোরেই তিনি বড়ো ধনিকদের বিরুদ্ধে কুঁদছেন। পূর্ব বাঙলায় যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপনের জন্যে এবং পূর্ববাঙলায় তাদের নয়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ আরো দৃঢ় করার জন্য মার্কিনীরা আজ শেখ মুজিবকে মদত দিচ্ছে। মদত দিচ্ছে তাদের দালাল বাঙালী জোতদার মহাজনদের, দালাল বাঙালী ধনিকদের ও দালাল বুদ্ধিজীবিদের। মার্কিনের এই দালালরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ববাঙলার স্বার্থকে, জনগণের স্বার্থকে ডলারের নিকট বিকিয়ে দিচ্ছে। শেখ মুজিব তথা আওয়ামী

লীগ তাদের ছয় দফা অনুযায়ী বৈদেশিক বাণিজ্য, বিদেশী সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণভার পূর্ববাঙলার সরকারের তথা আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে আনলেও তার ফলে পূর্ববাঙলা নয়া ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, জোতদারী মহাজনী শোষণ ও ধনিকের শোষণ থেকে মুক্ত হবে না। মার্কিনের নিকট অধিকতর 'আর্থিক সাহায্য' পূর্ববাঙলাকে মার্কিনের নয়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলে আরো দৃঢ়ভাবে বাঁধবে ; পূর্ববাঙলাকে মার্কিনের যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করার চেষ্টা করবে। মার্কিনের সাহায্য ছাড়া শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। আর মার্কিনের সাহায্যে গদিতে বসলে তখন ডলারের বিনিময়ে মার্কিনীরা তার মাধ্যমে পূর্ববাঙলাকে আরো নতুন নতুন দাসত্বমূলক অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা করবে। আর এই সবই করা হবে "বাঙলা দেশকে উন্নয়ন" এর নামে "পশ্চিমপাকিস্তানী ধনীদের কবল থেকে পূর্ববাঙলাকে মুক্ত" করার ভিগির তুলে। এই মুখোশ পরে মার্কিনীরা শেখ মুজিবের মাধ্যমে পূর্ববাঙলায় তাদের যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন করার এবং পূর্ববাঙলার জনবল ও সম্পদকে মার্কিনের কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়াস হিসাবে।

কাজেই শেখ মুজিবের ছয় দফা পূর্ববাঙলার স্বার্থবিরোধী। তার ছয়দফার আওয়াজ হলো পূর্ববাঙলাকে মার্কিনের নয়া উপনিবেশবাদী এবং তার পা চাটা বাঙালী ধনিক ও জোতদার মহাজনদের শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলে বেধে রাখার আওয়াজ। শেখ মুজিব নিজের গদি ও বাঙালী শোষকদের স্বার্থে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে ডলারের নিকট বিকিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক তেমনি ভুট্টো, কাইয়ুম, দৌলতানা প্রভৃতির 'শক্তিশালী কেন্দ্র' 'অখণ্ডপাকিস্তান' তথা পাকিস্তানী বাজারকে মার্কিন আর তার পদলেহী বড়ো ধনিক ও জোতদার মহাজনদের দখলে রাখার আওয়াজ।

শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের এই দুশমনদের মধ্যে চলছে কামড়াকামড়ি। কামড়াকামড়ি চলছে মার্কিনী ছত্র ছায়ায় থেকে পূর্ববাঙলার বাজার ও জনগণকে লুটপাটের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। নিজ নিজ স্বার্থ আদায়ের জন্যে কামড়া-কামড়িতে তারা নিজেদের স্বার্থকে "জাতীয় স্বার্থ" "জনগণের স্বার্থ" হিসেবে হাজির করছে। শেখ মুজিব মার্কিন ও তার পদলেহী বাঙালী শোষকদের স্বার্থ আদায়ের জন্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পতাকা নিয়ে জনগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করছেন। আর ভুট্টো, কাইয়ুম খান, দৌলতানা প্রভৃতিরাও

মার্কিন এবং তার পদলেহী বড়ো ধনিক ও বড়ো জমিদার-জায়গীরদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের পতাকা নিয়ে জনগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করছে।

এই দুই পতাকাই হলো পূর্ব বাঙলাসহ সারা পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থবিরোধী, বাঙালী জাতিসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির স্বার্থবিরোধী।

এই দুই পতাকাই পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে; শোষিত জনগণের মধ্যে এবং নিপীড়িত জাতিতে জাতিতে বিভেদ ও বিদ্বেষ উস্কাচ্ছে; জনগণকে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে; জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্যে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে রোধ ও দমনের চেষ্টা করছে; শোষকদের শোষণ ও জাতিগত নিপীড়নকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

তাই আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি, প্রগতির জন্যে দাঁড়াই, পূর্ববাঙলার বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন চাই, যারা পূর্ববাঙলাকে—খাদ্যসঙ্কট, কৃষিসঙ্কট, শিল্প সঙ্কট, ব্যবসা সঙ্কট, বন্যা সঙ্কট, শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্কট, বাসস্থান ও চিকিৎসা সঙ্কট থেকে চিরতরে মুক্ত করতে চাই এবং পূর্ববাঙলাকে খাদ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে এক শক্তিশালী জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে চাই, যারা জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন কায়েমের জন্যে সংগ্রাম করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—তাদের আজ কর্তব্য হলো উপরোক্ত দুই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী পতাকার বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবক এবং দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি ও ব্যবসায়ীদের জাগিয়ে তোলা।

এই উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্ণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরতে হবে জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলার পতাকা—কৃষি বিপ্লবের পতাকা। সাম্রাজ্যবাদ—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তার পদলেহী জোতদার-মহাজন এবং বড়ো ধনিক ও অবাঙালী ধনিকদের শোষণ-শাসন—এই তিন পাহাড়ই আজ পূর্ববাঙলার মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে জোতদার মহাজনদের সাথে —কৃষকের বিরোধ, বিশেষ করে গরীব ভূমিহীন কৃষকের বিরোধই হলো বর্তমান পূর্ববাঙলার সমাজে সর্বপ্রধান বিরোধ। এই সামন্তবাদী জোতদার মহাজনেরাই পূর্ববাঙলার সমাজে মার্কিনের ও তার পদলেহী ধনিকদের

সামাজিক অবলম্বন। এই পূর্ববাঙলাকে নয়া উপনিবেশবাদী, সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল ধনিকদের শাসন-শোষণ ও জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্যে, পূর্ববাঙলার ভাগ্য নির্দ্ধারণের জন্যে, আজ সর্বপ্রথম আঘাত হানতে হবে ঘৃণিত জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে: গ্রাম বাঙলাকে মুক্ত করতে হবে সামন্তবাদী শোষণ এবং অন্য দুই শোষণের পাহাড় থেকে।

সুতরাং, পূর্ববাঙলার শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবি ও মধ্যবিত্ত মেহনতী জনসাধারণ। গ্রাম বাঙলাকে আপনাদের দুর্গে পরিণত করুন; পূর্ব বাঙলার ষাট হাজার গ্রামে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের প্রত্যেকটি বাড়িকে শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করুন। তাঁদের নির্ভর করে মাঝারী কৃষক, বিপ্লবী ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবি ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত করুন।

পূর্ববাঙলার শ্রমিক শ্রেণী! আপনাদের নিজস্ব পতাকা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার পতাকা নিয়ে কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের জন্যে এগিয়ে যান, পূর্ব বাঙলার বুক থেকে মার্কিন ও তার পা চাটা কুকুরদের বিতাড়িত করুন, কায়েম করুন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার।

পূর্ববাঙলার মুক্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এই হচ্ছে একমাত্র পথ।

তিন

"God save the King" এই সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ অবসান ঘটেছিলো ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে। ভারত বিভক্ত হয়েছিলো। সৃষ্টি হয়েছিলো দুই পৃথক সঙ্গীতের। একটি হলো ব্রিটিশ সম্রাটের উদ্দেশ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের— "জনগণমন অধিনায়ক জয়ো হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।" দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ রওশন ইয়াজ দানী রচিত "পাক সার জমিন সাত বাত, কিস্ওয়ারে হাসিন সাত বাত।" একটি ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত, অপরটি পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত। পৃথক পৃথক সঙ্গীতের জন্ম হলেও কি প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে স্বাধীনতার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু আছে? 'য়ুনিয়ন জ্যাক' অপসারিত হলেও কি সত্যিকারের স্বাধীন পতাকা পাক-ভারতের আকাশে উড্ডীন হয়েছে আজো পর্যন্ত? না, তা হয় নি। প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক পরাধীনতার নাগপাস থেকে বেরিয়ে

এলেও উপমহাদেশের মানুষের গলায় নয়া ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের রেশমী সুতোর নরম ফাঁস ঝুলে আছে। চতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই এই রেশমী সুতোর ফাঁস ঝুলিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলো প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণের রঙ্গমঞ্চ থেকে।

ব্রিটিশ চলে গেলেও তার পুঁজি এদেশের মাটি থেকে চলে যায়নি। বন্ধ হয়ে যায়নি তার অর্থনৈতিক শোষণ। পূর্ববাঙলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিকানা কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে তাদেরই হাতে। রেলওয়েতে, ব্যাঙ্ক ইন্‌সিওরেন্সে, শিল্পখাতে ব্রিটিশের পুঁজি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এবং এটাই চেয়েছিলো ব্রিটিশ। এদেশের মাটিতে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ তার পক্ষে আর বেশীদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিলো না। সমগ্র উপমহাদেশে ক্রমশই জাতীয়মুক্তির আন্দোলন উঠছিলো তীব্রতর হয়ে। জনগণ ছিঁড়ে ফেলার জন্যে ক্রমশই দৃঢ় হয়ে উঠছিলো তাদের হাত ও পা থেকে সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের নির্মম শৃঙ্খল। উল্লাসকর থেকে সূর্যসেন পর্যন্ত যে বিস্ফোরোণের ইতিহাস, ১৯২০ থেকে '৪২ পর্যন্ত যে গণজাগরণ, স্বাধীনতার যে দুর্জয় বাসনা, চৌরিচৌরা থেকে রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয়-বাদল দীনেশে যে অগ্ন্যুৎপাত, মেদিনীপুর, চন্দন নগর, কুমিল্লা চট্টগ্রামের যে বিদ্রোহ তাকে অবাস্তব বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেনি—ম্যাজিষ্ট্রেট ফোর্ড থেকে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল পর্যন্ত কেউই, কিম্বা ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্ট, লর্ড সভা কিম্বা কমোন্স সভা কেউ না।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্তসিং, অম্বিকা চক্রবর্তীদের যে দুরন্ত জয় পূবের জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায় রক্তিম সূর্যোদয়ের স্বাক্ষর রচনা করেছিলো এবং পশ্চিমের জালিনওয়ালাবাগের সবুজ ঘাসের বুকে ইংরেজ গৃগ্ন্‌ ও ডায়ারের নৃশংস হত্যাযজ্ঞে স্বদেশী রক্তস্রোতের ধারায় যে ক্ষোভ, যে জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিলো, ব্রিটিশ তাকে ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দিতে পারেনি। জালিনওয়ালাবাগের সহস্র শহীদের উষ্ণ রক্ত স্পর্শ করে গর্জে উঠেছিলো আসমুদ্র হিমাচল। বদ্‌লা চাই।

এই বদ্‌লা নেয়ার প্রচেষ্টা একটা নয়, একটিমাত্র ঘটনার পটভূমিকায় জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন সীমাবদ্ধ থাকে নি। ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদ একটির পর একটি করে আঘাতে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত মনোবল নিয়ে নতুন কৌশল গ্রহণ করলো। ব্রিটিশ চাইলো তার প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণের বিলুপ্তি ঘটিয়ে দেশীয় দালালদের

হাতে তথাকথিত স্বাধীনতা অর্পন করা। দালাল শিরোমণি গান্ধী এবং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে তারা বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। ভারতের জাতীয় মুক্তি যে সশস্ত্র পথে ব্যাপকতা সৃষ্টি করবে, এবং একদিন তা সঠিক মত ও পথ ধরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামান্তবাদ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামে রূপ লাভ করবে আর এর নেতৃত্ব যে চলে যাবে মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের হাতে—ফলে চিরতরে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ এবং দেশীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের ঘটবে মূল উৎপাটন—সেই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ ও তার এদেশীয় দালাল—গান্ধী, জিন্নাহ্‌ নেহেরুর চোখে ঘুম ছিলো না। তাই যতবার দেশে গণআন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছে, জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তাক্ত পথে হাতিয়ার তুলে নিয়েছে—তখনই চতুর গান্ধী অহিংসার ধ্বজা ধরে সেই আন্দোলনের টুঁটি টিপে শ্বাসরোধ করেছে। জনতার কাছে আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন আর অন্যদিকে ব্রিটিশের সঙ্গে আপোস-আলোচনা একইসঙ্গে চালিয়ে গেছে গান্ধী। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে জনগণ খুবই ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছে বারবার। বুদ্ধিজীবিরা দলে দলে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ছেড়ে নেমে এসেছে পথে, শ্রমিক এসেছে কল-কারখানা ফ্যাক্টরীর চাকা অচল করে দিয়ে। তাদের কণ্ঠে শ্লোগান—স্বাধীনতা চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার, জেল, জুলুম, ফাঁসি, গুলি কোনো কিছুই তাদের কণ্ঠের সৌর্যকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি। পারেনি তাদের সুপ্রিয় বাসনাকে বুকের উষ্ণতা থেকে কেড়ে নিতে।

দেশীয় দালাল গান্ধী জনগণের বুকে চাকু চালিয়েছে বারবার। যদিও সে বাঙলায় শ্লোগান তুলেছে চড়কা কাটো কিন্তু তার নিজের গুজরাটে গড়ে তুলেছে কাপড়ের মিল। কল কারখানা। অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে শত শত 'সত্যাগ্রহী' যখন কারারুদ্ধ, সমগ্র দেশ জুড়ে আন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরার জন্যে সরকারী নিপীড়ন চলছে—তখন গোরখ্‌পুরের চৌরি-চৌরাতে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে থানা দখল করে এবং প্রায় বাইশ জন পুলিশকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করে। বিশ্বাসঘাতক সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ক্লিব গান্ধীর মাথায় আগুন ধরে গেলো। না, আন্দোলন চলতে দিলে বামপন্থীরা এর সুযোগ গ্রহণ করবে—নেতৃত্ব বেহাত হয়ে যাবে। আর তাই যদি হয় তাহলে এদেশে বৃহৎ পুঁজি গড়ে তোলার স্বপ্ন—স্বপ্নই রয়ে যাবে। বেইমান গান্ধী বেইমানী

করলো। প্রত্যাহার করলো আন্দোলন। এমন কি কংগ্রেসের বড়ো বড়ো কর্তারা পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রত্যাহার করায় ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করে। সুভাষ বসু একে 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে আখ্যায়িত করেন।

দেশবাসী যখন নিজেদের হাতে 'বদলা' নিতে এগিয়ে আসছে, অহিংসার প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগান সঘৃণায় আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হিংসার পথে হাতিয়ার তুলে নিতে আগ্রহী ঠিক সেই মুহূর্তে দালাল গান্ধী এই বলে আন্দোলন প্রত্যাহার করলো—'দেশবাসী অহিংস আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত নয়।' এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ অহিংস আন্দোলনের চাইতে সহিংস পথকেই সঠিক বলে মনে করছে। তাই গান্ধীর শ্রেণী স্বার্থ টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়াই তার যথাযথ পদক্ষেপ। টাটা-বিড়লাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে সবরমতি আশ্রমের সন্ন্যাসী ভেকধারী দুরাত্মা গান্ধীর কিছুতেই বঞ্চিত হলে চলবে না, চলতে পারে না। আর এজন্যেই টাটা-বিড়লারা তাকে 'মহাত্মা' আখ্যানে 'দেবতা' বানিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ চায় পৃথিবীর উন্নতশীল সমস্ত দেশেই তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাসকে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে তুলে সেই সেবাদাসকে দিয়ে জনগণকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সিদ্ধ করা। এদিক থেকে গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঠিক নির্বাচন। বারবার আন্দোলন প্রত্যাহার করার ডাক দিয়ে জনতাকে অসহায় ও বিচ্ছিন্ন করে সরকারী নিষ্পেষণের জাঁতাকলে ফেলে চতুর গান্ধী আসলে সাম্রাজ্যবাদের হাতকেই শক্তিশালী করেছে। হাজারো দমন-পীড়ন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ যা করতে পারেনি, হাটুঅব্দি কাপড় পরা নগ্ন শরীর ছাগলওয়ালা গান্ধী তার চাইতে বেশী কাজ করে দিয়েছে কেবলমাত্র মুখের কথা দিয়ে।

অপর দিকে—'The partition is the only solution'-এর নায়ক মুসলীম লীগের পতাকাবাহী মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। তার দ্বিজাতিতত্ত্ব। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' দাবী। ব্রিটিশ, জিন্নাহকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জুগিয়েছে। এই পরোক্ষ সমর্থনের কারণও খুবই স্পষ্ট। দুই ভিন্নধর্মী ব্যাপক সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে রাখতে পারলে উপমহাদেশে একটা স্নায়ু যুদ্ধাবস্থা, একটা চাপা অসন্তোষ ও উত্তেজনা চলতে থাকবে। ফলে প্রগতিশীল যে কোনো গণ-সংগ্রাম প্রতি

পদক্ষেপে বিস্মিত হবে। উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষ সাময়িক হলেও সাম্রাজ্যবাদী এই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিতে প্রভাবিত হয়েছিল ঠিকই। যার ফলশ্রুতি তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার দীর্ঘদিন পরেও আজো উপমহাদেশের বুক থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প নিশ্চিহ্ন না হওয়া। বরং বহু প্রগতিশীল গণ-সংগ্রাম ব্যাহত হয়েছে দুই সম্প্রদায়ের ব্যাপক রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে। এখনো এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অযথা সন্দেহ, পারস্পরিক অসহযোগিতার মনোভাব খুবই শক্তিশালী। বিশেষ করে বৃহত্তর ভারতের বুকে এই জঘন্য প্রতিক্রিয়ার অশুভ চক্রান্তের খেলা আজো শেষ হতে পারলো না।

কি নেহেরু, কি লালবাহাদুর, কি ইন্দিরা গান্ধী, কিম্বা মোরারজী দেশাই, কামরাজ, চৌহান, রামদয়াল শর্মা, এরা কেউই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কখনো কাজ করেনি। বরং সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন এরাই জুগিয়েছে প্রগতিশীল আন্দোলনের কণ্ঠকে টিপে মারার জন্যে। এই প্রবন্ধ যখন লিখছি তখন ভারতের আসামে চলছে উন্মত্ত দাঙ্গা। কেন আসামে বারবার দাঙ্গা হয়? এই দাঙ্গার পেছনে কাদের হাত রয়েছে? ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কি এই দাঙ্গা থামাতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। যে ইন্দিরা গান্ধী পূর্ববাঙলায় সৈন্য পাঠিয়ে তা জবর দখল করতে পারে, সেই ইন্দিরা গান্ধী আসামের দাঙ্গা থামাতে পারে না? কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী দাঙ্গা থামাবে কেন? দাঙ্গার গর্ভধারিণী তো স্বয়ং তিনিই। তারই হাতকে শক্তিশালী করার জন্যে প্রতিক্রিয়ার শাসন ও শোষণকে বহাল ও নিরাপদ স্থিতিশীল করার জন্যে, সাম্রাজ্যবাদের সেই পুরাতন খেলা 'devide and rule' এর প্রয়োগ। জনতাকে যত পার বিভক্ত কর, যত পার অনৈক্যের সৃষ্টি কর—এই সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালা হচ্ছে আজকের ইন্দিরা গান্ধীদের গলার মন্ত্র। আসামের দাঙ্গাও হচ্ছে প্রগতির কণ্ঠনালি টিপে মারার একটা পুরাতন খেলার নয়া দারোদ্‌ঘাটন মাত্র।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহও তার লাহোর অধিবেশনে ১৯৩০ সনে 'পাকিস্তান' দাবীর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী এই শ্লোগানকেই তুলে ধরেন। অর্থাৎ এটা খুবই পরিষ্কার যে, মুসলমান ধনিক শ্রেণী অমুসলীম পুঁজিপতিদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প প্রসারের প্রতিযোগিতায় তথাকথিত স্বাধীন দেশে এগিয়ে যেতে পারবে না, এই আশঙ্কা করেই তারা জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলীম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান দাবীকে শক্তিশালী করে

বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। মুসলমান ধনিক ও জোতদার-জায়গীরদার সামন্ত শ্রেণীর আরেক বিশ্বস্ত অনুচর হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী এই শ্লোগানকে বাহ্যিক দিক থেকে বিষক্রিয়ায় পরিণত করার জন্যে বহু অপপ্রয়াসে মদত দিয়েছে। ১৯৪৬ সনে বিধান পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করার ফলে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্, 'হিন্দু কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের ফল' বলে একে আখ্যায়িত করে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার আদায় করার জন্যে 'Direct Action' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নির্দেশ দেন। এতে হিন্দু-মুসলমানের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদী দালালদের তৈরী করা বিদ্বেষ আরো ভয়ানক হয়ে ওঠে। বাঙলায় তখন সোহরাবর্দী মন্ত্রীসভা। ১৯৪৬ সন। শুরু হলো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, এক ভয়ানক নারকীয় বীভৎসতায় চারদিন কোল্‌কাতার পথ-ঘাট আকাশ-বাতাস হয়ে রইলো দূষিত। এরপর ঠিক একই কায়দায় পূর্ববাঙলা, বিহার ও পাঞ্জাবে শুরু হয় পৈশাচিকতা। নিরীহ হিন্দু-মুসলমানের রক্তে সিক্ত হয়ে ওঠে নরম মাটির বুক। যুদ্ধকালীন অবস্থা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এত রক্তপাত ও পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ আর নেই।

জিন্নাহ্, সোহরাবর্দী, গান্ধী, নেহেরু এবং আজকের ইন্দিরা ও মুজিব এরা প্রত্যেকেই তো একই গাছের একই বোটার ফসল। এদের শ্রেণীচরিত্র, এদের পদ্ধতি, এদের দর্শনও তাই এক ও অভিন্ন। এরা হিন্দু নয়, এরা মুসলমান নয়, এরা পৃথিবীর দেশে দেশে হিটলার, মুসোলিনী, তেজো, চার্চিল, জনসন, নিকসনেরই প্রতিবিম্ব। এরা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যেমন হিন্দুতে হিন্দুতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়, তেমনি মুসলমানে মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়, কিম্বা এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

মূলতঃ ১৯৪২ সন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান ধনিক, জোতদার, জমিদার ও সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের স্বাধীন বিকাশ ও পরবর্তীতে শিল্পে তাদের বাজার সৃষ্টির অন্তরায়গুলোর কারণ হিসেবে দিনে দিনে যে সব দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যেও সেই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এই একই কারণে ১৯৪৬ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন যে সরকার গঠিত হয়, তাতে অবশ্য মুসলীম লীগ ও জিন্নাহ্‌র সমর্থন না থাকলেও তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের পরামর্শ অনুযায়ী মুসলীম লীগ এই সরকারে যোগদান করে।

লর্ড ওয়াভেলের এটা একটা মস্ত বড় চালাকী। কারণ প্রতি পদক্ষেপে যখন কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে প্রকাশ্য কোন্দল চলছে সেই মুসলীম লীগের সরকার একত্রে যে টিকে থাকতে পারবে না, বরং সরকারের অস্তিত্বের পতন অত্যাসন্ন হবে এবং কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে কোন্দল আরো তীব্র, আরো প্রকট হবে, যাতে 'পাকিস্তান' দাবী আরো শক্তিশালী হবে—যার পরিণতি হবে সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণের বিলুপ্তি ঘটিয়ে পরোক্ষ শাসন ও শোষণের নয়া ঔপনিবেশিক কৌশলকে বাস্তবায়িত করার একটা শক্তিশালী প্রয়াস। হলোও তাই। অন্তবর্তী সরকারের মধ্যে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলো। প্রত্যেক কাজে একে-অপরের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করলো। দলাদলি ও মত-বিরোধ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছলো যে, সংবিধান পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালো মুসলীম লীগ, ফলে সরকারের কাজকর্ম একেবারে অচল হয়ে পড়লো। ব্রিটিশ সরকারও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লো না। ভারত বিভক্তির পথ একেবারে সুগম হয়ে পড়লো জিন্নাহ্‌র "The partition is the only solution" এর বাস্তব রূপ পরিস্ফুট হয়ে গেলো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী'র ঘোষণায়। ১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে এটলী ঘোষণা করলেন—১৯৪৮ সনের জুন মাসের আগেই ভারতীয়দের হাতে ব্রিটিশ সরকার শাসনভার অর্পন করবে।

এটলী'র এই ঘোষণায় 'পাকিস্তান' এর স্বীকৃতি মিলে গেলো। মুসলীম লীগ ও জিন্নাহ্‌ স্বভাবতই তাদের শ্রেণী শোষণের চরিত্রগত কারণে একটা আলাদা ভূখণ্ড পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে উল্লসিত হলো। নীতিগতভাবে 'অখণ্ড ভারতে' কংগ্রেস তাদের শোষণ ও শাসনের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কাজে পরাজিত হলো। বাধ্য হলো 'অখণ্ড ভারত' শ্লোগান পরিত্যাগ করতে। ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকার 'Indian Independence Act' পাশ করলো, তারপর দেশ বিভাগ।

চার

"স্বাধীন পাকিস্তান" এর জন্ম হলো। কারা জন্ম দিলো এই স্বাধীন পাকিস্তানের? জনগণের সঙ্গে তাদের কতটুকু সম্পর্ক? তারা কি জনগণের বন্ধু? কাজ করে জনতার স্বার্থে?

মুসলীম লীগ শ্লোগান তুলেছিলো পাকিস্তানের পক্ষে ভোট আদায়ের জন্যে। 'লাঙ্গল যার জমি তার।' এই শ্লোগানে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত মুসলমান গরীব কৃষকেরা পাকিস্তান কায়েম করার পক্ষে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছিলো। গ্রামে গ্রামে জনসভা করে মুসলীম লীগ প্রচার করেছে—পূর্ব বাঙলায় অধিকাংশ জমিদার-জোতদার-সামন্তশ্রেণী হচ্ছে হিন্দু। পাকিস্তান কায়েম হলে এই সব জমির মালিক হবে গরীব মুসলমান কৃষকেরা। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। পাকিস্তানে কেউ না খেয়ে মরবে না। কারো অভাব থাকবে না। স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল, মিল-ফ্যাক্টরী, অফিস-আদালত, থানা-তহশীল, অফিস সর্বত্র হিন্দুদের প্রাধান্য ও প্রভাব লোপ পেয়ে সেখানে মুসলমানরা ঠাঁই পাবে। সুতরাং পাকিস্তান হবে মুসলমানদের জন্যে এক সব পাওয়ার দেশ।

পূর্ব বাঙলার শতকরা পঁচাশি জন হচ্ছে নিরক্ষর কৃষক। তাঁরা মনে করেছিলো পাকিস্তান কায়েম হলে তাঁদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, জমিদার, জোতদার, মহাজন ও সামন্তশ্রেণীর অকথ্য শোষণ এবং নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাবে। সূচীত হবে নতুন করে জীবনযাত্রার সুখ ও সমৃদ্ধিময় পরিবেশের। অনেক আশা, অনেক রঙীন স্বপ্ন গড়ে উঠেছিলো যুগ যুগ বঞ্চিত, ক্ষুধিত, গরীব ও ভূমিহীন সর্বহারা কৃষকের বুকে। কিন্তু সে স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে গেলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—'ব্রিটিশ সিংহে'র দাঁত নখ একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেলে—বিশ্বের অনেক উন্নতিশীল দেশের মতো পূর্ববাঙলা তথা সমগ্র পাকিস্তানের উপরে নেমে আসে পৃথিবীর নব উত্থিত শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের আগ্রাসন।

১৯৪৭ সনের পূর্বে ও পরে ভারতের বামপন্থী শক্তি ছিলো খুবই অসংগঠিত ও সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ এবং গণশক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত, ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্যেই জনগণ সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগের ধোঁকাবাজিতে বিভ্রান্ত হয়। অবশ্য এই বিভ্রান্তি (৪৭ এর পরে) পূর্ববাঙলায় খুবই দ্রুততার সঙ্গে কেটে যেতে শুরু করে। বিভ্রান্তি যে খুবই দ্রুততার সঙ্গে কেটে যাবে এটা পাকিস্তানের বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী প্রাধান্যে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ভালোভাবেই জানতো। তাঁরা

জানতো পূর্ববাঙলা অশান্ত হয়ে উঠবে। তারা অধিকারের প্রশ্নে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠবে। এবং সেই সচেতনতাই তাঁদেরকে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলোনে ব্রতী করবে। (তাই মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তান জন্মের পর পরই ঘোষণা করেন "আমরা আজ থেকে সবাই পাকিস্তানী। কেউ আর বাঙালী, বেলুচি, পাঞ্জাবী বা সিন্ধি নই) জিন্নাহ্‌র এই ঘোষণায় প্রমানিত হয় জাতিসত্ত্বা অস্বীকার করে বিভিন্ন জাতির জন্মগত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে খর্ব করে, প্রতিক্রিয়াশীল এক কেন্দ্রীয় শাসন ও শোষণের জগদ্দল পাথর জনগণের উপরে চাপিয়ে দেয়া। (১৯৪৮ সনে ঢাকার কার্জন হলে জিন্নাহ্ অত্যন্ত জঘন্যভাবে বক্তৃতা দিয়ে বলেন 'উর্দু ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। যারা এর বিরোধীতা করবে তারা পাকিস্তানের শত্রু।' জিন্নাহ্‌র এই ঘোষণার পরে ঢাকায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এবং মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্র লীগের কয়েকজন যুবক জিন্নাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মোহাম্মদ তোয়াহা জিন্নাহ্‌র 'একমাত্র উর্দু ই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জাতির ভাষার স্বীকৃতির দাবি তোলেন। জিন্নাহ সরাসরি এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং উত্তেজিত ছাত্র সমাজকে আপোসের মনোভাব গ্রহণ করার উপদেশ দেন।

বাঙলা ভাষার উপরে জিন্নাহ্‌র এই আক্রমণ ছিলো সুপরিকল্পিত, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে পূর্ব বাঙলার কাঁচামালের বাজারকে নিরাপদ করে রাখতে হবে। সেখানে কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা যাতে গড়ে উঠতে না পারে, নিরক্ষর পঁচাশি জন কৃষক যাতে গ্রীবা টান করে সোচ্চারিত কণ্ঠে না বলতে পারে—'অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই'। বাঙালী জাতি যেন তথাকথিত পাকিস্তানী শিক্ষা ও তমুদ্দুনের বিবরে নিমজ্জিত হয়ে অথর্ব হয়ে যায়—তারই জন্যে আক্রমণ বাঙলা ভাষার উপরে। এ আক্রমণ শুধু ভাষার উপরে নয়, এ আক্রমণ সমগ্র বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেয়ার আক্রমণ। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ, জোতদারী-মহাজনী ও মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজির নির্বিরোধ বিকাশ সাধনের জন্যে এই আক্রমণ।

একটি জাতিকে পঙ্গু করে দেয়ার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা হামলা চালায় তার সংস্কৃতির উপরে। যেমন সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

বর্তমান দুনিয়ায় তার অর্থনৈতিক শোষনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তির মাধ্যমে তাদের দেশের পঁচা-গলা অশ্লীল চলচ্চিত্র, বই-পত্র ইত্যাদি খুবই সস্তায় সরবরাহ করে। সংস্কৃতির প্রভাব সব চাইতে বেশী বলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উন্নতশীল দেশের হতাশাগ্রস্ত কর্ম-সংস্থানহীন যুবক সম্প্রদায়ের সামনে প্রগতি বিরোধী, প্রতি বিপ্লবী, উলঙ্গ-অশ্লীল চলচ্চিত্র, বইপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণের, অসুস্থ মানসিকতা সৃষ্টির যাবতীয় খোরাক এনে হাজির করে। এর প্রভাবে প্রভাবিত হয় খুবই তাড়াতাড়ি উন্নতিশীল দেশের জনগণ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র কৌশলও ঠিক এই একই ধারায় তৈরী। নগ্ন চলচ্চিত্র, নাটক, নভেলের বদলে বাঙালীরা যে ভাষা বোঝে না, জানে না, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যে আচার আচরণের সঙ্গে বাঙালী জাতির পরিচয় নেই, কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের ঘাড়ে চাপানোর প্রচেষ্টা চললো সেই উর্দু ভাষার জোয়াল। ইসলামের নামে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাহাড় চাপিয়ে দেয়া। যাতে বাঙালী জাতি, জাতিসত্ত্বা হারিয়ে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হয়। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে বাঙালীদের সংখ্যা তখন ছিলো শতকরা ৫৬% জন। আর উর্দুভাষী জনগণের সংখ্যা হলো মাত্র ৬জন। এ থেকেই বোঝা যায়—জিন্নাহ্‌র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রয়াস, তার পেছনে ছিলো এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র। জিন্নাহ্‌ মনে করেছিলো, সে পাকিস্তানের স্রষ্টা, "কায়েদে-আজম" অর্থাৎ 'জাতির পিতা', সুতরাং তার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে বাঙালীরা টু শব্দ করার সাহস পাবে না। এক বাক্যে শান্তশিষ্ট বালকের মতো তার কথা সবাই মাথা নত করে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু বাস্তব বড়োই নির্মম, ষড়যন্ত্র যেখানে তার তীক্ষ্ণ দাঁত নখ থাবা উঁচিয়ে আগ্রাসী চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসবে—ঐতিহাসিক কারণেই প্রতিরোধ শক্তিও তার পাশাপাশি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে। না দাঁড়ানোটাই হলো ব্যতিক্রম। ইতিহাস সাধারণভাবে ব্যতিক্রমবাদকে মেনে নিতে পারে নি। পারবেও না। তাই জিন্নাহ্‌র ঘোষনার বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার বুদ্ধিজীবিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

এই সময় পূর্ববাঙলার বামপন্থীরা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী মুৎসুদ্দি পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দেশীয় দালালদের প্রতিভূ পাকিস্তান সরকারের প্রকৃত স্বরূপ জনগণের সামনে তুলে ধরার উদ্যম গ্রহণ করলে—চরম প্রতি-

ক্রিয়াশীল মুসলীম লীগ সরকার পূর্ববাঙলার বামপন্থী দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে রাশিয়া ও ভারতের এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করে তাঁদেরকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে। এবং তাঁদের সঙ্গে জেলখানার মধ্যে চোর-ডাকাতদের মতো ব্যবহার করতে থাকে। জনগণের মধ্যে ব্যাপক কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচার চালাতে শুরু করে। সর্বত্র প্রচার করা হতে থাকে—কমিউনিষ্টরা পাকিস্তানের শত্রু, ইসলামের শত্রু, তাঁরা বিদেশী এজেন্ট। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও প্রায়শই বামপন্থীদের উপরে গুণ্ডামী চলতে থাকে। ১৯৫০ সনের ২৪শে এপ্রিল পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত জঘন্যভাবে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে, খাপরা ওয়ার্ডের একটি শেলের মধ্যে বন্দী করে, শিকের ফাঁকে রাইফেল বসিয়ে সাতজন বিপ্লবী দেশপ্রেমিককে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করে। এরা সবাই কৃষক সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আজো খাপরা ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডের খবর এই উপমহাদেশের খুব কম মানুষই জানে। আজো শহীদ আনোয়ার হোসেন, কম্পোরাম সিং, মুহম্মদ হানিফ, সুখেন, সুধীন, দেলোয়ার হোসেন ও বিজন-এর আত্মত্যাগ সফল হয়ে ওঠেনি। 'সেই সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলে আজো ভারতের মতো 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে' জেলখানায় চলছে দেশপ্রেমিক হত্যা।' নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই। যেমন প্রতিবাদ ওঠেনি মুসলীম লীগ সরকারের খাপরা ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন তো আর ১৯৫০ সনের অন্ধকার যুগ নয়। সমগ্র পৃথিবীতে যখন ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিকতার নাগপাস ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শোষণহীন, বঞ্চনা, নিপীড়নহীন এক সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে উঠেছে লড়াই করার ঢেউ—ঠিক সেই যুগে বসে 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে জেলের মধ্যে যে সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হচ্ছে—ভারতের বুদ্ধিজীবিরা, বামপন্থীরা—তার বিরুদ্ধে কেনো প্রতিবাদমুখর, কেনো গণসংগ্রাম গড়ে তুলছেন না? সংগ্রাম গড়ে না তোলাই হলো প্রতিক্রিয়ার হাতকে শক্তিশালী করা। আঘাত না করাই হলো প্রতিক্রিয়াকে আঘাত হানার সুযোগ করে দেয়া। ভারতের বুকে বামপন্থীদের দুর্জয় লড়াই চলতে থাকলে—কিছুতেই ফ্যাসিবাদ তার অশুভ থাবা বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। এর বিপরীত কিছু হলেই বরং প্রগতির মেরুদণ্ড গুড়িয়ে দেবার মতো অত্যন্ত ভয়াবহ আঘাত নেমে আসবে। এখন যা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটছে—একদিন তা নিরবিচ্ছিন্ন আঘাতে রূপান্তরিত হবে।

আমরা মুসোলিনীকে চিনি। মুসোলিনীর ইতিহাস আর বর্তমান ভারতের শাসকশ্রেণীর ইতিহাসের মধ্যে কেবল কৌশলগত পার্থক্য ছাড়া চরিত্রগত কোনো পার্থক্য নেই। শ্লোগানেরও কোনো পার্থক্য নেই। 'জনতার আওয়াজ'কে মুসোলিনী নিজের আওয়াজ বলে প্রচার করে, জনতাকে ধোঁকা দিয়ে, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সুসংহত করে, নিজেকে মেহনতি জনতার বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, একদিন পৈশাচিক উল্লাসে—স্বদেশের বুকে বামপন্থীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মুসোলিনী। নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো হতচকিত বামপন্থীদেরকে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী 'অকস্মাৎ আক্রমণ'-এর কাছে দাঁড়াতে পারেনি প্রগতিশীলরা। বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম প্রগতির শিবির। আর আজ ভারতের শাসকশ্রেণীও সেই একই নামাবলী গায়ে চড়িয়ে জনতার 'গরিবী হটাও' আওযাজকে নিজেদেব আওয়াজে পরিণত করেছে। জনতার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনের শ্লোগান হিসেবে বেছে নিযেছে। এসবই করছে তারা তাদের আক্রমণ করার অশুভ শক্তিকে সংগঠিত ও সুসংহত করার জন্যে। নিজেদেরকে শক্তিশালী করেই একদিন অশুভ শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়বে আকাশ থেকে নেমে আসা শবাধারভোগী রক্ত ওষ্ঠাধর শকুনের মতো—ভারতের প্রগতি-শিবিরের উপর।

জেলের মধ্যে বেছে বেছে বামপন্থী হত্যা, থানায় নিয়ে গিয়ে মেয়েদের উপরে বর্বরচিত ধর্ষন, মা-বাবার সামনে তরুণ যুবককে ফ্যাসিবাদী গুণ্ডার কুপিয়ে হত্যা করা, পথ থেকে প্রগতি-শিবিরের লোকজনকে গুম করে খুন করে ফেলা, পুলিশ, সি. আর. পি লেলিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ হামলা করে গুপ্ত ভাবে ডজন ডজন তরুণ যুবককে মেরে ফেলে—অন্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দোষ চাপিয়ে দেয়া, হেমন্ত বসুদের মতো প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করে—প্রগতিশীলদের ঘাড়ে তার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া, গুপ্তভাবে ও প্রকাশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া, অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের সংগ্রামে অফিস আদালতে জনগণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিবাদীদের চেয়ার দখল করা, আঞ্চলিক ভাবে প্রগতিশীলদের নাম তালিকাভুক্ত করে স্ব-এলাকা থেকে তাঁদেরকে উচ্ছেদ করা, বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা, চাকু, ছুরি, পিস্তল, রাইফেল দেখিয়ে ভোট গ্রহণ করা, ক্ষমতার যথেচ্ছচারিতা এবং সি. পি. আই. এম. এল নেতা চারু মজুমদারকে বন্দী অবস্থায় খুন করার

সমস্ত দৃষ্টান্তই হলো ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন। ফ্যাসিবাদ 'আধা' হয়ে তার আগ্রাসী চরিত্র সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। ফ্যাসিবাদ সুপরিকল্পিত—সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের চরিত্রধারী। ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঘটে প্রাথমিক স্তরে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডে খণ্ডে। এটাই তার পরবর্তীতে সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের পূর্বাভাস। বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যাখ্যাত ছাড়া ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী থাবাকে প্রতিহত করা যায় না।

অথচ ভারতের বিপ্লবী শক্তি আজো প্রস্তাবপাশের রাজনীতির মধ্যে সাংগঠনিক শক্তিকে বেড়া দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছেন ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ এলে 'বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন' শুরু করার আশা নিয়ে। এই বামপন্থী রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তাই ফ্যাসিবাদের হাতকে শক্তিশালী করছে। আক্রমণ করার সুযোগ ও সাহস বাড়িয়ে দিচ্ছে। এবং বামপন্থী মহল তাঁদের সাংগঠনিক কাঠামোকে প্রত্যেক স্তরে প্রকাশ্য করে রেখে—বরং রাজনীতিকেই গোপন করে রেখে—ফ্যাসিবাদের নগ্ন আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এই কৌশল হলো আত্মঘাতী কৌশল।

(যাইহোক, ১৯৫০ সনের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে লীগ সরকারের যে সুপরিকল্পিত বামপন্থী হত্যা—তা ছিলো জনগণের সচেতন অংশ প্রগতিশিবিরের মধ্যে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করারই অপপ্রয়াস। মুসলীম লীগ চেয়েছিলো পাকিস্তানে দ্বিতীয় আর কোনো রাজনৈতিক দল যেন গড়ে উঠতে না পারে। উগ্র ধর্মীয় মতবাদ ও পাকিস্তানভিত্তিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্ধ নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা তাই তারা ১৯৪৭ সনের পর থেকেই পূর্ব বাঙলার বুকে জোরদার করে তোলে। শাসকশ্রেণী জানে না যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে—শ্রেণী দ্বন্দ্ব কখনো চাপা থাকে না, কিম্বা একই পর্যায়ে ও একই স্তরে থাকে না। দিন দিনই তা প্রকট হয়ে ওঠে। 'বিন্দু থেকে একদিন সিন্ধু'তে রূপ লাভ করে। পূর্ব বাঙলার বুকেও সেই একই কারণের নিয়মেই ১৯৫০ সনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আওয়ামী মুসলীম লীগ। পরে এই আওয়ামী মুসলীম লীগই—বামপন্থীদের চাপে মুসলীম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ হিসেবে গঠিত হয়।)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসার ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ

আলী খানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে—এবং লিয়াকৎ আলী খান এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মাথায় টনক পড়ে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত হয়েছিলো—যদি লিয়াকৎ আলী খান সোভিয়েত ইউনয়নে যায়, তাহলে তাদের সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থ চরিতার্থ হতে বিঘ্ন ঘটবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের মৈত্রী গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্যেই লিয়াকৎ আলী খানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খুবই দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। লিয়াকৎ আলী খান প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী না হলেও সম্ভবতঃ সদ্যজাত পাকিস্তানকে আমেরিকার কাছে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিতে রাজি হয়নি, কিম্বা তাদের কথায় ঐক্যমতে পৌছতে পারেনি, যার ফলশ্রুতি হলো ভয়ানক। আমেরিকা সফর করে ফিরে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যে পিণ্ডিতে এক জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন লিয়াকৎ আলী খান। এ ঘটনা জনমনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রতিক্রিয়াশীলরা বামপন্থী মহলের উপরে দোষ চাপিয়ে—'ভারতের এজেন্টদের কাজ বলে' অপপ্রচার চালায়। এমনকি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারী এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হঠাৎ করে খুন হয়। এর পেছনে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই অদৃশ্য হাত কাজ করেছে। তাতে এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারন তখন থেকে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমেরিকা পূর্ব বাঙলা তথা পাকিস্তানের অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পুতুল বদলের কারিগর হিসেবে কাজ করছে। এ কাজে তাকে সহায়তা করেছে পাকিস্তানের জোতদার-জমিদার, মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজির স্বার্থবাহী দালাল শ্রেণী। পশ্চিমের গোলাম মোহম্মদ, আবুল আলা মওদুদী, খান আবদুল কাইয়ুম খান, আওয়ামী লীগের নবাবজাদা নসরুল্লা, জি. এম. সৈয়দ ও গাউস বক্স বেজেঞ্জো, মমতাজ দোলতানা, চৌধুরী মুহম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা, জেনারেল আয়ুব, জুলফিকার আলী ভুট্টো, ইয়াহিয়া প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাস আর তার সঙ্গে ছিলো পূর্ববাঙলার সাম্রাজ্য-বাদের এক নম্বরের পেয়ারের লোক—হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী, শেখ মুজিবর রহমান, আওয়ামী লীগ পত্রিকা ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা, পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার মালিক—মুৎসুদ্দি হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, শাহ আজিজুর রহমান, নুরুল আমিন, আবু হোসেন সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং পরে প্রধান মন্ত্রী

বগুড়ার মুহম্মদ আলী প্রমুখ অসংখ্য সেবাদাসের দল এরাই রক্ষা করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ অত্যন্ত বিনয়, একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করছি, শেখ মুজিব কতটা ক্ষমতালোভী ও চক্রান্তের নায়ক—তার প্রমান আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে (বামপন্থীরা ছাড়া) সব চাইতে বেশী সাংগঠনিক শক্তিশালী নেতা (যাকে শেখ মুজিবরা ভয় করতেন) টাঙ্গাইলের সামসুল হককে কারা চক্রান্ত করে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়েছিলো? আজো সচেতন রাজনীতিবিদদের ও কর্মীদের মনে এই প্রশ্নটি চাপা দেয়া রয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকাশ্যেই আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের হোতারা এই প্রশ্নটিকে সঙ্গে সঙ্গে ছাই চাপা দিয়েছে। ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে। এমন কি অনেক কর্মীকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়েছে এই প্রশ্নের উল্লেখে। ক্ষমতালোভী শেখ মুজিব জানতেন, সামসুল হক আওয়ামী লীগে থাকলে তার পক্ষে 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' নেতা হওয়া সম্ভব নয়। ক্ষমতা দখলের প্রতি-যোগিতায় তার মতো উগ্রমস্তিষ্কের (রাজনীতিশূন্য মগজ বলে মওলানা ভাসানী যাকে অভিহিত করেছেন) লোক টিঁকে থাকতে পারবে না। সুতরাং পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিতে হবে। সামসুল হককে তাই রাজনীতির জগৎ থেকে চিরতরে বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে সরে পড়তে হয়েছিলো। পরে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিলো সামসুল হক। বর্তমানে আওয়ামী লীগের অনেক নতুন কর্মীই এই ষড়যন্ত্রের ইতিহাস জানে না। জানলেও তাদের কিছুই আসে যায় না। স্বার্থবাদীতাই যাদের আদর্শ, ষড়যন্ত্রই যাদের রাজনীতি, বিদেশী ও দেশী শোষকদের পদসেবা করাই যাদের সাংগঠনিক ভিত্তি, তাদের এ নিয়ে মাথা ব্যথা হবে কেনো? তবুও মনে রাখতে হবে ইতিহাস একদিন সমস্ত ষড়যন্ত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করবেই। ইতিহাস বড়ো নির্মম, বড়ো অপ্রিয় সত্য।

(১৯৫২ সনে খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধান মন্ত্রীত্বকালে পূর্ববাঙলার বুকে ঘটলো প্রথম গণবিস্ফোরোন। বাঙলাভাষার স্বীকৃতির দাবীতে এই গণবিস্ফোরনের নেতৃত্ব দিয়েছে সংগ্রামী বামপন্থী ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক নেতারা।) অনেক মেরুদণ্ডহীন, সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট ও মস্তোবড়ো ডিগ্রীর সাইনবোর্ডধারী বুদ্ধিজীবিরা ইতিহাস লিখতে গিয়ে শেখ মুজিবর রহমানের 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বে'র কথা লিখে শেখ মুজিবের শুভদৃষ্টি পেতে চেয়েছে (সুস্পষ্ট-

ভাবে জানা দরকার, শেখ মুজিব ২১শে ফেব্রুয়ারীর দুর্জয় গণবিস্ফোরোনের নেতৃত্বে ছিলেন না। পাবনার আবদুল মতিন (ছাত্র মতিন নামে খ্যাত) বগুড়ার গাজিউল হক ও মুহম্মদ তোয়াহা প্রমুখের নেতৃত্বেই সংঘঠিত হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারীর দুর্জয় গণআন্দোলন। আবদুল ছিলেন ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক। এরা তিন জনেই বামপন্থী বলে সুপরিচিত। বিশেষ 'করে মুহম্মদ তোয়াহা বরাবরই শাসকশ্রেণীর সমস্ত চাপ অগ্রাহ্য করে বাঙলা ভাষা তথা বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার শাসক ও শোষক শ্রেণীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সুতীব্র আঘাত হানার স্বপক্ষে কাজ করেছেন, শেখ মুজিব তখন জেলে। এই সময় খাজা নাজিমুদ্দিন এক ঘোষণায় ১৯৪৮ সনে জিন্নাহর কার্জন হলের সেই একই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে বলে যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাঙলার মানুষ আবার গর্জে উঠলো। শোষক শ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রের কাছে কিছুতেই বাঙালী জাতি তার অস্তিত্ব বিকিয়ে দিতে পারে না। কুখ্যাত নুরুল আমিন তখন পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী। এই বিশ্বাসঘাতক লোকটি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে—'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এই মর্মে আলোচনার জন্যে একটি বিল উত্থাপন করে। স্পীকার এটি আলোচনার জন্যে গ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য করে আলোচনার জন্যে।

গর্জে উঠল ছাত্র সমাজ ঢাকা শহরে। ব্যাপকভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার জন্যে চারিদিকে চলল সভা-মিছিল প্রচার। বিক্ষোভের ঝড় উঠল। কিছুতেই তাঁরা পরিষদে বাঙালী জাতিসত্বাকে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেবে না। ছাত্রসমাজ নির্ভীকতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল—২১শে ফেব্রুয়ারীতে তাঁরা পরিষদভবন ঘেরাও করবে। আইন সভার অধিবেশন ভেঙে দেবে। শাসকশ্রেণী ভয়ে ১৪৪ ধারা জারী করল ঢাকাতে। মিছিল-মিটিং-সমাবেশ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী যে কোনো ধরণের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয়া হল।

* সব চাইতে মজার ব্যাপার—যিনি এখন 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছেন এবং আওয়ামী লীগের যারা এখন প্রচার করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যে, তারাই ভাষা আন্দোলনের উদ্গাতা, সেই আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রাদেশিক সম্পাদক ছাত্রদেরকে উপদেশ খয়রাত করে নিষেধ করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা

যেন কোনো হঠকারীতা না করে অর্থাৎ সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে যখন বিক্ষোভ দাউ-দাউ করে জ্বলছে, চূড়ান্ত উপসংহারের জন্যে যেকোনো আত্ম-ত্যাগে তাঁরা প্রস্তুত, ঠিক সেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ ছাত্র সমাজকে সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার কথা বলেছে। শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের ভয় দেখিয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে কি বলা যায়? সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়া? নাকি সংগ্রামের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করা?

২০শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের অ্যাকশন কমিটি এই জরুরী পরিস্থিতিতে সভা আহ্বান করে, এই সভায় অ্যাকশন কমিটির পনেরোজন সদস্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের উপদেশে প্রভাবিত এগারোজন সদস্য ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরুদ্ধে তাদের অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু তার মধ্যে চারজন ছাত্র প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী লাইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আইনসভা ভবন ঘেরাও করার পূর্ব সিদ্ধান্তে দৃঢ় ও অবিচল থাকে। ফলে উভয়পক্ষে চরম বাদানুবাদ হয়। এদিকে সাধারণ ছাত্রসমাজ চারজন ছাত্র নেতার সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রেরা এগারো জনের সংগ্রাম বিমুখী নীতির তীব্র সমালোচনা করে ও যে কোনো নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দৃঢ় মনোবল ও অটুট সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করে। শেষ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভেঙে আইনসভাভবন ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্রসমাজ পরের দিনের সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করে।

ভীত সন্ত্রস্ত সরকার ব্যাপক দমন পীড়ন এবং গ্রেফতারী চালিয়েও ছাত্র সমাজকে তাঁদের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ পরদিন সমবেত হল ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে। চারদিকে তখন সশস্ত্র পুলিশ টহল দিয়ে ফিরছে। মেডিকেল কলেজের সামনে তৈরী করা হয়েছে সশস্ত্র পুলিশের বেরিকেড। পায়তারা কষছে পুলিশবাহিনী। ছাত্ররা বাইরে এলেই তাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়বে এরকম একটা আভাস পুলিশের অবস্থানের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছিল। সমগ্র ঢাকা নগরী দারুণ একটা ঝড়ের প্রতীক্ষায় তখন থম্‌থম্‌ করছিল।

ছাত্ররা ঠিক করে ফেললো তারা দশজনের এক একটি গ্রুপ হিসেবে ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্যে আইনসভা ভবনের দিকে এগিয়ে যাবে। গ্রেফতার হলেও সঙ্গে সঙ্গে আরো দশজন করে তাঁরা শ্লোগান দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

লাউড স্পীকারে ছাত্র সমাজের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং দৃঢ় চিত্তে সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রামে এগিয়ে যাবার জন্যে বক্তৃতা চলছিলো। শ্লোগান চলছিলো 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।' 'তোমার ভাষা আমার ভাষা—বাংলাভাষা বাংলাভাষা'। ('বিশ্বাসঘাতক নূরুল আমিন নিপাত যাক।') '১৪৪ ধারা মানি না মানবো না।' শ্লোগান দিতে দিতে দশজনের এক একটি গ্রুপ বেরিয়ে পড়লো রাজপথে। ভেঙে ফেললো সরকারের দণ্ডমুণ্ডের আইন। দুর্জয় ছাত্রসমাজের পায়ের তলায় পিষ্টিত হলো শাসক ও শোষকের অন্যায় আস্ফালন। চললো গ্রেফতারী। একে একে অনেকগুলো গ্রুপ স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করলো। সমগ্র ভার্সিটি এলাকা তখন শ্লোগানে শ্লোগানে সামুদ্রিক গোর্কির মতো প্রমত্ত। কাঁদুনে গ্যাসের শেল ছুড়তে শুরু করলো পুলিশ। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অভ্যন্তরে, হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের অভ্যন্তরে পর্যন্ত শেল পড়তে লাগলো বুম্ বুম্ শব্দে। রোগীদের জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো। কোনো রকম নিয়ম-কানুনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে হাসপাতালের অভ্যন্তরে শেল নিক্ষেপের জন্যে ছাত্রদের মধ্যে আরো প্রচণ্ড ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। ইট পাটকেল দিয়ে ছাত্ররাও শুরু করে পাল্টা আঘাত। উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকে। ক্রমে এই সংঘর্ষ সমগ্র ভার্সিটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি চালায়। আইনসভা ভবনের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় চারজন ছাত্র। হাইকোর্টের কাছে শফিকউদ্দীন নামে একজন কেরানী ও বংশাল রোডের কাছে নয় বছরের একজন কিশোর ওয়ালি উল্লাহ সহ আবুল বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার ও আরো অনেকে শহীদ হয়।

রক্তপাতের বন্যায় সমগ্র পূর্ব বাঙলা রুদ্ররোষে গর্জে ওঠে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর ছেড়ে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে রাজপথে—অত্যাচারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাঁরা গড়ে তোলে দুর্জয় প্রতিরোধ। ক্রমে এই আন্দোলন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় কারখানা, ফ্যাক্টরী, অফিস-আদালত। ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, কৃষক-শ্রমিক সব একাকার হয়ে গড়ে তোলে প্রতিরোধের সুকঠিন প্রাকার। শ্লোগান ওঠে ক্ষিপ্ত জনতার কণ্ঠে 'নূরুল আমিনের রক্ত চাই, রক্ত চাই মুণ্ডু চাই।'

গুলি চালনার প্রতিবাদে আইনসভা থেকে বেরিয়ে আসেন পূর্ব বাঙলার কয়েকজন প্রতিনিধি। অধিবেশন মুলতুবী হয়ে যায়। পরে সরকার বাধ্য হয়ে

প্রতিশ্রুতি দেয়—বাঙলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হবে।)

(শাসক ও শোষক শ্রেণীর এই পরাজয় সম্ভব হয়েছিলো৷ বামপন্থীদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় বাধার মুখে বাঁধ ভাঙা আন্দোলনের বন্যা সৃষ্টি করার মহান ও নির্ভীক সাংগঠনিক দৃঢ়তায়। আপোসপন্থী আওয়ামী লীগ সব সময়ই ভয় পেয়েছে তীব্র গণ সংগ্রামে। (ভয় পেয়েছে(বামপন্থীরা সংগ্রামের সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরই প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের উপরে আঘাত হানবে। (এই কারণেই ২০শে ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সম্পাদক সরকারের দমন নীতির কাছে সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে মাথা নত করার পরামর্শ দিয়েছিলো। সেদিন যদি ছাত্রদের অ্যাকশন কমিটির সংখ্যালঘু চারজন ছাত্র আওয়ামী লীগের প্রতিবিপ্লবী লাইনের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই না করতো, তাহলে বাঙালী জাতি-সত্বার বিলুপ্তি ও তাঁদের উপরে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি পুঁজির শাসন ও শোষণ-পীড়ণকে স্থিতিশীল করার কাজ আরো জোরদার হতো নিঃসন্দেহে।)

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাঙলার জনগণ তাঁদের উপরে চেপে বসা তিন পাহাড়ের শোষণের বিরুদ্ধে সেদিন সোচ্চার হয়েছিলো। আর নিজেদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়ে, সমস্ত প্রতিক্রিয়া ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে শহীদেরা ভবিষ্যতের বৃহত্তর সংগ্রামের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়ে গেলো—বিশ্বাসঘাতকেরা হুশিয়ার। বুঝিয়ে দিয়ে গেলো—পূর্ব বাঙলা কোন ষড়যন্ত্র, কোন চক্রান্তের রক্তচক্ষুকে পরোয়া করে না।)

পাঁচ

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হলে, মুসলীম লীগের সংগঠন ও সমর্থন প্রায় ভেঙে পড়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌছলো। হতাশাগ্রস্ত সংগঠনকে টেনে দাঁড় করানোর জন্যে লীগ নেতৃবৃন্দ আবার তোরজোর শুরু করলো। পূর্ব-বাঙলায় নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলীম লীগ তার ডুবে যাওয়া তরী পুনরুদ্ধারের জন্যে মরীয়া হয়ে প্রচার অভিযান শুরু করলো।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ও নির্বাচিত সেবাদাস মুহম্মদ আলী তখন প্রধানমন্ত্রী। আবুল কাশেম ফজলুল হক তখন 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' গঠন করে তার কতিপয় সংস্কারবাদী নীতির জন্যে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

মওলানা ভাসানী তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে মুসলীম লীগকে নির্বাচনে পরাভূত করার জন্যে মুসলীম আওয়ামী লীগের তরফ থেকে মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হক 'যুক্তফ্রণ্ট' গঠন করে মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। এই নির্বাচনেও ভাষা আন্দোলনের মতো ব্যাপক গণজাগরণ দেখা যায়। নির্বাচনে মুসলীম লীগের পরাজয় ঘটে খুবই শোচনীয় ভাবে। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পূর্ববাঙলার বুক থেকে মুসলীম লীগের অস্তিত্ব। শাসক শ্রেণী কল্পনাও করেনি তারা এইভাবে পূর্ববাঙলায় মার খাবে। ক্ষিপ্ত লীগ সরকার তাই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। তারা বুঝতে পারে, সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কখনই তারা তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। সোজা পথ তাই ছেড়ে দিয়ে বেছে নেয় কুৎসিত জঘন্য ষড়যন্ত্রের পথ। পেছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জুগিয়ে চলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত।

ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ববাঙলায় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ করল। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভায় শেখ মুজিবর রহমান হলেন শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হলেও আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের পক্ষবাদী বামপন্থী অংশের দ্বন্দ্ব ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছিল। কেননা পূর্ব বাঙলা তথা সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনীতিকে কব্জা করার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় খুঁজছিল। কোরিয়ায় মার খেয়ে পূর্ব বাঙলাকে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খলে বেঁধে, সমাজতন্ত্রের দুর্গ গণচীনের বিরুদ্ধে ঘাঁটি করার জন্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের জোতদার-জায়গীরদার, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রের ময়দানে নেমে পড়ে। এই ষড়যন্ত্রের কথা তৎকালীন পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিল্‌ড্রেথের নগ্ন ঘোষণাতেই প্রকট হয়ে ওঠে। হিল্‌ড্রেথ দাম্ভিকতার সঙ্গে ঘোষণা করে 'পূর্ব বাঙলার নির্বাচন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হবে না।' ওই সময়েই সাম্রাজ্যবাদী এজেণ্ট মুহম্মদ আলী 'পাক-মার্কিন মৈত্রী ও সাহায্য চুক্তি'তে স্বাক্ষর দান করে। এবং পরিষদে অনুমোদনের জন্যে তা পেশ করা হয়। এই নিয়ে পূর্ব বাঙলার পরিষদে তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে। বামপন্থীরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং পরিষদে যাতে এই চুক্তি অনুমোদিত না হয়, তার জন্যে

জোর প্রচেষ্টা চালায়, তৎকালে পূর্ব বাঙলার পরিষদে ২০১ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৬ জন এই চুক্তিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তা বাতিল করার তীব্র আওয়াজ তোলেন। এই সময়েই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। শেখ মুজিব নিজে এই চুক্তির বিরুদ্ধে একটি টুঁ শব্দ তো করেই নি, বরং ভেতরে ভেতরে এই চুক্তির পক্ষে সমর্থন আদায়ের কাজ করেছেন। এবং নির্লজ্জভাবে ১৬৬ জন সদস্য যখন ওই দাসত্ব চুক্তি বাতিলের দাবী জানান, সেই দাবী পত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন শেখ মুজিব।

পরিষদে চুক্তি অনুমোদন করাতে না পেরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আরো বেশী রুষ্ট হয়ে ওঠে এই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে। এবং ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে যে কোনো উপায়েই হোক এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। নিশ্চিহ্ন করতে হবে বামপন্থীদের জনপ্রিয়তা ও তাদের সাংগঠনিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে—পার্টির অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব ও ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে। এ কাজে সফল হল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র! এই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি দেখা গেল আচমকা আদমজী জুট মিলে বাঙালী অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির মধ্যে। চন্দ্রঘোনাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। আর এটাই হল সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাস কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রতিশোধ' গ্রহণের মোক্ষম অজুহাত। বলা হল 'পূর্ব বাঙলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সম্পূর্ণ অযোগ্য।' জারী করা হল কুখ্যাত ৯২ (ক) ধারা। বাতিল হয়ে গেলো যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা একটা মাত্র কলমের খোঁচায়। আর সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় হিসেবে পাইকারী হারে সমগ্র পূর্ব-বাঙলার বুকে প্রায় দুই হাজারের উপরে গ্রেফতার করা হল বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে। শুরু হল ব্যাপক দমন পীড়ন। কুখ্যাত ইস্কান্দার মীর্জা তখন পূর্ব বাঙলার মিলিটারী গভর্ণর। মওলানা ভাসানী এসময় শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসার জন্যে অবস্থান করেছিলেন। সে সময় মওলানা ভাসানী দেশে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হত। ইস্কান্দার মীর্জার ঘোষণা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাসানীকে বিদেশী এজেণ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে—'ভাসানী দেশে ফিরে এলে তাঁকে গুলি করা হবে' বলে পূর্ব বাঙালায় নব নিযুক্ত মিলিটারী গভর্ণর ইস্কান্দার মীর্জা প্রকাশ্যে হুমকি দেয়। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'ইত্তেফাক' পত্রিকা পর্যন্ত ইস্কান্দার মীর্জার সুরে সুর মিলিয়ে

বলতে থাকে—'এই নাজুক পরিস্থিতিতে ভাসানীর দেশে ফিরে না আসাই উচিত।' এই বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শাসকশ্রেণীর দমননীতির কাছে নিজেদের অস্তিত্ব বন্ধক দিয়ে—কোনো প্রতিবাদ না করে—তাদেরই সুরে সুর মিলিয়ে পরোক্ষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রকেই সুদৃঢ় করার কাজে ইত্তেফাক ওকালতি করেছে। এই সময় ক্ষমতাচ্যুত আবুল কাশেম ফজলুল হককে 'দেশদ্রোহী' বলে অভিহিত করে তাঁকে 'নজরবন্দী' করে রাখা হয়। সম্পূর্ণভাবে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সমগ্র পূর্ব বাঙলা জুড়ে চলে এক প্রচণ্ড সন্ত্রাসের রাজত্ব। গ্রেফ গ্রেফতারী পুলিশী নির্যাতন আর গুণ্ডামী। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার নতুন করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। প্রচণ্ড দমন-পীড়নের মধ্যে বামপন্থী সংগঠন এই সময় অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নেতৃবৃন্দসহ বহু সংগ্রামী নেতৃস্থানীয় কর্মীর কারারুদ্ধ অবস্থার জন্যে জনগণের ভেতরে ক্রোধ ও বিক্ষোভ থাকলেও তা সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া অসম্ভব ছিল। নেতৃত্ববিহীন জনগণ এক চরম হতাশার মধ্যে ডুবে গেল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবার এই শূন্য মাঠে তাদের 'গোল' দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ সেই সাম্রাজ্যবাদী 'গোল' দেয়ার সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে মুহম্মদ আলীর উপরে চাপ সৃষ্টি করল নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্যে। চলল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার সদস্য ও আওয়ামী লীগ এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে প্রচুর অর্থের খেল দেখিয়ে ভাঙন সৃষ্টির পালা। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ও নানারকম গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে শুরু করে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। নতুন মন্ত্রীসভায় 'ভারতের এজেণ্ট ও দেশদ্রোহী' আবুলকাশেম ফজলুল হকও ঠাঁই পেয়ে গেলেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ও তাঁদের কাগজ-পত্র ইত্যাদি গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা ভস্মীভূত হলো। কমিউনিষ্ট পার্টি অবৈধ ও বেআইনী ঘোষিত হলো। বাম-পন্থীরা যারা তখনো প্রকাশ্যে চলাফেরা করছিলেন—তারা সূর্যালোকের বাইরে রাত্রির অন্ধকার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ষড়যন্ত্র চলছিলো খুবই দ্রুততার সঙ্গে। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নটের গুরু হোলেন শহীদ সোহরাবর্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার আইন মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলেন। সোহরাবর্দীর কেন্দ্রে আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পেছনেও ছিলো মার্কিনের অদৃশ্য যোগসাজশ। এই সময়

মার্কিন সিনেটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, নিজেদের এক্তিয়ারে—ও পূর্ণ প্রভাবে পূর্ব বাঙলার সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে, মোটামুটি পূর্ব বাঙলাকে একটা স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বকে আরো সুদৃঢ় করা, এবং কমিউনিষ্ট উচ্ছেদ করা। মার্কিনের এই গোপন ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলো কোনোরকম প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন কিম্বা আলাপ আলোচনা ছাড়াই জেল থেকে শেখ মুজিবের আকস্মিকভাবে মুক্তি লাভ। শেখ মুজিবের কণ্ঠে আওয়াজ শোনা গেলো "আমার জন্ম হয়েছে ফজলুল হকের বিরোধীতা করার জন্যে।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফজলুল হকের মৃত্যুর পরে আওয়ামী লীগের ইত্তেফাক পত্রিকা—সোহরাবর্দী, ফজলুল হক ও শেখ মুজিবের ছবির ক্যালেণ্ডার ছাপিয়ে তা পূর্ব বাঙলার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রচার করতে শুরু করলো যে, তিনমূর্তি একই দর্শন, একই আদর্শ, ধ্যান ও ধারনার প্রতীক। শেখ মুজিব, সোহরাবর্দী ও ফজলুল হকের উত্তরসূরী বলে ইয়াহিয়ার নির্বাচনী যুগে নিজেকে সর্বত্র প্রচার করেছেন। বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এটা সোহরাবর্দীর দেশ, ফজলুল হকের দেশ।' এই হলো চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার নায়ক শেখ মুজিবের চরিত্র।

যদিও সোহরাবর্দীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রীর আমলে—পূর্ব বাঙলায় নতুন করে আওয়ামী লীগের চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতেই মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব দেবার একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিলো; কিন্তু তখনো অবিভক্ত আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ থাকায়—প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী মার্কিনী পরামর্শ অনুসারে শোষকশ্রেণীর আরেক বিশ্বস্ত অনুচর ও নূরুল-আমীনের ভাবাদর্শী আবু হোসেন সরকারকে দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করলো। এতে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে ক্ষমতার কামড়াকামড়িতে আপাততঃ পরাজয়ের জন্যে—বিক্ষোভ দেখা দিলো। তরুণ শেখ মুজিব তখনো মওলানা ভাসানীর ছত্রছায়ায় পূর্ববাঙলার মাঠে মাঠে রক্ত গরম করা বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে সুপরিচিত করার কাজে ব্যাপৃত।

মওলানা ভাসানী দেশে ফিরে এসেই নতুন করে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে অবিশ্রান্তভাবে সমগ্র পূর্ববাঙলা সফর করছিলেন। অত্যাচারী ও শোষকশ্রেণীর ক্রীড়নক আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জনমত গঠন করতে সমর্থ হলেন। তীব্র জনমতের চাপে এবং বহুল

প্রচারিত ২১ দফা দাবীর ফলে শেষ পর্যন্ত আবু হোসেন সরকার বামপন্থীদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এবং ওই সঙ্গে প্রচার করা হয় যে, ফেরারী কমিউনিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত হুলিয়াও খুব অল্পসময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করা হবে। সেই সময় দীর্ঘদিন যাবৎ মণি সিং-সহ বহু কমিউনিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী ছিলো। এতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের মূলে আঘাত পড়লো, এবং নতুন নটের গুরু কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী পূর্ববাঙলার সাম্রাজ্যবাদী সহনায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, ও পরামর্শ করে যে কোন উপায়ে আবু হোসেন সরকারের ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র জোরদার করে তোলেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো 'পাক-মার্কিন সাহায্য চুক্তি' অনুমোদন করানো ও ওই সঙ্গে কমিউনিষ্টদেরকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কারের মাধ্যমে পূর্ববাঙলার বুক থেকে কমিউনিষ্ট প্রভাবকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলা।

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র তখন কতটা বিস্তৃত হয়েছে তার আরো একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলো মার্কিন সাংবাদিক (যাকে পরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার লোক বলে জানা যায়) কালাহান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 'সুপ্রিম পাওয়ার' নিয়ে পূর্ববাঙলার ঢাকায় আসে। কতবড় ক্ষমতা ও স্পর্দ্ধার রাজত্ব সৃষ্টি করলে—একজন বিদেশী সাংবাদিক অন্য একটি দেশের রাষ্ট্রীয় গোপন ফাইলপত্র দেখার অধিকার পেতে পারে—তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো কালাহান। তার ইচ্ছামতো সে সমস্ত গোপন ফাইলপত্র দেখে —আবুহোসেন সরকারের অক্ষমতার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করে নিজেদের দেশে। শয়তান কালাহানের দৌত্যে আবু হোসেন সরকারের অবস্থা তখন 'এখন তখন' বেসামাল। মার্কিনী চাপের কাছে নিজের ক্ষমতার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই পূর্ববাঙলায় সাম্প্রতিক সংঘটিত একটা পুলিশ ধর্মঘটকে হাতিয়ার হিসেবে আকড়ে ধরলো আবু হোসেন সরকার। দোষ চাপানো হলো এই ধর্মঘটের জন্যে, রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে এবং এর জন্যে দায়ী হলো কমিউনিষ্টরা। সেই পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী খেলা। সর্বত্র আবার হামলা চললো বামপন্থীদের উপরে। গ্রেফতারী-গুণ্ডামী একই সঙ্গে। জারী হলো শত শত কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা।

এই সময় আওয়ামী লীগে—বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বন্দ্ব আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। চারদিকে চলছে তীব্র জল্পনা-কল্পনা। একের পর এক ষড়যন্ত্র চলছে। সোহরাবর্দ্দীর চোখে ঘুম নেই। মার্কিনীদের

সঙ্গে তার গোপন আঁতাত জোরদার হয়েও পূর্ববাঙলায় আবু হোসেন সরকারের আসন্ন পতন অবশ্যম্ভাবী না হওয়ার জন্যে আবার একটা ষড়যন্ত্রের পটভূমিকা প্রস্তুত করা হলো 'মার্কিনী নকশা' অনুসারেই। কোনোরকম 'দুর্বিপাক' ছাড়াই দেশে সৃষ্টি করা হলো তীব্র খাদ্যসঙ্কট। পূর্ব বাঙলার বুকে এই নকশার অন্যতম হোতা হিসেবে শেখ মুজিব বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন 'আবু হোসেন সরকার' তুমি বাঙলার মানুষকে না খাইয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছো—তোমাকে ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেবো—' সিরাজগঞ্জের মতিলাল মাঠের বক্তৃতা। শেখ মুজিব গালাগালি দিতে ওস্তাদ। পূর্ববাঙলার অভুক্ত মানুষ এই গলাবাজিতে হাততালি দিয়ে তাঁদের মনের ক্ষোভ জানালো। কিন্তু জনগণ জানতেও পারলো না এই গলাবাজি শেখ মুজিবের নিজস্ব নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠস্বর হিসেবেই শেখ মুজিব মাউথপিসের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

কৃত্রিম খাদ্য সঙ্কটে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় চলেছে হাহাকার। চালের দাম ১২ টাকা থেকে ষোলো টাকায়, লবনের মতো সস্তা জিনিসও ষোলো টাকা আঠারো টাকা সের, হলুদ, তেল, সমস্তরকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের এই আকাশচুম্বী দাম, তাও আবার দুষ্প্রাপ্য হওয়ার জন্যে চারদিকে ক্ষুধিত মানুষের আর্তস্বর উঠলো। মওলানা ভাসানী, মোহাম্মদ তোয়াহা, প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কণ্ঠস্বর এই কৃত্রিম খাদ্য সঙ্কটের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু করলেন ব্যাপক গণআন্দোলন। পূর্ববাঙলায় ঝড় উঠলো আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে। এই খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টিকারী আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পূর্ববঙ্গীয় বিশ্বস্ত অনুচর শেখ মুজিব ঢাকায় এক জীবন্ত নাটকের অবতারনা করলেন। বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড় জিঞ্জিরা থেকে 'মাথাপিছু পাঁচটাকা' দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কিছু ভূখা-নাঙা নিরীহ মানুষকে নিয়ে ঢাকায় 'ভূখা মিছিল' বের করলেন শেখ মুজিব। আবু হোসেন সরকারের পদত্যাগের দাবীতে 'ভূখামিছিল' বিক্ষোভ করতে লাগলো। ঘটনা আগে থেকেই সাজানো ছিলো। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সামনে 'ভূখা মিছিলের'র উপরে পুলিশ গুলি চালালো। শেখ মুজিব এর জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। ঘটনাস্থলে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলে—শেখ মুজিব ছুটে এসে সেই নিহত ব্যক্তির শরীরের রক্তে নিজের পোশাক রঞ্জিত করে জগন্নাথ কলেজের সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে উত্তেজিত করে তোলার জন্যে সেই রক্তাক্ত জামা-কাপড় দেখান।

ফলে এক দারুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঢাকায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ওঠে পূর্ববাঙলার হাটে-মাঠে, বন্দরে-নগরে আর এর জন্যেই তৈরী হয়েছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে চরম দক্ষিণ-পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দালালরা।

আবু হোসেন সরকার বাধ্য হলো পদত্যাগ করতে। ঠিক তার পরের দিনই আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ববাঙলায় ক্ষমতালাভ করলো। সফল হলো সাম্রাজ্যবাদী দালালদের বৃহত্তর অংশের ষড়যন্ত্র। সব চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগ গদীনসীন হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর পতন হলো। তার স্থলে ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক তথাকথিত বাঙালীদরদী হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর চাকরীতে বহাল হলেন।

ছয়

এ যেন ম্যাজিক। এ যেন টেবিল থেকে হাত তুললেই হাতের মুঠোয় ফুল। শূন্যে সেই ফুল ছুড়ে দিতেই দিব্যি একটা পুতুল। তাই দেখে দর্শকদের হাততালি। হই চই। বাহ্‌বা।

সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে বসে আমেরিকা পূর্ব বাঙলার বুকে একে একে সেই 'ফুল' থেকে 'পুতুল' খেলার দক্ষ বাজীকর হিসেবে একটার পর একটা খেলা দেখিয়ে দালালদের হাততালি কুড়োতে লাগলো। পূর্ব বাঙলায় আবু হোসেন সরকারের পতন ও আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন হওয়া এবং পরের সপ্তাহে মহম্মদ আলীর অপসারণের মাধ্যমে সোহরাবর্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ—এই এত কঠিন দুরূহ ব্যাপার সম্ভব হলো কি করে?

'গণশক্তি'র সম্পাদকীয়তে এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ক্ষমতাই ছিল পাঞ্জাবীদের হাতে। (১) সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী পাঞ্জাবী সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকার চাইছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলির সমস্ত প্রাদেশিক শাসনক্ষমতার বিলোপ করে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসে দুর্বল জাতিগুলির উন্নতি ও বিকাশকে বাধা দান করে পাঞ্জাবী আধিপত্যকে স্থিতিশীল করা।

(২) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চাইছিলো 'পাক-মার্কিন সাহায্যচুক্তি' অনুমোদন করিয়ে নিতে। এ ব্যাপারে বগুড়ার মুহম্মদ আলী ও চৌধুরী মুহম্মদ আলী ব্যর্থ হয়। এজন্যেই সোহরাবর্দীকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি যথা—সিন্ধি, বালুচ, পাঠান প্রভৃতি জাতিকে দুর্বল করার প্রয়াস হিসেবে, সোহরাবর্দীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার গ্যারান্টি হিসেবে গোপনে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের আপোস হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনকে ভেঙে দিয়ে 'এক ইউনিট' প্রথা বলবৎ করা হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 'সংখ্যা সাম্য' নীতি মেনে নেয়া হবে। পূর্ব বাঙলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রকাশ্যভাবেই সোহরাবর্দী প্রস্তাব নিয়ে আসে (১) সংখ্যাসাম্য নীতি (২) একটি মাত্র 'কনভেনশন' এর মাধ্যমে শাসনতন্ত্র পাশ করানো। অচিরেই এই দুটি প্রস্তাবকে সোহরাবর্দী আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিকে দিয়ে পাশ করালেন।

সোহরাবর্দীর এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়েও শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন। ফলে আওয়ামী লীগের মধ্যে দুই শিবিরের ভাঙন অত্যাসন্ন হয়ে উঠলো। 'পাকিস্তান'কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কব্জায় নিয়ে যাওয়ায় এই ঘৃণ্য প্রয়াসের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা গণআন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ স্বদেশের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অত্যন্ত নগ্নভাবে পার্টির পূর্বনির্ধারীত 'স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি'র বুকে লাথি মেরে—'পাক-মার্কিন সামরিক ও সাহায্যচুক্তি পাশ করিয়ে নিলো। পাকিস্তানের অস্তিত্ব বাধা পড়লো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভূত্বের পদমূলে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোট 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো'র সদস্য হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হলো। এই নির্লজ্জ ও রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেলিং পূর্ববাঙলাসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন অনুন্নত জাতির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হরণ, সংখ্যাসাম্য নীতি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি—ইত্যাদি কারনে মওলানা ভাসানী ও বামপন্থীরা আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ফলে পূর্ববাঙলার তথা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসেরা একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করলো। আওয়ামী লীগ চলে গেলো দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল লাইনে। জনসাধারণ

বিভ্রান্ত হলো। যদিও মুহম্মদ আলী (বগুড়া) ও চৌধুরী মুহম্মদ আলী এরা প্রত্যেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই অনুগত 'নৌকর' তবুও তাদের পক্ষে 'পাক-মার্কিন সামরিক ও সাহায্য চুক্তি' পাশ করানো সম্ভব ছিলো না এই জন্যে যে, তাদের পেছনে কোনো জনসমর্থন ছিলো না। কিন্তু সোহরাবর্দী মুজিবের পক্ষে ছিলো প্রচুর জনসমর্থন। যদিও এই জনসমর্থন লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো আত্মত্যাগী সংগ্রামী বামপন্থীদের সাংগঠনিক তৎপরতা ও মওলানা ভাসানীর নিরঙ্কুশ আত্মপ্রচেষ্টায়। অবশ্য দক্ষিণপন্থীদের এই গণবিরোধী শক্তির সৃষ্টির মূল কারণ হলো বামপন্থীদের বিপ্লবী সাংগঠনিক দুর্বলতার ফল। এরা আওয়ামী লীগকেই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে, মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদের বিকাশ সাধন ও তার পার্টিকে সরাসরি জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারেননি। তাহলে একের পর এক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার পালা বদলের পালা চালাতে কিছুতেই সক্ষম হতো না।

যে মুজিব মওলানা ভাসানীর পায়ে হাত দিয়ে তাকে সালাম করতেন, এবং যার ছত্রছায়ায় ঘুরে ঘুরে সমগ্র পূর্ব বাঙলার মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই শেখ মুজিব পর্যন্ত—মওলানা ভাসানী ও বামপন্থীদেরকে 'চীন রাশিয়ার দালাল' বলে ক্ষমতালাভের পরে গালাগাল দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হন নি। আসলে এই গালাগালিও শেখ মুজিবের নিজের নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই শেখানো বুলি তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে মাত্র। আর শুধু মাত্র গালাগাল দেয়ার মধ্যেই কি শেখ মুজিবরা সেদিন শান্ত ছিলেন? না, তা ছিলেন না। ঠিক মুসলীম লীগের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র যে সব কাজ করার দুঃসাহস পায়নি, বামপন্থীদের উপরেও যতটা অত্যাচার উৎপীড়নে সাহসী হয় নি, আওয়ামী লীগ ক্ষমতালাভের পরেই ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব বাঙলার বুকে বামপন্থীদের উপরে সুপরিকল্পিত গুণ্ডামী শুরু করে। ঢাকায় কুখ্যাত সমাজ-বিরোধী মাতাল ও লম্পট 'বাদশা গুণ্ডা'কে লেলিয়ে দিয়ে স্বয়ং মওলানা ভাসানীর আরমানীটোলা পার্কের মিটিং-এর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন কে? পূর্ব বাঙলার বিরোধীপক্ষের রাজনীতিকরা বলবেন—শেখ মুজিব। আওয়ামী লীগের পুরোনো সবাই এই ইতিহাস জানে। কি অপরাধ ছিল মওলানা ভাসানীর? মওলানা ভাসানী কি কমিউনিষ্ট? তাও নয়। মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় দেশপ্রেমিক নেতা। কেন সেদিন তাঁর

মিটিং ভেঙে দেয়া হয়েছিলো? এর জবাব, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা করা। মওলানা ভাসানী যেমন 'সংখ্যাসাম্য নীতি' মেনে নিয়ে পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান নি, কিম্বা করেন নি, তেমনি 'এক ইউনিট' মেনে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দুর্বল জাতির প্রতিও চান নি অবিচার করতে। চান নি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটে পাকিস্তানকে টেনে নিতে। এই কারণেই তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর নিজের হাতে গড়া আওয়ামী লীগ থেকে। আর এজন্যেই তার মিটিং-এ, সমাবেশে একের পর এক চালানো হচ্ছিলো গুণ্ডামী। আক্রান্ত হয়েছিলো ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে প্রগতিশীলদের গণতান্ত্রিক সম্মেলন। রক্তাক্ত হয়েছিলো সিরাজগঞ্জের নাট্য ভবনে প্রগতিবাদীদের সমাবেশ। এমন কি কমরেড সেলিনা বান্থ কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—সোহরাবর্দী-মুজিবের গুণ্ডাদের হাতে। এসব ইতিহাস কি আজকের সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের হাতের পুতুল 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিব অস্বীকার করতে পারবেন? শেখ মুজিব নিজেই কি ঢাকার সেক্রেটারীয়েটে পূর্ব বাঙলার নির্যাতীত কমিউনিষ্ট নেতা মোহাম্মদ তোয়াহাকে (N. A. P) হ্যালো মিষ্টার 'নেহরু এডেড পার্টি' বলে ব্যঙ্গ করেন নি? তিনিই কি 'কুম্বকণ্ঠে' বারবার বামপন্থীদের ও মওলানা ভাসানীকে 'ভারতের অনুচর' বলে গালাগাল দেননি? সেদিনও কি শেখ মুজিব সদম্ভে ঘোষণা করেন নি যে, পূর্ব বাঙলায় একমাত্র সেই সুযোগ্য ব্যক্তি যে কমিউনিজমকে ঠেকাতে পারে?

খুবই মজার ঘটনা হলো, যে সোহরাবর্দী পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'সংখ্যাসাম্য' নীতি মেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গদি পেলেন, সেই ব্যক্তিই যখন পূর্ব বাঙলা সফরে এসে বললেন 'পূর্ব বাঙলাকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়ে গেছে' তখন তার এই উক্তিকে কি বলা যেতে পারে? এবং যখন তার কণ্ঠে 'পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে এখন সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হলো একটি 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' এই কথা শুনি তখন সেই 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' দরদীকে কি জনদরদী বলা যেতে পারে? 'শক্তিশালী কেন্দ্র' কার স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চাইছিলো, পাকিস্তানের সমস্ত ভাষাভাষী জাতিগুলির স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে নস্যাৎ করে 'একটি শক্তিশালী কেন্দ্র' তৈরী করা, যার ফলে ভারতের সঙ্গে একটা আপোস রক্ষা করে 'পাক-ভারত যৌথ সামরিক জোট' তৈরী করার সুবিধা করা যায়।

এই 'পাক-ভারত যৌথ সামরিক জোট' তৈরীর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার মূল কারণ হলো ভবিষ্যতে কমিউনিজম্ বিরোধী অভিযান চালানো। মূলতঃ এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিলো মহান গণচীন।

কিন্তু ইতিহাস বড়ই নির্মম তখন আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিলো না সোহরাবর্দ্দীকে। যেহেতু 'পাক-মার্কিন সামরিক ও সাহায্য চুক্তি' তখন অনুমোদিত। অনুমোদিত সংখ্যাসাম্য নীতি ও 'এক ইউনিট'। শুধু তাই নয়, তৎকালে পৃথিবীর সব চাইতে বড় আলোড়ণ সৃষ্টিকারী 'সুয়েজখাল' নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ইজরাইলের মিলিত হামলার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাসেরের মিশর জীবন-মরণ লড়াইতে যখন ব্যাপৃত, নাসের যখন এই সাম্রাজ্যবাদী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী আক্রান্ত মিশরের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে বিশ্বের সমগ্র জাতিগুলির প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন, সমগ্র বিশ্বে যখন সাম্রাজ্য-বাদীদের এই ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, এবং সাহায্য সহযোগিতা করছে মিশরকে, তখন সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস সোহরাবর্দ্দী মিশরের আবেদনের প্রতি দৃকপাত না করে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সমর্থন যোগালেন। সোহরাবর্দ্দীর এই নির্লজ্জ ভূমিকার বিরুদ্ধে ঘৃণায়, ক্ষোভে সেদিন ঢাকা নগরী ফেটে পড়েছিল। জনতা ঢাকায় 'ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস' জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে তাঁদের মনের ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। মূলতঃ এই বিশ্বাসঘাতকতা ও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী নির্লজ্জতার প্রতীক সোহরাবর্দ্দী-মুজিবদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংগ্রামী বামপন্থী অংশ কিছুতেই আর নিজেদের এক করে রাখতে পারেন নি। বামপন্থীদের ও মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগ ত্যাগের এটাও অন্যতম কারণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখন পাকিস্তানকে তার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের পুরো কব্জায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। সক্ষম হয়েছে আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল লাইনে নিয়ে গিয়ে বামপন্থীদেরকে প্রকাশ্য সংগঠন-বিহীন করে দিতে। তাঁদের উপরে বেপরোয়া গুণ্ডামী চালিয়ে অস্তিত্বহীন করে দিতে।

এই সোহরাবর্দ্দীই তখন সিরাজগঞ্জের আই. আই. কলেজের মাঠে শেখ মুজিবের কাঁধে হাত রেখে নেহরুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "নেহরু তুমি মনে রেখো, তুমি বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমি ছোট দেশের প্রধানমন্ত্রী, তুমি

যদি আমাকে দুইটা ঘুষি মারো, আমি তোমাকে অন্ততঃ একটা ঘুষি মারতে দ্বিধা করব না।" সেই সোহরাবর্দ্দী, সেই মুজিব আজ ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রের নয়নের মণি। অর্থাৎ প্রয়োজন ও স্বার্থের সময় গণ-বিরোধী চক্রের কোনো নীতি, কোনো আদর্শ নেই। স্বার্থের প্রশ্নে এরা এক, এরা অভিন্ন-হৃদয়েষু। এই প্রসঙ্গে যথার্থ আলোচনায় পরে ব্রতী হব।

বলছিলাম, সোহরাবর্দ্দীর জনপ্রিয়তা অনেকখানি হ্রাস পায় 'সুয়েজখাল' প্রশ্নে তার সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ অবলম্বনের দরুণ। এবং আরো কতিপয় মার্কিনী শোষণের বজ্রা দৃঢ় করার ষড়যন্ত্র সোহরাবর্দ্দীকে দিয়ে সফল করানোর পরে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল মার্কিনী ইঙ্গিতেই। সোহরাবর্দ্দীকে ওই সময় না সরালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নির্যাতীত ভাষাভাষী জাতির মধ্যে চরম বিস্ফোরন দেখা দেয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। এই তীব্র গণ-অসন্তোষকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্যে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হল আই. আই. চুন্দ্রীগড়কে। আই. আই. চুন্দ্রীগড় আওয়ামী লীগ বিরোধী এবং মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের অন্ধ অনুসারী। ক্ষমতালাভের পরেই চুন্দ্রীগড় তীব্র ভারতবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। এতে মার্কিনী 'পাক-ভারত যৌথ সামরিক জোট' গঠন করার পরিকল্পনা ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়। সামরিক দিক থেকে গণচীনকে ঘেরাও করে রাখার স্বার্থ পরিপন্থী চুন্দ্রীগড়ের রাজনৈতিক ভারতবিরোধী উদ্যোগকে তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বরদাস্ত করতে পারল না। যে কোনো উপায়েই হোক ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ভাল করে যৌথ যুদ্ধজোট গঠন করার কাজে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার নতুন মুখ খুঁজতে শুরু করল। ফলে মাত্র দেড়মাস পরে চুন্দ্রীগড় অপাসারিত হয়। তার স্থলাভিষিক্ত করা হল স্যার ফিরোজ খান নুনকে। কিন্তু ফিরোজ খান নুনও সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে অক্ষম হল।

এদিকে পূর্ব-বাঙলার সর্বত্র ক্ষমতাচ্যুত সোহরাবর্দ্দীর দলবল মূলতঃ বামপন্থীদের উপরে চালাতে লাগল সন্ত্রাস। তাদের ক্ষমতা হারানোর জন্যে তারা দায়ী করতে লাগল মওলানা ভাসানী ও কমিউনিষ্টদেরকেই। আর এই সুপরিকল্পিত গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে N.A.P গঠনের আগে গণতান্ত্রিক সম্মেলন-এর মাধ্যমে বামপন্থীরাও মওলানা ভাসানীকে সামনে রেখে গড়তে লাগলেন গণ-প্রতিরোধ। ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা শুরু হল ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে। 'আঘাত' এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠল দুর্বার প্রত্যাঘাত। বলা চলে,

মুসলীম লীগ ও আওয়ামী লীগের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল বামপন্থীরা। এদের মধ্যে স্বার্থের কামড়াকামড়ি থাকলেও এরা কমিউনিষ্ট বিরোধীতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে, প্রাদেশিক পরিষদের বশির মোক্তার নামে একজন আওয়ামী লীগ সদস্যের মৃত্যুতে ওই সময় একটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুরো দুই মাস সিরাজগঞ্জের বুকে রাজনৈতিক প্রচারের বন্যা চলে। সোহরাবর্দী-মুজিবের সমর্থিত আওয়ামী লীগের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর সমর্থিত একজন প্রার্থীকে কেন্দ্রে দাঁড় করানো হয়। মওলানা ভাসানীর এই প্রার্থীর নাম তমিজুল ইসলাম। বয়েসে একেবারে তরুণ। মওলানা ভাসানী সহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ তমিজুল ইসলামের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালান। আর আওয়ামী লীগের পক্ষে সোহরাবর্দী, শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগের ছোট বড়ো বহু নেতা ও কর্মী প্রচার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। তখন সত্ত আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসেছেন মওলানা ভাসানী। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তখন দোর্দণ্ড ফ্যাসিবাদী দৌত্য সমগ্র পূর্ববাঙলার বুকে। বামপন্থীরা কোথাও তাঁদের সত্তোজাত সংগঠনকে স্থিতিশীল করতে পারেন নি তখনো পর্যন্ত, প্রগতিশীলদের সেই ঘোর রাজনৈতিক দুদিনে—আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করানো এবং সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালানো যে কত কষ্টকর—তা সেই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যাদের চাক্ষুস পরিচয় নেই, তাদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। তবুও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয়কে কেউ রুখতে পারতো না, যদি আওয়ামী লীগ বাঁকা পথে—ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের চোরাপথে পা না বাড়াতো। আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছিলো যে, তরুণ তমিজুল ইসলামের জয় অবধারিত, তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। যদিও সোহরাবর্দী, শেখ মুজিবেরা নিজেরা প্রচার অভিযানে এসে N. A. P. (ন্যাপ)-কে ভারতের এজেণ্ট, হিন্দুদের দালাল, এরা ভোট পেলে পাকিস্তানকে হিন্দুস্তানের কাছে বিক্রি করে দেবে, ইত্যাদি জঘন্য কুৎসা রটিয়েও তমিজুল ইসলামের জয় ঠেকাতে না পারার সম্ভবনার জন্যে, ঠিক নির্বাচনের আগের দিন রাত্রিতে আওয়ামী লীগ তার শেষ হীনতম ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক কুৎসার পথ অবলম্বন করলো। তারা মাইক দিয়ে প্রচার করলো—"ভাইসব, এই মাত্র

খবর পাওয়া গেলো যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের দর্শনা বর্ডার অতিক্রম করে পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে আক্রমণ চালিয়েছে। এই আক্রমণের পেছনে যোগসাজশ রয়েছে ন্যাপ নামধারী হিন্দুস্তানের দালালদের। ভাইসব আপনারা আগামীকালের নির্বাচনে-হিন্দুস্থানের এই গুপ্তচরদের কবর দিন।"

আওয়ামী লীগের এই জঘন্য প্রচারনার ফল তাদের স্বপক্ষে কাজ করলো। নির্বাচনের হাওয়া বদলে গেলো। চারদিকে হু-হু করে ছড়িয়ে পড়লো গুজব। কানাকানি। 'ন্যাপ হিন্দুস্তানের দালাল'—এই প্রচারনা ভোটকেন্দ্রে আরো জোরদার হলো আওয়ামী লীগের পয়সায় কেনা এজেন্টদের প্রচারনায়। তবুও তরুণ তমিজুল ইসলাম শতকরা ৪৭ ভাগ ভোট পেলেন। চক্রান্তকারী আওয়ামী লীগের গুরু সোহরাবর্দী সিরাজগঞ্জের এই উপনির্বাচনে জয়ী হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'এই নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে তমিজুল ইসলামেরই জয় হয়েছে।'

এই হচ্ছে আওয়ামী লীগ। এই হচ্ছে তাদের রাজনীতি। আর তার সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন সোহরাবর্দী, নেতৃত্ব দিচ্ছেন 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমান। তাই এরা তৎকালে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ আরো জোরদার করেছিলো। সেই ইংরেজী গল্পটার কথা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শনের দিকে তাকালে মনে হয়। নেকড়ে বাঘটা পাহাড়ের নীচে ঝর্ণার উজানে জল খাচ্ছিলো, আর একটা মেষ শাবক স্রোতের ভাঁটিতে জল খেতে নেমেছিল। বাঘের লোভ হলো মেষ শাবককে দেখে। আক্রমণ করার অজুহাত হিসেবে বাঘ বললো—ওহে তোমার স্পর্দ্ধাতো কম নয়? আমার জল খাওয়া নষ্ট করে দিলে জল ঘোলা করে? মেষ শাবক সবিস্ময়ে বললো—সেকি আপনি তো আমার উজানে রয়েছেন। বাঘ মাথা নেড়ে জবাব দিলো—ওসব আমি বুঝি না, তুমি ঘোলা না করো তাতে কি হয়েছে; তোমার ঠাকুরদা তো ঘোলা করেছিল একদিন? অতএব আমি তোমাকে খাবো।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অন্যতম হোতা আওয়ামী লীগ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী আরেক গোষ্ঠীর দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দোষ চাপালো কমিউনিষ্টদের উপরে। অর্থাৎ কমিউনিষ্ট উচ্ছেদ করতে হলে জনগণের সামনে একটা 'অজুহাত' না তুললে—আক্রমণ চালানোর পথ সুগম হবে কি করে?

ক্ষমতাসীন থাকাকালে একটা দিনও আওয়ামী লীগ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা থেকে বিরত ছিলো না। বিরত ছিলো না রাশিয়া—চীনের সমালোচনা থেকে। নানাধরণের আজগুবি কুৎসা থেকে। আওয়ামী লীগ তাদের প্রিয় প্রভু আমেরিকার মনস্তুষ্টির জন্যে পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা করেনি। সেই সেদিনের শেখ মুজিব কিসের প্রলোভনে, কাদের স্বার্থে তার গুরুর প্রদত্ত 'পূর্ববাঙলাকে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়ে গেছের পরে 'বাঙলাদেশ' গঠনের আগে স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীতে জেহাদ ঘোষণা করলেন? ১৯৫৬ সনে তিনি নীরব ছিলেন কেন? তিনি কি তাহলে শতকরা বাকী ২ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্যে 'ছয়দফা' প্রণয়ন করেছিলেন? ইয়াহিয়ার প্রদত্ত নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন? ১৯৫৬ সনেই তো সোহরাবর্দ্দী সাহেব পূর্ববাঙলার স্বায়ত্ত-শাসন দিয়ে দিয়েছিলেন, তাহলে আবার নতুন করে সেই আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসন আদায় করার জন্যে জনমত গঠনে কেন নামলেন? আসলে এর সবটাই হলো আওয়ামী লীগের ক্ষমতালাভ করার কৌশল হিসেবে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া।

কিন্তু ইতিহাস বড়ো নির্মম। কাল-মহাকালের চাকা কখনো থেমে থাকে না। চাকা ঘুরবেই। এ অমোঘ নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হয় না, হতে পারে না। চেয়ারম্যান মাওয়ের কথায় "আঘাত যত প্রবল হবে—প্রতিরোধ শক্তিও তত বেড়ে যাবে।" তাই আওয়ামী লীগের শত অত্যাচার-নির্যাতনের মুখেও—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় পেটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংগঠন 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র বিকাশ খুবই দ্রুততালে এগিয়ে চললো। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাও কমিউনিষ্ট পার্টি অবৈধ থাকার জন্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভেতরে থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, মুৎসুদ্দি পুঁজি ও আধা সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামকে যত বেশী সম্ভব এগিয়ে নিতে লাগলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ম্যানিফেষ্টোতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের কর্মসূচী গৃহীত হলো। সুস্পষ্টভাবে কৃষক-শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মেহনতি জনগণের কথা লিপিবদ্ধ হলো ম্যানিফেষ্টোতে। ফলে অচিরেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মেহনতি জনগণের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। সমগ্র পূর্ববাঙলায় দুর্দমে এগিয়ে চললো পার্টির আন্দোলন। বামপন্থীরা প্রকাশ্যে শ্লোগান তুললেন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের। সমাজতন্ত্রের। আর

এই শ্লোগানের বিরোধীতা করতে গিয়ে, আক্রমণ চালাতে গিয়ে, বামপন্থীদের প্রতিরোধ শক্তির কাছে মাথা নত করতে লাগলো আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী গুণ্ডারা। মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের হুশিয়ার করে বললেন—এখন আমরা কতিপয় নই, আমরা এখন লাখো, কোটি তথা সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কীত। আমরা সমস্ত শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেবো।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভয় পেলো আবার। আওয়ামী লীগ থেকে বামপন্থীদেরকে বহিষ্কার করা ও তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করে—আমেরিকা বরং বামপন্থীদের প্রকাশ্যে কাজ করার একটি নিজস্ব সংগঠন তৈরী করার পথ সুগম করে দিয়ে—নিজেদের মাংস নিজেরাই দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়তে লাগলো। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীলরা যে ফাঁদ পাতে, তারা নিজেরাই একদিন সেই ফাঁদে পড়ে এবং নিশ্চিহ্ন হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্মলাভ ও সমগ্র পাকিস্তানে তার দুর্জয় অগ্রগতি তাই নতুন করে মার্কিনীদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই পার্লামেণ্টারী লাইনে পুতুল বদলের খেলায় আস্থা হারিয়ে ফেললো আমেরিকা। এবার নতুন পথ, নতুন কৌশল অবলম্বন করার ষড়যন্ত্র ফাঁদতে শুরু করলো। বগুড়ার মহম্মদ আলী থেকে ফিরোজ খান নুন পর্যন্ত অনেক এজেন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েও আমেরিকা যখন তার চীনবিরোধী যুদ্ধজোট পাকিস্তান ও ভারতকে নিয়ে তৈরী করতে সক্ষম হলো না, তখন সর্বশেষ চাঁই ইস্কান্দার মীর্জাকে বেছে নিলো ষড়যন্ত্রের নতুন কৌশল প্রয়োগ করে, কয়েক কোটি মানুষকে অত্যাচারের স্টীম রোলারের পেষণে ফেলে, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্যে।

সাত

১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাস। ষড়যন্ত্র তার পালা বদল করলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের ফ্যাক্টরী পাকিস্তানের বুকে নেমে এলো ত্রাসের রাজত্ব। সেই ত্রাস থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত এজেন্টরাও সাময়িকভাবে বাদ গেলো না।

ইস্কান্দার মীর্জা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে সামরিক আইন

(মার্শাল ল') জারী করে নতুন ষড়যন্ত্রের দ্বারোদঘাটন করলো। মুছে গেলো পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশ থেকে তথাকথিত 'গণতন্ত্রের মুখোশটুকুও। এই নতুন ষড়যন্ত্রের অন্যতম পাণ্ডা জেনারেল আয়ুব খানও অনেকদিন থেকে ক্ষমতালাভের জন্যে তার লোলুপ রসনা নিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলো। এবার সেই সুযোগ এলো তার হাতের মুঠোয়। দেশে 'আইন শৃঙ্খলার অবনতি', 'দুর্নীতি' ও 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদি অজুহাত তুলে জেনারেল আয়ুব ক্ষমতালাভর পথ প্রশস্ত করে নিলো। ইস্কান্দার মির্জা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল আয়ুব তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। রাতের অন্ধকারে তারই বুকের উপরে ছয়টা পিস্তলের নল চিক্ চিক্ করে উঠবে মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে। নিজের কক্ষে অপেক্ষা করছিলো ইস্কান্দার মীর্জা। খবর গেলো জেনারেল আয়ুব তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ডাক পড়লো ভেতরে। আয়ুব একা নয়। সঙ্গে আরো কয়েকজন সামরিক সহচর। কোনো কথা নয়। আয়ুবের ডান হাতে পিস্তল, বা হাতে একখানা টাইপ করা কাগজ। কাগজটা বাড়িয়ে ধরলো হতচকিত মীর্জার দিকে। বলা হলো ওটা সই করে দিতে। বলে দেয়া হলো—ওতে তোমার পদত্যাগ এবং আমার হাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করার ঘোষণা। না, কোনো দ্বিরুক্তি করলো না পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা। সই করে দিলো কাগজে। কেবল একটি মাত্র অনুরোধ মীর্জার, তাকে যেন জীবনে মেরে না ফেলা হয়, তাকে যেন বাঁচিয়ে রাখা হয়। অভয় দিলো আয়ুব খান। না, জীবনে মারা হবে না। তবে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে মীর্জাকে। মীর্জা তাতেই রাজি হয়ে গেলো।

২৭শে অক্টোবর রাত্রিতে জেনারেল আয়ুব খান ফিল্ড মার্শাল উপাধি লাগিয়ে সরাসরি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো। শুরু হলো তাণ্ডবের রাজত্ব। বেআইনী করা হলো সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে। গ্রেফতার করা হলো বামপন্থী নেতা ও কর্মীদেরকে। নিষিদ্ধ করা হলো যে কোনোরকম মিছিল-মিটিং ও সমাবেশ। আর 'দুর্নীতি দমন' করার নামে চললো জনগণের উপরে বেপরোয়া নির্যাতন। সরল পূর্ববাঙলার অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষকে তাদের অজ্ঞতাবশতঃ আয়ুবের সামরিক আইনকে, 'খুব কঠিন' বলতে গিয়ে 'আইন খারাপ' 'সুতরাং সাবধান এই ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণ করে থানায় যেতে হয়েছে, পুলিশের ডাণ্ডা খেতে হয়েছে। দাঁড়াতে হয়েছে আদালতের

কাঠগড়ায়। খাটতে হয়েছে জেল। এরকম ঘটনার নজীর পূর্ববাঙলায় শত শত। বামপন্থীদেরকে গ্রেফতার করে তাদের উপরে চালানো হয়েছে বেত। অনেককে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। মওলানা ভাসানীসহ অনেক প্রগতিবাদী নেতা ও কর্মীকে সেদিন অকথ্য নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানী অনশন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য সোহরাবর্দীকেও গ্রেফতার করা হয়েছিলো। কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো আয়ুব খান সোহরাবর্দীর জন্যে 'এয়ারকণ্ডিশণ্ড জেল' ও ব্যতিক্রম সেবাযত্নের ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছিলো যথাযথ ভাবেই। কোনো শত্রুও বলতে পারবে না, সোহরাবর্দীকে জেনারেল আয়ুব কষ্ট দিয়েছে। বিরোধীপক্ষের লোকেরা বলে—ওটা সোহরাবর্দী সাহেবের 'রাজর্ষিক বিশ্রাম।'

সমগ্র দেশে একটা ভীতি বিরাজ করতে লাগলো, বড়ো ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে গরীব কৃষকের মনে আতঙ্ক—এই বুঝি তাদের ঘাড়ে আয়ুবের ধারালো খড়্গ নেমে আসবে। রাজনৈতিক নৈরাশ্য ও নেতৃত্বহীন হয়ে জনগণ একেবারে চুপ্ মে গেলো। বহু রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা বাধ্য হলো গা ঢাকা দিতে। মওলানা ভাসানী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল হক, মনি সিং সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখ অন্ধকার জগতে নিজেদের আশ্রয় বেছে নিলেন। 'অশান্ত পূর্ববাঙলা কেবল আহত বাঘের মতো মনে মনে ফুঁসতে লাগলো ভবিষ্যতের সময় ও সুযোগের আশায়। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এত সহজে এবার পালাবদলের নায়ককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিতে রাজি নয়। তাই প্রথম দিকে প্রচণ্ড দমন-পীড়ন চালানোর পরে, বামপন্থীদেরকে কারাগারে রেখে ধীরে ধীরে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নেতা ও কর্মীদেরকে ছেড়ে দিতে থাকে আয়ুব খান। কিন্তু অনেকের উপরে 'এবডো' আইন আরোপ করে তাদের জনসভায় বক্তৃতা, কাগজে বিবৃতি ও এই সরকারের সমালোচনা করার সমস্ত অধিকার হরণ করা হয়। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে অবশ্য ভুল করেনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাস 'ফিল্ড মার্শাল' মহম্মদ আয়ুব খান। যুদ্ধে জয়লাভ করা ছাড়া—কোনো জেনারেল পৃথিবীতে 'ফিল্ড মার্শাল' উপাধি নিয়ে দৌত্য দেখিয়েছে কিনা তা জানি না তবে পাকিস্তানে সব কিছুই সম্ভব হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে আরো হবে। 'ফিল্ড মার্শাল' আয়ুব সেই পথই উন্মুক্ত করে দিলো রাত্রির অন্ধকারে সামরিক শাসনের মুকুট মাথায় পরে।

দীর্ঘকাল সামরিক নিপীড়ন যথেচ্ছভাবে চালানোর পরে আসন্ন গণবিস্ফো-

রোনের আশঙ্কায় জেনারেল আয়ুব এক নতুন কৌশল অবলম্বন করে, (প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্মীদেরকে কারারুদ্ধ রেখে) বিভিন্ন পার্টির লোকজনকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। এক ঘোষণায় রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনরুজ্জীবন করার ছাড়পত্র দেয়া হয়। এবং মুসলীম লীগকে 'কনভেনশন মুসলীম লীগ' এর পরিচয়ে আয়ুব খান তার নেতা নির্বাচিত হয়ে এক নতুন কৌশল অবলম্বন করে 'গণতন্ত্রে'র সঙ্গে জুড়ে দেয় 'মৌলিক' শব্দ। আয়ুব প্রণীত 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy) ফর্মুলার 'হ্যাঁ' এবং 'না'র মাধ্যমে একটি নির্বাচনী প্রহসন করা হয় সমগ্র পাকিস্তানে। 'হ্যাঁ' ও 'না'র মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয় আয়ুবের নিজের তৈরী 'মৌলিক গণতন্ত্রী'দের দিয়ে। আশি হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা এই 'হ্যাঁ' এবং 'না'র ভোটদানে আয়ুবখানের হাতকেই শক্তিশালী করে তোলে। ১৯৬২তে তথাকথিত একটি শাসনতন্ত্র দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করে আয়ুব খান। শুরু হয় পূর্ববাঙলার বুকে সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাস আয়ুব খানের নিজস্ব 'দালাল শ্রেণী'র বিকাশলাভ।

কারা মূলতঃ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান-মেম্বর অর্থাৎ আয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্রী'? এরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলীম লীগেরই বিশ্বস্ত সমর্থক, এবং জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, ঠিকাদার, মজুতদার, তহশীলদার ও তাদের স্বার্থবাহী টাউট-দালাল-বাটপারেরাই এই 'মৌলিক গণতন্ত্রের' মেম্বার, চেয়ারম্যান। এরাই পূর্ববাঙলায় ৬২ হাজার গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হিসেবে তাদের ক্ষমতার যথেচ্ছচারিতা চালিয়ে জনগণকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ক্ষমতার দৌত্যে এরা গরীব কৃষকের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের জমি এমনকি তাঁদের ভিটে-মাটি, গরু-বাছুর, স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পত্তি সব কিছু আত্মসাৎ করে—পূর্ববাঙলার গ্রামে গ্রামে এক মহাসর্বনাশা খেলা শুরু করে। তারা নিজেরাই আইন আদালত, জনগণের 'ভাগ্যবিধাতা' হিসেবে যা খুশী তাই শুরু করে দেয়। বিচারের নামে চলে ঘুষের কারবার। অফিস-আদাদতে পর্যন্ত কর্মচারীরা বলে "ঝুঁকির রাজত্বে কাজ করাতে হলে বেশী উৎকোচ দিতে হবে।" অর্থাৎ প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বত্র কায়েম হয় দুর্নীতির একচ্ছত্র আধিপত্য। বিশেষ করে এই অবস্থার দরুণ পূর্ববাঙলার কৃষকেরা এক প্রাণান্তকর পরিস্থিতির মধ্যে নিপাতিত হয়। গ্রামে সামান্যতম কাজের জন্যে লম্পট 'চেয়ারম্যান' ও 'মেম্বার' সাহেবদের চরণে মাথা ঠুকতে হয়

কৃষকদেরকে। কাজ করিয়ে নেয়ার জন্তে 'সম্মানি' হিসেবে এই 'সাহেব'দের বাড়িতে কৃষকেরা এটা ওটা 'ভেট' দিয়ে তবে হুজুরদের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হয়, কিম্বা হয় না এমন নজীরও আয়ুব খানের কুখ্যাত 'উন্নতির দশ বছর' এর ইতিহাসে হাজার হাজার রয়েছে।

'ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামে'র নাম করে আয়ুব খান এই চেয়ারম্যান মেম্বারদের হাতে অবাধে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছে। আর এইসব টাকা পয়সা নির্বিবাদে আত্মসাৎ করেছে লম্পট চেয়ারম্যান-মেম্বারের দল। গ্রামে—রাস্তা কিম্বা ছোটো ছোটো ব্রীজ তৈরী করা, টিউবয়েল তৈরী, প্রাইমারী স্কুলবসানো, টেস্ট রিলিফ ইত্যাদির যাবতীয় অর্থ ও সাহায্য সামগ্রী প্রকাশ্যেই লুণ্ঠিত হয়েছে। আর এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেই দোর্দণ্ড ক্ষমতাশালী চেয়ারম্যান-মেম্বারের দল তাদের পোষ্য দালালদেরকে লেলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদকারীকে হয়তো খুন, নয়তো তার মেরুদণ্ডটাই গুড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামে'র নামে আয়ুব খান তার নিজের হাতকে শক্তিশালী করার জন্যে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য দালাল। যারা একটা যুগ তাকে ক্ষমতায় টিঁকিয়ে রেখে পূর্ববাঙলাকে দেউলিয়া করার কাজে সহযোগিতা করেছে সর্বতোভাবে।

আয়ুবের যুগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক শোষণের ব্যাপক বিকাশ করতে সমর্থ হয়। আয়ুবের ক্ষমতাদখলের আগে পাকিস্তানে মার্কিনের লগ্নী পুঁজির পরিমান ছিলো সাতশো কোটি টাকার মতো। আর ১৯৫৮ সন থেকে ১৯৬৯-এর মার্চ পর্যন্ত এই পুঁজি বেড়ে প্রায় সাতাশ শত কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বেসরকারী হিসেবে সর্বমোট মার্কিনী পুঁজির পরিমাণ হলো চার হাজার কোটি টাকা ১৯৭১ সনের মার্চ পর্যন্ত। মার্কিনের 'পি. এল. ৪৮০' আইন অনুসারে পাকিস্তানে খাদ্য-সাহায্য সামগ্রীর টাকার পরিমাণ দাঁড়ালো পাকিস্তানের কারেন্সির অর্ধেক। প্রতি লোকের মাথাপিছু মার্কিনী ঋণের বোঝার পরিমান দাঁড়ালো পঞ্চাশ টাকা। কৃষি ও শিল্পের স্বাধীন বিকাশ হলো প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত। এর জন্যে দায়ী হলো পাকিস্তানের অর্থনীতির উপরে মার্কিনী অর্থনৈতিক শোষণের অবরোধ ও পাকিস্তানের বাধ্যতামূলক মার্কিনী নির্ভরশীলতা। প্রতিবছর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্ততঃ তিন শত পঁচিশ কোটি টাকা সুদ হিসেবে পাকিস্তান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এর সঙ্গে সহযোগিতা করছে পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি ধনিক আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানী, দাদা, সায়গল প্রভৃতি বাইশটি পুঁজিপতি গোষ্ঠী।

দেশের সম্পদের সিংহভাগই কুক্ষিগত হলো এই বাইশ পরিবারের হাতে। আর এই বাইশ পরিবারের অবাধ লুণ্ঠনের কাঁচা পণ্যের বাজার হচ্ছে পূর্ববাঙলা। সুতরাং পূর্ববাঙলা প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ নয়, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানী বাইশটি পুঁজিপতিগোষ্ঠীর শোষণের চরিত্র হলো 'কম্‌প্রেডর'। এরা সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই মুৎসুদ্দি হিসেবে পূর্ববাঙলাকে কাঁচাপণ্যের বাজার হিসেবে শোষণ করেছে। ফলে পাকিস্তানের দুই অংশের তুলনায় পূর্ববাঙলাকেই শোষণের বড়ো অংশ যোগাতে হয়েছে। পূর্ববাঙলার কৃষি ব্যাহত হয়েছে। মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শ অনুযায়ী শিল্পের ব্যাপক বিকাশ সাধন করতে চায়নি। বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু পূর্ববাঙলার ক্ষেত্রে নয়, উন্নতিশীল সমস্ত দেশেই অবাধ শিল্পের বিকাশে ও বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠাকে সব সময়েই বাধা দিয়ে এসেছে। নইলে সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের 'লীলাভূমি' হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবাধ শোষণের ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান যখন বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে 'সাহায্য' প্রার্থনা করে তখন বিশ্ব-ব্যাঙ্ক তা অস্বীকার করে। কারণ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে পাকিস্তানের অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়ার পর্যায়ে চলে যাওয়ার জন্যেই বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানের ঋণ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাঙ্কের এই ঋণ দানের অস্বীকৃতির পেছনে রাজনৈতিক কারণও ছিলো যথেষ্ট। তা হলো পাকিস্তানের উপরে ক্রমবর্ধিত গণচীনের প্রভাব। এই প্রভাব থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে কন্‌সের্টিয়াম-এর সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

১৯৫৬ সনের পর থেকেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সঙ্কটের বীজের অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং আয়ুবের রাজত্বে এই সঙ্কট ক্রমশই বাড়তে থাকে। এর মূল কারণ হলো—জোতদারী, মহাজনী, মজুতদারী, ইজারাদারী প্রভৃতি সামন্তবাদী শোষণের নিরবচ্ছিন্ন শোষণ ও তার উপরে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের মুৎসুদ্দি বাইশ পরিবারের ক্রমাগত অর্থনৈতিক শোষণ পীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাকিস্তানে, বিশেষ করে

পূর্ববাঙলার কৃষি ও শিল্পের স্বাধীন বিকাশকে প্রতিহত করার একচেটিয়া আধিপত্যের জন্যে এই 'সঙ্কট' দিনের পর দিন প্রকট হয়ে উঠছিলো। শেষ পর্যন্ত এই 'সঙ্কট' এর উপরে সাময়িকভাবে একটা প্রলেপ দেয়ার জন্যে—বাইশ পরিবার তাদের শোষণকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ফাট্‌কাবাজারীর মাধ্যমে খুবই ব্যাপক করে তোলে। যার ফলে বাঙালী ধনিক বনিক ও সামন্তশ্রেণীও তাদের স্বাধীন বিকাশের পথে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। মূলতঃ এই কারণেই ১৯৬৬ সনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার নতুন করে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটায় শেখ মুজিবকে দিয়ে 'ছয়দফা' প্রণয়ন করে। অর্থাৎ মার্কিনীরা পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে তাদের দালালদের মধ্যে স্বার্থের গোপন দ্বন্দ্বকে মুজিবের মাধ্যমে প্রকাশ্য ময়দানে টেনে নিয়ে এসে তাকে তীব্র করে তোলে। এখানেও তাদের ওই একই উদ্দেশ্য, পাকিস্তানকে চীন বিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত করতে না পারার জন্যে পূর্ববাঙলাকে বেছে নেয়া, এবং পাকিস্তানের উপরে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা। এই জন্যেই আমি পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের ফ্যাক্টরী বলেছি। পৃথিবীর অন্য কোনো উন্নতিশীল দেশে এরকম দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের পালাবদল চলেছে কিনা তার নজীর খুবই বিরল।

জেনারেল আয়ুব আরেকবার দেশে নির্বাচনের প্রহসন করে ১৯৬৪ সনে। আয়ুব খানের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ্‌। আয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে সমর্থন জানায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভেতরের একটি অংশ। এই সময় স্বৈরাচারী আয়ুবের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রকারীদের দক্ষিণ হস্ত আজম খান (পূর্ববাঙলার গভর্ণর পদে বসিয়ে আয়ুব যাকে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে অপসারিত করে) আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র নির্বাচনী অভিযানে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববাঙলা সফর করে। আওয়ামী লীগ আজম খানকে প্রগতিশীল বলে অভিহিত করে তার গলায় মাল্যদান করে, এবং ওই সময় শোনা গিয়েছিলো যে, পরবর্তীকালে আজম খানকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বসানো হবে। এই প্রচারনা বাস্তবায়িত হলে 'ষড়যন্ত্রের রাজনীতি' কোন্ পথে মোড় ফিরতো তা বলা যায় না। 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র নির্বাচনে, ক্ষমতাসীন আয়ুব টিকে গেলো তার সৃজিত অসংখ্য দালালশ্রেণীর প্রত্যক্ষ

সহযোগিতায়। যদিও তুলনামূলকভাবে পূর্ববাঙলায় ফাতেমা জিন্নাহ্‌র চেয়ে আয়ুব খান কম ভোট পেয়েছিলো।

আয়ুব যাদের উপরে নির্ভর করে নির্বাচনে জয়ী হলো—তারাই পাকিস্তানের, বিশেষ করে পূর্ববাঙলার কৃষকসমাজকে পঙ্গু করে রেখেছে। আরো স্বচ্ছভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, জমিদারী প্রথা, নামে মাত্র উচ্ছেদ করার নামে—পূর্ববাঙলার অমুসলীম সামন্ত শ্রেণীর কাছ থেকে ও ক্রমশঃ কৃষক সমাজের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নেয়ার প্রত্যক্ষ সরকারী ব্যবস্থার ছত্র-ছায়ায় —জোতদার, মহাজন, ইজারাদাররা এই সব জমির মালিকে পরিণত হয়, যার বাস্তব পরিনাম হলো পূর্ববাঙলার শতকরা পঁচাশি জন কৃষকের মধ্যে শতকরা সত্তর জন কৃষক—যাদের কিছু জমি আছে এবং যারা অধিকাংশ সর্বহারা ক্ষেতমজুরে রূপান্তরীত হয়ে দারুণ দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছে। পূর্ববাঙলায় শতকরা সত্তরজন কৃষকের এই দুর্দশার মূল কারণ হলো আভ্যন্তরীন সামন্তবাদী ও পাকিস্তানী আধা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার অন্য দুই বৃহত্তর সহযোগী মুৎসুদ্দি ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এক আয়ুবের আমলেই ৯৬ হাজার কৃষকের উপরে বকেয়া খাজনা-ট্যাক্সের জন্যে 'লাল পরোয়ানা' জারী করে তাদের স্থাবর-অস্থাবর শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়। গ্রামে গ্রামে চলে—তহশীলদারদের দৌরাত্ম্য। চৌকিদারী, দফাদারী আস্ফালনের হাতিয়ারে কৃষকের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। ওই সঙ্গে সুদখোর মহাজন, ইজারাদার ও জোতদারদের নিপীড়ন চরমে ওঠে, এবং খুবই দ্রুততার সঙ্গে কৃষকেরা সর্বশান্ত হয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। এমন কি কৃষক পরিবারের মেয়ে-বউদের ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে থাকে আয়ুবের চেয়ারম্যান মেম্বার ও জোতদার, আমিনদারী, মহাজন, ইজারাদাররা। ১৯৪৭ সালে—তহশীলদারী, আমিনদারী, ইজারাদারী প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়কৃত অঙ্কের পরিমান ছিলো ১½ কোটি টাকা। তা বাড়তে বাড়তে আয়ুবের দশকে এসে দাঁড়ায় ১৮ কোটি টাকায়। এই বোঝা মূলতঃ পূর্ববাঙলার সর্বহারা কৃষকের ঘাড়ের উপরেই চেপে বসে।

আওয়ামী লীগ 'ছয় দফা' প্রণয়নের পরবর্তী পর্যায়ে এক ঘোষনায় বলে, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা হবে। আওয়ামী লীগের এই ঘোষনায় দলীয় অসচেতন কর্মীদের মধ্যে উল্লাস দেখা দেয় এবং সমর্থকরাও

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই যে কেবল মেহনতি মানুষের কথা বলে না, আওয়ামী লীগও বলে—ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই 'উল্লাস' করার স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে কাদের দিকে যায়? যেখানে পূর্ববাঙলার ৬৪ শতাংশ জমির মালিকানা—কৃষকের শোষক জোতদার-মহাজন, প্রভৃতি শতকরা আটজনের হাতে কুক্ষিগত, যেখানে শতকরা পঁচাশি জন কৃষকের মধ্যে শতকরা সত্তর জন কৃষকের হাতে কিছু (দুই তিন বিঘা) জমি আছে, এবং অধিকাংশই হচ্ছে সর্বহারা ক্ষেতমজুর, সেই ক্ষেত্রে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করার ঘোষনা ও তহশীলদারী সীমিত করণ—কাদের স্বার্থ রক্ষা করে? কৃষকের, নাকি জোতদার, মহাজন, ইজারাদার প্রভৃতি সামন্তবাদী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে? কৃষকের হাতে জমি থাকলে তবেই তো এই ঘোষণা তাদের স্বার্থে লাগবে? আওয়ামী লীগ তাই অত্যন্ত সচেতন ভাবেই এই ঘোষণা করে অসচেতন জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে—শোষকশ্রেণীর হাতকেই শক্তিশালী করার স্লোগান দিয়েছে। যদিও আওয়ামী লীগের সঙ্গে মুসলীম কিম্বা পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর রাজনীতিগত ও শ্রেণীগত কোনো পার্থক্য নেই, তবুও 'ছয়দফা' প্রণয়নের মূল কারনই হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণের হাতিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি ধনিক বাইশ পরিবারের—বৃহত্তর পুঁজির শোষণের কাছে—পূর্ববাঙলার জোতদার, মহাজন ও বাঙালী ধনিক শ্রেণীর বিকাশের পথে বাইশ পরিবারের অপ্রতিহত বাধা সৃষ্টির দ্বন্দ্বই হলো শেখ মুজিবের 'ছয় দফা'।

স্বভাবতঃই পাঞ্জাবী মুৎসুদ্দি ও আমলা পুঁজির ধারক বাহক ও তাদের রক্ষাকারী পাহারাদার আয়ুব খান শেখ মুজিবের 'ছয়দফা' মার্কিনী চক্রান্তের ফসল হওয়া সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলো। 'ছয়দফা' নিয়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী দালালদের এই বিরুদ্ধাচারণ ও কামড়াকামড়ি হলো আঞ্চলিক প্রভুত্ব ও স্বীয় স্বার্থের অবাধ ক্ষেত্রকে অটুট অক্ষুন্ন রাখার ঝগড়া। যদিও আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য ১৯৫৬ সনেই সোহরাবর্দীর নেতৃত্বে 'পাক-মার্কিন সামরিক ও সাহায্য চুক্তি' ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে পাশ করিয়ে নিয়েছিলো এবং পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে 'সংখ্যা সাম্য নীতি' মেনে নিয়ে পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজকে টুটি টিপে হত্যা করেছিলো—

সেই আওয়ামী লীগ এবং তার পরবর্তী কর্ণধার শেখ মুজিব যখন 'ছয়দফা' প্রণয়ন করে বলেন যে, পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের জন্যেই আমার 'ছয়দফা' তখন সত্যিই হাসি পায়। পূর্ববাঙলায় স্বার্থরক্ষা করার জন্যে কথাটির বিশ্লেষণ হলো এই—পূর্ববাঙলার সামন্তশ্রেণী ও বাঙালী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ আদায়ের জন্যেই শেখ মুজিবের 'ছয়দফা' পূর্ববাঙলার জনগণের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে এই 'ছয়দফা'র জন্ম হয়নি।

মুসলীম লীগ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে চরিত্রগত কোনো পার্থক্য এই জন্যে নেই যে, ১৯৪৭ সনের আগে 'পাকিস্তান' সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করতে গিয়ে মুসলীম লীগ যে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান 'হিন্দু-মুসলীম দ্বিজাতি তত্ত্বে'র আশ্রয় নিয়েছিলো—মূলতঃ শেখ মুজিব 'ছয়দফা' প্রণয়ন করে সেই একই কায়দায় 'বাঙালী অবাঙালী' তত্ত্বে'র সূচনা করেছে। মুসলীম লীগের পতাকার আড়ালে মুখ লুকিয়েছিলো—আদমজী-ইস্পাহানীরা - ভারতের টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর হাত থেকে নিজেদের পুঁজির অবাধ বিকাশের জন্যে আলাদা একটা ভূখণ্ড সৃষ্টির তাগিদে; ঠিক সেই একই কারণে শেখ মুজিবের পতাকার আড়ালে মুখ ঢেকে, বাঙালী ধনিকেরা পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি গোষ্ঠী আদমজী-ইস্পাহানীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে—একটি স্বাধীন ভূখণ্ড সৃষ্টির প্রচেষ্টায় 'ছয়দফা'র লড়াইতে সামিল হয়েছে। এতে বিস্ময় প্রকাশের কিছু নেই। এই 'ছয়দফার' মধ্যেই ফ্যাসিবাদের অশুভ প্রেতাত্মা 'উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেহারা নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে বপন করলো তার বীজ। অবশ্য এই বীজ বহুপূর্ব থেকেই, ১৯৫৬ সনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় থেকেই তৈরী হওয়ার পথে চলছিলো, ১৯৬৬ সনে 'ছয়দফার' জমিতে সেই বীজ বপন হলো। এবং ধীরে ধীরে 'জয়বাংলা'র আওয়াজের মধ্যে তা অঙ্কুরীত হওয়ার প্রতীক্ষায় রইলো।

যে আওয়ামী লীগ ব্রিটিশ-ফ্রান্স-ইজরাইলী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর 'সুয়েজ' আক্রমণের অন্যায় কাজকে সমর্থন করে নাসেরের আবেদনকে অগ্রাহ্য করেছিলো, সেই আওয়ামী লীগের চরিত্রই হলো বিশ্বাসঘাতকতার চরিত্র, তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই হোক কিম্বা নিজেদের দেশের ভেতরেই হোক। ১৯৬৪ সনে আওয়ামী লীগের সেই বিশ্বাসঘাতকতার দাঁত আবার দেখা গেলো।

ভিয়েতনামের উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র এই সময় নতুন করে ব্যাপক

বিমান হামলা শুরু করলে ঢাকায় বামপন্থী ছাত্ররা হো-চি-মিনের দেশের স্বপক্ষে যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন গড়ে তুললো—আওয়ামী লীগ তখন তার বিরুদ্ধাচারণ করলো। স্থানে স্থানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল বাধাপ্রাপ্ত হলো। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ পাল্টা শ্লোগান তুললো—'চীন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।' 'চীন রাশিয়ার দালালেরা বাঙলা ছাড়ো।' 'হো-হো মাও-মাও, লাল টুপি চীনে যাও।' ইত্যাদি নোংরা পোষ্টারে ছাত্রলীগ দেয়ালের গা ভরিয়ে তুললো। তবুও অত্যন্ত সাহসীকতার সঙ্গে, খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ববাঙলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভিয়েতনামে মার্কিনী হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো। এক পর্যায়ে জনতা যখন ইউ. এস. আই. এস অফিসে অগ্নিসংযোগ করলো ভিয়েতনামে আক্রমণ বন্ধ করার জন্যে, সেই সময় বিভিন্নস্থানে প্রত্যক্ষভাবে পুলিশের সহযোগিতায় ছাত্রলীগ ব্যাপক হামলা শুরু করে ছাত্র ইউনিয়নের উপরে। ফলে উভয়পক্ষেই তুমুল সংঘর্ষ হয়। অনেকে জখম হয়, বহু বামপন্থী ছাত্রকে গ্রেফতার করে তাদের উপরে অত্যাচার চালানো হয়। আর শেখ মুজিব কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্যে তার নির্লজ্জ কণ্ঠস্বরকে চেপে রাখতে না পেরে বলেন—'ওরা শেখ মুজিবের গুণ্ডামী দেখেনি, ওদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো।' গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী উগ্রজাতীয়তাবাদী শেখ মুজিবের এই কণ্ঠস্বর নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদী।

পূর্ববাঙলায় সেই সময় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলে, এটা ছিলো সুগভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই অংশ। দাঙ্গার সূত্রপাত হয় কাশ্মীরের 'হজরত বাল' থেকে হজরত মুহম্মদ-এর কেশ অপহরণকে কেন্দ্র করে। এই কেশ অপহরণ নিয়ে তখন পাকিস্তান বেতার ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদী পত্র-পত্রিকা ভারত বিরোধী প্রচার চালাতে থাকে। ফলে সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর উস্কানিতে উত্তেজনা দেখা দেয়। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলরাও এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলো। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের দাঙ্গার অজুহাতে শুরু হয়ে গেলো পশ্চিম বাঙলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা বেড়ে গেলো অনেক বেশী।

এই দাঙ্গার পেছনে ছিলো সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা। পূর্ববাঙলার

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেয়া, শ্রমিক শ্রেণীর একতায় ফাটল সৃষ্টি করা, এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলা। যাকে কেন্দ্র করে একটা সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যেতে পারে। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন তার পাকিস্তানী অনুচরদের দিয়ে কিছুতেই 'চীন বিরোধী পাক-ভারতযুদ্ধজোট' গঠন করাতে পারলো না, তখন স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপরে তার 'সাহায্য ও সহযোগিতার হাত' সম্প্রসারিত করলো। ফলে পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে, এবং তারা মার্কিনী নীতির সমালোচনা করে, ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে—সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণচীনের সঙ্গে বিশেষ করে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী গড়ে তুলতে থাকে। গণচীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কের ফলে পুঁজিপতি শ্রেণীর পাহারাদার আয়ুব খানের সঙ্গেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। গণচীন ও পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্যে, উপমহাদেশকে 'চীন বিরোধী ঘাঁটি' তৈরীর ষড়যন্ত্রের বাইরে রাখার কৌশল হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে খুবই দ্রুত সম্পর্কের উন্নতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করে। চীন-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতির ফলে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের উপরে আরো রুষ্ট হয়। এবং 'কাশ্মীর'এর পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে—ওপরে লাহোরের মূল ভূখণ্ডে ভারতকে দিয়ে সরাসরি আক্রমণ করিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে দুর্বল ও পঙ্গু করার পরে—নিজেদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে টেনে আনার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করলো পাক-ভারত যুদ্ধের। ১৯৬৫ সনের 'পাক-ভারত যুদ্ধ' সম্পূর্ণভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই তৈরী করা যুদ্ধ। সতেরো দিনের যুদ্ধে ও হঠাৎ করে সম্প্রসারণবাদী ভারতীয় চক্রের অকস্মাৎ আক্রমণে পাকিস্তানের অর্থনীতি দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পাকিস্তান আক্রান্ত হয়ে 'সিয়াটো' সেণ্টো'র সদস্য হিসেবে আমেরিকার সাহায্য চাইলে আমেরিকা তা প্রত্যাখ্যান করে।

কিন্তু গণচীন পাকিস্তানের এই দুর্দিনে—সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী চক্রের 'সহযোগ' হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে নৈতিক সমর্থন ও সাহায্য দান করে। পাকিস্তান যখন মরীয়া হয়ে গণচীনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ও সমগ্র জাতির দুর্জয় মনোবল নিয়ে গড়ে তোলে প্রচণ্ড প্রতিরোধ—তখন 'মার্কিন-

রুশ হটলাইনের পরামর্শ অনুসারে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয় তাসখন্দ-চুক্তির মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পেছনে কোনো বৈদেশিক হাতের কারসাজি আছে কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যাই হোক এই 'তাসখন্দ চুক্তি'কে কেন্দ্র করে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ববাঙলায় বিতর্কের ঝড় ওঠে। আওয়ামী লীগ—ও শেখ মুজিব এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানায়। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি এই দাসত্বমূলক চুক্তির সমালোচনা করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বামপন্থী বিপ্লবী অংশ ও মওলানা ভাসানী 'তাসখন্দ চুক্তি'কে সঠিক বলে মেনে নিতে পারে নাই। এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী রাজনীতির প্রয়োগ ও তাত্বিক 'রুশ-চীন' বিরোধের ফল হিসেবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে দুই বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বের জন্যেই পূর্বপাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হয়ে—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার, আবদুল হক প্রমুখ 'গণচীন'কে সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়, এবং মুজফ্ফর আহম্মদ, জিতেন ঘোষ, খোকা রায় ও মনি সিংরা সোভিয়েত রুশিয়াকে সঠিক বলে স্বীকার করে নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলেও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আরো পরে দুই শিবিরে পৃথক হয়ে যায়। কমিউনিষ্ট পার্টি আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ববাঙলায় সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে ওকালতি করার একটি সংগঠন তৈরী হয়।

যদিও পাক-ভারত যুদ্ধের পরে—পাকিস্তানের অর্থনীতিতে মার্কিনী আধিপত্য অনেকখানি বেড়ে যায়, তা সত্বেও গণচীনের প্রতি পাকিস্তানের জন-সমর্থন ও শুভেচ্ছামূলক মনোবৃত্তির দরুণ প্রকৃত কমিউনিষ্টদের জনগণের মধ্যে সংগঠন বিস্তার করার অনেকখানি সুযোগ হয়। কিন্তু শোষকশ্রেণীর পাহারাদার ক্ষমতাসীন আয়ুবশাহী বিপ্লবী সংগঠনের অস্তিত্বের বিস্তৃতির মূলে আঘাত করা থেকে বিরত থাকেনি। সুবিধে যেটুকু হয়, তা হলো গণচীন থেকে (যদিও পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ) প্রচুর পরিমানে বিপ্লবী বই ও পত্র-পত্রিকা অবাধে পূর্ববাঙলায় আসার ফলে প্রকাশ্যে—সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রচার চালানোর একটা পরিবেশ তৈরী হয়। এবং ক্রমে এই পরিবেশের ব্যাপক অস্তিত্ব দানা বেঁধে ওঠে। তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রগতিবাদী চিন্তাধারা। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির দেয়ালে উৎকীর্ণ হয়—শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের

পোষ্টার-লিফলেট। জমে ওঠে তাত্বিক বিতর্ক। আর এর ফলে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। গণচীনকে ফাঁদে ফেলার জন্যে মার্কিনী ষড়যন্ত্রে 'পাক-ভারত যুদ্ধ' বাধানোর ফল হিসেবে—পাকিস্তানে মার্কিনী আধিপত্য মুৎসুদ্দী পুঁজিপতিদের উপরে বেড়ে গেলেও—মার্কিনীদের প্রতি জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও গণচীনকেই পাকিস্তানের জনগণের বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সুফল ফলে। পূর্ববাঙলার মানুষ ক্রমশই গণচীনের প্রতি আন্তরিক হয়ে ওঠে। তাই আবার নতুন করে ষড়যন্ত্র করতে থাকে আমেরিকা। ওই সময় পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। আমেরিকা এই স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে তাদের নিজেদের 'কমিউনিজম' বিরোধী চক্রান্তের হাতিয়ার হিসেবে—স্বীয় দালালদের মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকাশের মদত যোগাতে শুরু করে। এবং শেখ মুজিবের 'ছয় দফা' এরই কৌশল হিসেবে প্রণয়ন করা হয়। 'ছয় দফা'র মধ্যে কৃষকের দেশ পূর্ববাঙলার নির্যাতীত, নিপীড়িত, অভুক্ত কৃষকের স্বার্থের কোনো কথা স্থান পেলো না। শ্রমিকশ্রেণীর কথা সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হলো। স্থান পেলো না—সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোনো শ্লোগান। 'ছয় দফা'য় যা থাকলো—তা হলো পূর্ববাঙলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। অর্থাৎ পূর্ববাঙলার জনগণের সঙ্গে মুৎসুদ্দি পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকেই বড়ো করে দেখানোর অপপ্রয়াস। প্রকৃত পক্ষে 'ছয়দফা' হলো পূর্ববাঙলার বাঙালী উঠ্‌তি ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে—পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি বড়ো ধনিকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ফসল। যা দিয়ে পূর্ব বাঙলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটা আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করে তোলার প্রচেষ্টা। এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র অনেকখানি এগিয়ে গেলো। জনগণের একটা অংশকে আওয়ামী লীগ বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে সক্ষম হলো। তার কারণ—শতধাবিভক্ত পূর্ববাঙলার সামন্তশ্রেণীর শোষণে—ব্যাপক কৃষক জনগণ যখন বেকারী, কর্মহীন, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় জর্জরিত, তার উপরে বাঙালী ধনিকশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বড়ো পুঁজিপতিগোষ্ঠীর ক্রমবর্দ্ধমান শোষণে—মরনোন্মুখ কৃষক জনসাধারণ বাঁচার জন্যে পথ খুঁজছে; ঠিক সেই সময় আওয়ামী লীগ 'ছয়দফা' প্রণয়ন করে—জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে 'ছয়দফা' আদায় করতে পারলে—পূর্ববাঙলার বাঙালী জনগণ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারবে। আওয়ামী লীগের এই প্রচারনায় শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, বিশেষ করে বাঙালী

সরকারী-বেসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলো। কারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার উচ্চস্তরে, অফিসে ও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বড়ো কর্তাদের পদে—অধিকাংশই হলো অবাঙালী অফিসার। যার ফলে বাঙালী নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ বহুদিন থেকেই দানা বেধে উঠছিলো। আওয়ামী লীগ তাকে ইন্ধন যোগালো 'ছয় দফা'র লাইন দিয়ে।

আট

'ছয়দফা' শেখ মুজিবকে জনপ্রিয় করে তোলার পক্ষে চরম সহায়ক হাতিয়ারে পরিণত হলো। ১৯৬৬ সনের ৫ই জুন ঢাকা নারায়ণগঞ্জে 'ছয়দফা'র দাবীতে হরতাল আহ্বান করলো আওয়ামী লীগ। বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে ঢাকার ইসলামপুর রোডে গুলি চালালো পুলিশ। কয়েকজন ভীষণভাবে আহত হলো, প্রাণ হারালো একজন। এবং নারায়ণগঞ্জে জনতাকে উস্কানি দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা ঘরে বসে রইলো। জনতা থানা চড়াও হলে পুলিশের সঙ্গে প্রচণ্ড রকম সংঘর্ষ হয়, গ্রেফতার করা হয় বহু লোককে। গ্রেফতার হয়ে তারা নির্বিচার উৎপীড়নের শিকার হয়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের ঘটনা সমূহ—সমগ্র পূর্ব বাঙলাকে উত্তেজিত করে তোলে। 'ছয়দফা'র ধ্বনিতে বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানে স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় জনতা। হরতাল পালিত হয় সমগ্র পূর্ববাঙলায়। আর 'ছয়দফা'র আন্দোলন—তীব্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে—বাঙালী অবাঙালী জনগণের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে ওঠে চাপা একটা বিমাতাসুলভ বিদ্বেষ।

নিরুপায় হয়েই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলো প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান। গ্রেফতার হলো আরো অনেকে। বেশ কিছুদিন ধরে চললো সরকারী দমন-পীড়ন। অবশ্য বামপন্থীরা 'ছয় দফা'কে সমর্থন না করলেও—জনগণের উপরে ব্যাপক সরকারী দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যেও আয়ুব সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান 'নেভী'র একজন অফিসার কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ট মুজিবসহ বহু অফিসার, প্রাক্তন অনেক সামরিক বাহিনীর বাঙালী কর্মচারী ও কয়েকজন

সি. এস. পি (পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস) অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়—পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের সর্বপ্রধান—গুরমানির পরিকল্পনা অনুসারে। এবং আরো অনেককেই গ্রেফতার করা হবে এই আশঙ্কায়, আওয়ামী লীগের সমস্ত সাংগঠনিক তৎপরতা দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। সমগ্র দেশে বিরাজ করতে থাকে একটা থমথমে পরিবেশ। এবং কিছুদিন পরে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হওয়ার আগে জানা গেলো শেখ মুজিব, কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম প্রমুখকে মার্কিনী প্ররোচনায় ভারতীয় সহযোগিতায় পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই 'বিশেষ আদালতে' বিচার করা হবে।

এই সময় পূর্ববাঙলার বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে। পূর্ববাঙলার বুকে চরম খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। স্বৈরাচারী সামরিক একনায়কতন্ত্রের নিষ্পেষণে জনজীবন ভেঙে পড়ার উপক্রম প্রায়। টানা আট বছরের 'ডাণ্ডা'র শাসনের নিচে জনসাধারণ পিষ্টিত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। তার মধ্যে খাদ্য সঙ্কট চরমে পৌছায়—পূর্ববাঙলার সর্বত্র হাহাকার দেখা দেয়। মার্কিন সম্রাজ্যবাদের 'পি, এল ৪৮০' এর মাধ্যমে পাউডার মেশানো হাজার হাজার টন অখাদ্য ভূট্টা পূর্ববাঙলার ক্ষুধিত মানুষের জন্তে রেশনিং-এর মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা হয়। এবং এটা অপরিহার্যভাবে নিতেই হবে প্রত্যেককে। এই সব ভূট্টার বস্তার গায়ে অবশ্য সিল দেয়া ছিলো "নট ফর হিউম্যান কন্‌জামশন"। অথচ সেই মানুষের জন্তে অব্যবহার্য ভূট্টা পূর্ববাঙলার মানুষকে খাওয়ানো হতে থাকে। বিষক্রিয়াযুক্ত সেই ভূট্টা খেয়ে বেশ কিছু লোক পূর্ববাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে মারা যায়। পাবনাতেও কিছু লোকের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে বামপন্থীদের নেতৃত্বে ভূট্টা বিরোধী আন্দোলন প্রদেশের অনেক জায়গায় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। পাবনাতে বিপ্লবী কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুকের দোকান লুট করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন। ওই দিন সমগ্র পাবনা জেলা সদরে সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিকল হয়ে গিয়েছিলো। দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলো। পরে মিলিটারী নামিয়ে ভয়ার্ত সরকারী প্রশাসনকে সচল করা হয়। পাবনার বামপন্থী নেতৃত্বে চালিত এই সশস্ত্র ভূট্টাবিরোধী লড়াইকে কেন্দ্র করে পূর্ববাঙলায় এক নতুন উদ্দীপনার জন্ম হয়। জনতা 'শুধু মুখে' স্লোগানের

আন্দোলনের চাইতে হাতিয়ার তুলে নেয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁরা বুঝতে পারে সশস্ত্র প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে নিরস্ত্র আওয়াজ কোনো অধিকার অর্জন করতে পারে না। অস্ত্রের শাসন ও শোষণের যন্ত্রকে অস্ত্র দিয়েই রুখতে হবে।

মিলিটারী আয়ুব খানও ঘাবরে গেলো ভীষণ ভাবে। এক ঘোষনায় ভুট্টো প্রত্যাহার করা হবে বলে প্রচার করা হলো। পূর্ববাঙলার গভর্ণর তখন আয়ুবের পা-চাটা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ আবদুল মোনেম খান। কথায় কথায় সে ইসলামের শত্রু ও পাকিস্তানের সংহাত বিপন্নকারীদের প্রতি হুমকি দিয়ে বসে। এই লোকটি নির্লজ্জ দালালীর জন্যে আয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের আওতায় দীর্ঘ নয় বছর গভর্ণরের পদে বহাল ছিলো। এবং প্রত্যেক পদক্ষেপেই পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি পুঁজির স্বার্থরক্ষা করেছে। ভারত বিরোধী ভূমিকায় সে কট্টর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর। যার ফলে বহু অঘটন এই লোকটি খুবই নির্বিশঙ্কচিত্তে ঘটাতে পেরেছে। বিশেষ করে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'র সময় তার ভূমিকা সাম্প্রদায়িক প্রচারনায় খুব উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে। যাই হোক (আবদুল মোনেম খানকে পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দিদের সুযোগ্য বাহন বললে অত্যুক্তি হবে না। এই লোকটিই বাঙলা ভাষাভাষীদের সংস্কৃতির উপরে বার বার করে হামলা চালায়।) মুসলমান মেয়েরা কপালে টিপ পরলে নাকি 'হিন্দু' হয়ে যায়—এবং বাঙালী জাতির পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করাটাও নাকি 'হিন্দু কৃষ্টি'র নির্লজ্জ অনুকরণ ও ইসলামী তমুদ্দুনের অবমাননা। (শুধু তাই নয় ঢাকা বেতার থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করাও একরকম বন্ধ করে দেয়া হয়। গভর্ণর মোনেম কতটা অজ্ঞ ও অন্ধ যে, বাঙলা একাডেমীর ডিরেক্টরকে ডেকে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' লেখার উপদেশ পর্যন্ত খয়রাত করে।) এ নিয়ে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে (প্রগতিশীল অংশ) দারুণ ক্ষোভ ও ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। (পূর্ববাঙলার প্রগতিশীলরা রবীন্দ্রনাথের উপরে হামলা করাকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন, এবং এই সাম্প্রদায়িক অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। শাসকশ্রেণী রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু' এবং সে 'হিন্দু'দের কবি, 'মুসলমান'দের জন্যে তাঁর কোনো অবদান নেই, ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক শ্লোগানকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তথাকথিত 'পাকিস্তানী তমুদ্দুন ও তাহ্‌জীব'এর একটা জগাখিচুড়ির বিবরে সমগ্র বাঙালী জাতির স্বীয় সংস্কৃতিকে ডুবিয়ে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতির সংগ্রামী চেতনাকেই নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করে।) শাসক ও শোষক শ্রেণীর

এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বামপন্থী ছাত্র সমাজ ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এবং বিভিন্ন ভাবে এর বিরোধীতা করতে থাকেন। তাঁরা শাসকশ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন—"আমরা যারা ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনের মহান সংগ্রামী পতাকাকে—সমস্ত অত্যাচার দমন-পীড়ন অগ্রাহ্য করে উচ্চে তুলে ধরেছিলাম, তারা অনেকেই আজো বেঁচে আছি। প্রয়োজন হলে আমরাই আয়ুব মোনেমের এই নতুন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে সবার আগে বুকের রক্ত দেবো।"[7] বিভাগ-পূর্ব বাঙলার তৎকালীন মুসলীম লীগের সম্পাদক ও ঢাকার ইসলামিক একাডেমীর ডিরেক্টর, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি জনাব আবুল হাশিম, গভর্ণর মোনেম খানকে 'আলমগীরের ভূমিকায় শিশির কুমার ভাদুড়ি' বলে অভিহিত করেন। বুদ্ধিজীবিদের প্রচণ্ড লড়াই-এর মুখে শাসক ও শোষকশ্রেণীর এই হীনতম ষড়যন্ত্র চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলা তথা ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের সংগ্রামী চেতনার অভাবের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা যেতে পারে।

পশ্চিম বাঙলা তথা সমগ্র ভারতে আজ পর্যন্ত যতটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে—পৃথিবীর কোথাও তার একটি মাত্র নজীর নেই। পৃথিবীর 'বৃহত্তর গণতন্ত্রের দেশ'-এর এটাই হয়তো ট্রাডিশন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়—পূর্ববাঙলার মুষ্টিমেয় প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবিরা বার বার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে রকম সংগ্রামী দৃষ্টান্ত দেখাতে পেরেছেন সমস্ত অত্যাচার দমন-পীড়নকে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রাহ্য করে; পশ্চিম বাঙলা তথা ভারতের বুকে তেমন কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি? একটি মাত্র দৃষ্টান্তও আমার জানা নেই। তাহলে কি এটাই মনে করতে হবে যে, ভারত বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলায় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদেরই কোনো অস্তিত্ব নেই? তাই মনে করলে—বুদ্ধিজীবিরা আজ কোন্ শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন বলতে হয়? পাশ্চাত্যের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে বুদ্ধিজীবিরা কি গণ-বিরোধীতারই মদত যোগাচ্ছেন এখন? কিম্বা যে পশ্চিম বাঙলায় বামপন্থী সংগঠনের এত শক্তি, সেই পশ্চিম বাঙলায় আজও অসাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন হল না কেন? কেন আজ 'ফ্যাসিজম'-এর সর্বত্র নির্বিচার অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল না দুর্জয় বিপ্লবী লড়াই?

যাই হোক, পূর্ব-বাঙলায় ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়

থেকে বামপন্থী আন্দোলন ক্রমাগত অত্যন্ত শক্তিশালী ও সংগঠিত আকার নিতে শুরু করে। তীব্র হয়ে ওঠে পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী। প্রকাশ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির তরফ প্লাটফরম্ থেকেও (যেটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পেটি বুর্জোয়া সংগঠন) সমাজতন্ত্রের শ্লোগান ওঠে। শ্লোগান ওঠে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, মার্কসবাদী লেনিনবাদী'র তরফ থেকে 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা গঠনের। শ্লোগান ওঠে—সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও তার মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সমস্ত শোষণ-শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে এক সুখী সমৃদ্ধশালী শোষণ-পীড়নহীন সমাজব্যবস্থা গঠন করার। আর এরই পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত সুকৌশলে শেখ মুজিবকে দিয়ে 'ছয়-দফা' প্রণয়ন করে—পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক আকাশে নয়া ষড়যন্ত্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে। শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়। আর চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালী সামন্তশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ একেবারেই নীরব হয়ে যায় সরকারী দমন-পীড়নের মুখে। সমগ্র পূর্ব বাঙলার বুক থেকে মুছে যায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অস্তিত্ব। দলের ছোট-বড় সব নেতা ও পাতি নেতারা আয়ুব সরকারের 'ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামে'র ঠিকাদারী নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেন তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো কালে—কোনো-দিনই কোনো পরিচয় ছিল না। তারা বেজায় ভালোমানুষ। ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। অথচ তাদেরই নেতা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সমর্থক পাকিস্তান 'নেভী'র বহু অফিসার ও প্রাক্তন বাঙালী সৈনিকদের উপরে চলছে তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন। এর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ আড়াই বছর আওয়ামী লীগ কোনোরকম প্রতিবাদ কিম্বা আন্দোলন গড়ে তোলেনি। সুবিধাবাদীর দল বেড়ালের তাড়া খেয়ে ইঁদুরের মতো গর্তের মধ্যে সুড় সুড় করে ঢুকে পড়েছিল—পিঠের চামড়া বাঁচানোর তাগিদে। এমনকি শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পরে কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, এই খবরটুকুও আওয়ামী লীগের কারোরই জানা ছিল না; অবশ্য জানা ছিল না বললে ভুল হবে, তারা জানবার কোনো চেষ্টাই করে নি। বরং আওয়ামী লীগের তৎকালীন অস্থায়ী সম্পাদিকা আমেনা বেগম মাঝে মাঝে কিছু কথাবার্তা বলেছেন, বহু আওয়ামী লীগের লেবেলধারী নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন 'কিছু একটা' করার জন্যে, কিন্তু

ভদ্রমহিলা কোনোরকম সহযোগিতা পান নি। আর সমালোচনার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে হয়েছে তাকে। মাঝখান থেকে ভদ্রমহিলার স্বামীকে মস্তবড় একটা সরকারী অফিসারের পোস্ট থেকে অকালে বিদায় নিতে হয়েছিল। তবুও আওয়ামী লীগের সেই দুর্দিনে ওই একটি মাত্র কণ্ঠস্বর, 'আমেনা বেগম'কেই খুঁজে পাওয়া যেতো। কিম্বা সমুদ্রের জল 'ঝিনুক' দিয়ে সিঞ্চনের মতো তার অস্তিত্ব বোঝা যেতো।

আয়ুব খান চতুর্দিকে ভালো করে আটঘাঁট বেধেই শুরু করল 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা।' প্রকাশ্য "বিশেষ আদালতে" শুরু করা হল এই মামলা। পূর্ব বাঙলার মানুষ উন্মুখ হয়ে রইল এই মামলার দিকে তাকিয়ে। চারদিকে চলতে লাগল জল্পনা-কল্পনা। 'আসামী'রা আদালতের সামনে তাদের উপরে হাজারো দৈহিক নির্যাতনের অচিন্ত্যনীয় ঘটনাবলী ফাঁস করে দিলে—জনগণের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দানা বেধে উঠতে থাকে। এই সময় শেখ মুজিবের সঙ্গে আদালতে এতদিন ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকা অনেক নেতা দেখা করতে গেলে—শেখ মুজিব তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন—'এখানে কোনো দরকার নেই তোমাদের, জনগণের কাছে যাও।'

আগেই উল্লেখ করেছি, 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'র 'দ্বিতীয় নম্বর ব্যক্তি' কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের উদ্ধৃতি দিয়ে যে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা' আয়ুবের সাজানো হলেও—এর পেছনে বাস্তব অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। এই 'অস্তিত্বে'র পেছনে ছিল ত্রিশক্তির সম্মিলন। এক নম্বর, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দুই নম্বর, ভারত, ও তিন নম্বর কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও শেখ মুজিব গোষ্ঠী।

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বন্দী হওয়ার আগে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, মার্কসবাদী লেনিনবাদী'র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার ফলে—(আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে) তার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন "আপনারা আমাদেরকে সি. আই. এ'র এজেন্ট মনে করে আমাদেরকে কোনো রকম সাহায্য সহযোগিতা করেন নি।"

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের এই বক্তব্যে এইটুকুই বোঝা যায় যে, তিনি নিজেকে সি. আই. এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নন, বলে দাবী করেছেন। কিম্বা যখন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন—সেই সময় তিনি অনেক ঘটনা ও নানা টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ফলে মার্কিনী নীতির উপরে ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলেন। যাই হোক, ঘটনার পেছনে কেবল

ঘটনাই ছিল না। অত্যন্ত শক্তিশালী বাস্তব পরিকল্পনাই এর মূলে সুসংবদ্ধ ছিল। সোহরাবর্দীকে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'শক্তিশালী কেন্দ্র' গঠন করার যখন পরিকল্পনা নেয়, তখন তার কৌশল ও উদ্দেশ্য ছিল আলাদা। এই কৌশল অকেজো প্রমাণিত হলে ষাটের দশক থেকে, বিশেষ করে ভারতকে দিয়ে চীন আক্রমণ করার পর থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতের পুঁজিপতিদেরকে বেশী করে মদত যোগাতে শুরু করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দিদের ক্ষিপ্ত করে দিয়ে, পূর্ব বাঙলাকে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই জন্যেই পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সনে পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম বাঙলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৬৫ সনের ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণ সংঘটিত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

পাকিস্তান 'নেভী'র অফিসারদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঁতাত ষাটের দশকেই শুরু হয়। দীর্ঘ কয়েক বছরের ষড়যন্ত্রের মধ্যে অনেক বাঙালী সামরিক বাহিনীর লোক রিটায়ার্ড করে। তারাও ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে থাকে পূর্ব-বাঙলাকে 'বিচ্ছিন্ন' করার জন্যে। আর এই প্রস্তুতির পেছনে ১৯৬৬'র গোড়া থেকেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা R. A. D (রিসার্স অ্যাণ্ড অ্যানালিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট) গোপনে গোপনে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় অর্থকরী সাহায্য যোগাতে থাকে। এর সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সম্পর্ক ছিলো সব সময়ের জন্যেই। বিশেষ করে ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার সব রকমের রসদ ও সাহায্য-সামগ্রি দেয়া হতে থাকে। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম আমাকে বলেছিলেন যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে তাদের মতৈক্য হওয়ার পরে তিনিই (শেখ মুজিব) এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশেষ করে ভারত সরকারের সঙ্গে পূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। যতদূর জানা যায়, তাতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা—'র‍্যাড' এর সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এর 'পূর্ববাঙলা বিচ্ছিন্ন করার নকশা'র ব্যাপারে এই রকম মতৈক্য হয় যে, পাকিস্তান থেকে পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্র ভূটান ও সিকিমের মতো পূর্ববাঙলাতেও ভারতীয় কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকবে, আসামকেও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পূর্ববাঙলার জনগণ ও আসামের জনগণকে পরস্পরের লাভের কথা বলে বিভ্রান্ত করে—পূর্ববাঙলার

বুকে চীন বিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটি নির্মান করা হবে। এই পরিকল্পনা সফল করার হাতিয়ার হিসেবে 'জনপ্রিয় নেতা' শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ' কাজ করবে। পূর্ববাঙলার বুকে শেখ মুজিবের 'স্বাধীনতা' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাঙলা 'নেভী'র বাঙালী সৈনিকেরা আচমকা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে হামলা চালাবে, পদাতিক বাহিনীর সদস্যরা (ই. পি. আর. ও ই. বি. আর-এর সৈন্যরা) ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করবে, বিমানবন্দর দখল করে নেবে, আর আমেরিকান প্যারাট্রুপস চলে আসবে ইন্দোনেশিয়া থেকে। সকলের আগে আমেরিকা পূর্ববাঙলাকে 'বিচ্ছিন্ন' হওয়ার ঘোষণাকে সমর্থন করবে, তার পরে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ –প্রত্যক্ষ ভাবে সমর্থন করবে শেখ মুজিবকে। মার্চ করবে পূর্ববাঙলার সীমান্ত অতিক্রম করে। বসানো হবে এক তাবেদার পুতুল সরকারকে। সুপরিকল্পিতভাবে চলবে কমিউনিষ্ট হত্যা। তারপরে গণচীন বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ-বাদী চক্রের মিলিত শক্তি নিয়ে গঠন করা হবে সামরিক যুদ্ধ জোট।

ইন্দোনেশিয়া কেন পূর্ববাঙলার 'বিচ্ছিন্ন' হওয়ার ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করবে? 'চীন বিরোধী যুদ্ধ ঘাঁটি' তৈরীর স্বার্থেই ইন্দোনেশিয়া সমর্থন দিতে রাজি হয়েছিলো। নাসুশন-সুহার্তো চক্র মাত্র কিছুদিন আগে ইন্দোনেশিয়ায় চৌদ্দ লক্ষ কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট সমর্থক এবং তাঁদের সাহায্যকারীদেরকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শ অনুযায়ীই নির্মম-নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে ইন্দোনেশিয়ার 'মহাপুত্র' আইদিতকে। সেই নাসুশন-সুহার্তো চক্রের স্বার্থ পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করে 'চীন বিরোধী' যুদ্ধ ঘাঁটি নির্মানেও কিছু কম ছিলো না। মুসোলিনী ও হিটলারের কমিউনিষ্ট নিধনের তুলনায়, নাসুশন-সুহার্তো চক্রের কমিউনিষ্ট হত্যা কোনো দিক থেকেই ছোট নয়। বরং ইন্দোনেশিয়ায় পাইকারী হারে নৃশংস কমিউনিষ্ট নিধন যজ্ঞের পরে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনকারী বিভিন্ন দেশের চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া-শীলদের কথায় কথায়—নিজেদের দেশের কমিউনিষ্টদেরকে 'ইন্দোনেশিয়া ঘটানো হবে' বলে হুমকি দেয়ার সাহস বেড়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব বাঙলার বুকে আওয়ামী লীগের কণ্ঠেও এই হুমকি শোনা গেল। দেয়ালে আলকাতরার ছাপে লেখা দেখা যেতে লাগলো—'এদেশ ভিয়েতনাম হবে না, হবে ইন্দোনেশিয়া।'

আফগানিস্তানের স্বার্থ হলো প্রতিবেশী পাকিস্তানের শক্তির হুমকিকে খর্ব

করা। বিশেষ করে পাকিস্তানের সীমান্তের 'লালকোর্তা' নেতা পাকতুনিস্তানের দাবীদার খান আবদুল গফ্ফার খানের প্রতি কাবুল সরকারের সমর্থন ও আশ্রয় দান, 'পাকতুনিস্তান' দাবীর সমর্থক ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক কোনোদিনই স্বাভাবিক ছিলো না। তাই পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করতে রাজি হয়েছিলো আফগানিস্তান। পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে হয়তো 'পাকতুনিস্তান' দাবীকেও জোরদার করা সম্ভব হবে—এরকম ধারণাও আফগানিস্তানের পক্ষে পোষণ করার যথেষ্ট কারণ ছিলো।

পূর্ববাঙলায় বিচ্ছিন্নতার লড়াই শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে 'পাকতুনিস্তান' সৃষ্টির বিচ্ছিন্নতার লড়াই শুরু করা যায়, তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে 'পাকতুনিস্তানের' দাবীদার সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফ্ফার খানকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ভারত সফরে নিয়ে আসা হয় কাবুল থেকে। এবং তার মুখ দিয়ে পাকিস্তান বিরোধী কথাবার্তা প্রচার করা হয়। তাকে ভারতবন্ধু আখ্যায়িত করে নগদ একলক্ষ টাকা উপহার দেয়া হয় সরকারের তরফ থেকে। এবং 'পাকতুনিস্তানের' দাবীর কথাও ওই সঙ্গে ভারতীয় বেতার থেকে প্রচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিলো ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের মূল উদ্দেশ্য। পাকিস্তানকে এভাবেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্র খতম করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। একদিকে পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করা, অন্যদিকে সীমান্ত প্রদেশকে আলাদা করার এই ষড়যন্ত্র ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের নতুন উদ্যোগ নয়। এটা বহুদিনের। এজন্যেই যখন পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার সময় প্রায় আসন্ন ঠিক সেই সময় কাবুল থেকে খান আবদুল গফ্ফার খানকে ভারতে নিয়ে আসা হয়। এবং তার মহিমার আকাশকুসুম কীর্তন শুরু করা হয় ভারতীয় আকাশবাণী থেকে। সুতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের—পূর্ববাঙলা বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রকে আফগান সরকার সমর্থন দিতে রাজি হয়েছিলো। যেমন পূর্ববাঙলা বিচ্ছিন্ন হলে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের লাভ হবে, ঠিক তেমনি 'পাকতুনিস্তান' কায়েম হলে আফগানিস্তানেরও লাভের অঙ্কটা কিছু কম নয়।

কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।' এই বক্তব্যের নিগূঢ় রহস্যের আবরণ তিনি উন্মোচন না করলেও, আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তারা নিজেরা

(সামরিক বাহিনীর লোকেরা) কখনোই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিম্বা ভারতীয় শাসক চক্রের সঙ্গে আঁতাত করতে চাননি। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাদের 'পূর্ব বাঙলা স্বাধীন করার' এবং বাঙালী সেনাবাহিনীর সহায়তা লাভ করা ও বাঙালী সৈন্যদের দ্বারা পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সমঝোতা হওয়ার পরে—শেখ মুজিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেই—তাদের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। এমনকি শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমসহ বহু বাঙালী সামরিক অফিসার ও তাদের সংস্থার প্রচুর সদস্যকে নির্বিচার অত্যাচারের মুখে ঠেলে দেন। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের বক্তব্য অনুসারে বোঝা যায়—এরা কখনোই নাকি 'পূর্ববাঙলা স্বাধীন' করার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে ভারতীয় অস্ত্র সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করলেও—পূর্ববাঙলার মাটিতে ভারতীয় সৈন্যদের অনুপ্রবেশ ঘটতে দিতেন না। যা শেখ মুজিব করতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার বাস্তব পটভূমিকায় ইতিহাসের অমোঘ বিধান থেকে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমেরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী নন বলে বাঁচাতে চাইলেও—ইতিহাস বলে এরা সবাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রেরই পুতুল হিসেবে পূর্ববাঙলাকে 'স্বাধীন' করার কাজে ব্রতী হয়েছিলো। যদিও শেখ মুজিব ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের মূল অধিনায়ক। যেহেতু একটা দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে, তার পেছনে জনগণের সমর্থন সব চাইতে বেশী প্রয়োজন। 'ছয়দফা'র মাধ্যমে পূর্ববাঙলার জনগণকে ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী করার প্রচেষ্টা অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছিলো। আর মাত্র কিছুদিন সময় পেলেই হয়তো এই 'ষড়যন্ত্র' সফল হতে পারতো। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি ছিলো—রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

জানা যায়, এই হীনতম সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ষড়যন্ত্রকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ধরে ফেলে, এবং পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করে দেয়। এ কথা ঠিক যে, পাকিস্তান সরকার প্রগতিশীল কিম্বা জনগণের সরকার নয়, তবুও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলায়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পূর্ব বাঙলায় সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী চক্রের 'জনগণ বিরোধী' যুদ্ধ ঘাঁটি নির্মাণের চক্রান্তকে সফল হতে দিলে, কোটি কোটি মানুষকেই তার খেসারৎ দিতে হতো। জনগণের স্বার্থেই এই ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতাই ছিলো প্রগতিশীলদের হাত শক্তিশালী হওয়ার একটা কল্যাণকর দিক। যদিও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই কেনা লোক, তবুও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ ও মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি পশ্চিম পাকিস্তানী বাইশ পরিবারের পাহারাদার হিসেবে প্রেসিডেন্ট আয়ুব নির্বিচার দমন-পীড়ণ শুরু করে দেয় এবং প্রতিদ্বন্দী শেখ মুজিব ও তার দলকে মেরুদণ্ডহীন করার জন্যে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অবতারনা করে। এটা হলো পাকিস্তানের দুই প্রদেশের সাম্রাজ্যবাদী অনুচরদের পারস্পরীক স্বার্থরক্ষা করার কামড়াকামড়ি। পূর্ববাঙলার জনগণের স্বার্থ রক্ষা, কিম্বা 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যক্তিত্ব' হিসেবে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ভারতীয় ও মার্কিনী ষড়যন্ত্রকে বানচাল করেনি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান। বানচাল করতে হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। যে ভাবেই হোক একটা সুগভীর ষড়যন্ত্র বানচাল হয়েছিলো এটা ঠিক। এ ভাবেই পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পারস্পরীক 'বখরা রক্ষা'র কামড়াকামড়ির জন্যে জনগণ বিরোধী অনেক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থ হবে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্থানপতনের পরবর্তী ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করার আগে, বহু আলোচিত পূর্ববাঙলায় একটি সি. আই. এ'র দলিল সম্পর্কিত ব্যাপারে এখানে আলোচনার প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এই ঘটনার উল্লেখ করছি। অবশ্য বাইরের দিক থেকে আমি এবং আরো অনেকে যেভাবে এই ঘটনার আভাস ও ইঙ্গিত পেয়েছি এবং পরবর্তীতে তার মর্মান্তিক পরিণতি দেখেছি, এখানে তাই আলোচনা করছি। সি. আই. এ. কিভাবে একটি দেশের সর্বনাশ করে, ও কাদের সাহায্যে করে, এবং এখনো ষড়যন্ত্র করে চলেছে, তা 'আজকের ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর পদানত 'বাঙলা দেশ'-এর জনগণের জানা একান্ত দরকার। জানা দরকার পশ্চিম বাঙলার জনগণ তথা ভারতীয় জনগণেরও।

এই সি. আই. এ'র দলিলকে কেন্দ্র করে পূর্ববাঙলার বিপ্লবী বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, পরস্পর বিরোধী নানা রকম বক্তৃতা-বিবৃতির ঝড় ওঠে। ভাঙন দেখা দেয় ভাসানী ন্যাপ ও পূর্বপাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, মার্কসবাদী লেনিনবাদী'র মধ্যে। বিশেষ করে 'ভাসানী-তোয়াহা'র মধ্যেই এ ব্যাপারে চরম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয়, সি. আই. এ. 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের' মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে

ও পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহের ঘূর্ণিপাকে ফেলে যথেষ্ট লাভবানই হয়েছিলো। যে-ভাঙন আজো জোড়া লাগে নাই।

নয়

সি. আই. এ. দলিল প্রসঙ্গে

ছেলেটির নাম জাহাঙ্গীর। ফুটফুটে য়ুরোপীয়ান সাহেবদের মতো দেখতে। বয়েস সতেরো আঠারো। ঢাকার একটি ইংরেজী স্কুলের ছাত্র। অত্যন্ত স্মার্ট। অনর্গল ইংরেজী বকে। ওর মুখে ইংরেজীর খই। আর বিস্ময়কর ঘটনা হলো মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙ চিন্তাধারার উপরে ওর দখল। যখন বলে, তর্ক করে, ওর মুখ বন্ধ করা যেতো না, উদ্ধৃতিগুলো ঠোঁটস্থ। গট্‌গট্‌ করে আওড়ে যায়।

আমি এই ছেলেটিকে প্রথম দেখি ১৯৬৭ সনের মাঝামাঝি ঢাকার বাঙলা বাজারের চীনের বইপত্র-পুস্তক পুস্তিকা বিক্রেতা 'চলন্তিকা বইঘর'এ। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন লাইব্রেরীর পরিচালক সফিউর রহমান খান। কথায় কথায় অনেক কথা আলোচিত হওয়ার মাঝখানে জাহাঙ্গীর আমাকে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছিলো—'আপনি কতদিন কমিউনিষ্ট পার্টি করছেন? পার্টির ষ্ট্রেনথ্‌ কেমন? কতদিনে বিপ্লব শুরু করতে পারবেন?' আমি কোনো জবাব দিইনি। মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। পরে বলেছিলাম, আমার সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কিছু জানি না। জাহাঙ্গীরকে কেন জানি সেদিন আমার ভালো লাগেনি। মনে হয়েছিলো বয়স অনুপাতে বড়ো বেশী পাকা, এবং যে সব প্রশ্ন ও জিজ্ঞেস করে প্রথম পরিচয়েই—তা খুবই মারাত্মক। কেউ কমিউনিষ্ট পার্টির লোক হলেই কি জাহাঙ্গীরের ওই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? বিশেষ করে যে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ!

আমার ভালো না লাগলেও জাহাঙ্গীরের তাতে কিছুই যায় আসে না, ওর চেহারা, ওর বয়েস, বিপ্লবী রাজনীতি সম্পর্কে ওর জ্ঞান, ইংরেজী স্পিকিং-পাওয়ার, সব কিছুই ওকে নেতাদের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করেছিলো. বিশেষ করে ছাত্র নেতাদের সঙ্গে ওকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখা যেতো। কেউই ওকে সন্দেহের চোখে দেখতো না। বরং স্নেহই করতো।

১৯৬৮ সনের প্রথম দিকে, তখনো মার্কসবাদীরা প্রকাশ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অভ্যন্তরে নিজেদের অবস্থান খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করেন নি। কাপ্তান বাজারের ন্যাপ অফিসে—একদিন সন্ধেবেলা কর্মী সমাবেশে ন্যাপ নেতা নূরুল হুদা কাদের বক্স্ সর্বপ্রথম ন্যাপের মধ্যে মার্কসবাদী লেনিন-বাদীদের পদচারনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষনা করেন, এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করেন (অবশ্য যতটা বলা সম্ভব)। ওইদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একজন ন্যাপ নেতা জয়েন উদ্দীন আহমেদও ঢাকায় এসেছিলেন। এবং তিনিও উপস্থিত ছিলেন কর্মী সমাবেশে। এক সময় তিনি বক্তৃতা করতে উঠলে—জাহাঙ্গীর বারবার তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে কমিউনিজম্ ও কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে, পার্টির শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করে। যেসব প্রশ্ন নিয়ে খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে—'Informer of the enemy' বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর জিজ্ঞেস করছিলো পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লব হলে পশ্চিম পাকিস্তানের পার্টি তা সমর্থন করবে কিনা। পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি ও সংগঠনের জোর কতটা। জয়েন উদ্দীন আহমেদ সেই প্রশ্নে বিরক্ত হলেও, আমার মনে হয়েছিলো—তিনি সেই বিরক্তি চেপেই বলেছিলেন, 'আমি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি করি, অন্য কোনো খবর আমার জানা নেই।' জাহাঙ্গীরের সেদিনের ঔদ্ধত্যও আমার কাছে ভালো লাগে নি। কিন্তু অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখে ওর প্রশংসা শুনেছি আমি। প্রশংসা না করার মতোও কোনো কারণ ছিলো না। ছেলেটি মস্কোপন্থী ন্যাপের খুব সমালোচনা করতো, সংশোধনবাদী বলে তিরস্কার করতো। এবং কথায় কথায় মাও সে তুঙের উদ্ধৃতি দিয়ে, চীনের বিপ্লবী তত্ত্ব আওড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। আমি দেখেছি, শ্রমিকরা ওর ইংরেজীর তুবড়ী না বুঝলেও কৌতূহলিত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনেছে।

ন্যাপের নেতৃস্থানীয়, ব্যারিষ্টার আবদুল হক সাহেবকেও দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ইংরেজী বাংলায় বিরামহীন ভাবে আলোচনা করছেন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। আলোচনার সার কথা বিপ্লবী রাজনীতির নানান দিক। কখনও দেখতাম ছাত্র ইউনিয়নের নেতা রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে জাহাঙ্গীর। মোহাম্মদ

তোয়াহার সঙ্গে বেশী কথা বলার সাহস না পেলেও—সুযোগ মতো টুকটাক কিছু একটা জিজ্ঞেস করার এতটুকু সুযোগকেও সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেনি জাহাঙ্গীর। কিন্তু তার জবাব বেশীর ভাগই সে পায়নি। লক্ষ্য করতাম কারো ধমক খেয়েও, কিম্বা বিরূপ সমালচনা করলেও ও রেগে যেতো না। বরং হেসে হেসে তার সঙ্গে সেই মুহূর্তেই সম্পর্ক স্বাভাবিক করে ফেলতো। ১৯৬৯-এর পূর্ববাঙলার গণবিস্ফোরনের সময় জাহাঙ্গীর খুবই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। ওকে জনসভায়, মিছিলে, ঘরোয়া মিটিং-এ, সর্বত্রই দেখা যেতো। কখনো মিছিলের সামনে শূণ্যে হাত তুলে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' স্লোগানে উত্তেজিত, কখনো জনসভার চারিদিকে ঘুরছে বোঁ বোঁ করে, কখনো ঘরোয়া মিটিঙে এটা ওটা বলছে, জিজ্ঞেস করছে।

ভাসানী গ্রুপের ঢাকা শহরের একজন সংগ্রামী সংগঠক কমরেড আবুল হোসেন একদিন আমাকে বললেন, 'জাহাঙ্গীর সম্পর্কে সাবধান, ও সি, আই, এ'র এজেন্ট।'

শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিলো—এই জন্যে যে, তাহলে আমার দীর্ঘদিনের সন্দেহটা অমূলক নয়? একদিন আমিও কথায় কথায় মোহাম্মদ তোয়াহাকে বলেছিলাম, ছেলেটিকে তো আপনি চেনেন তোয়াহা ভাই, কি মনে হয় ওকে?

মোহাম্মদ তোয়াহা জবাবে বলেছিলেন, 'নট আন্‌লাইকলী, আমেরিকা আমাদের দেশের ছেলেদেরকে ডি'মরালাইজ্‌ড্ করার জন্যে এখন খুবই সক্রিয়। বি কেয়ার ফুল।'

জাহাঙ্গীর সম্পর্কে আরো অনেকের কাছেই আমি চাপা কথাবার্তা শুনেছি। অনেকেই সাবধান করেছে, ওর সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা করবেন না। অনেকে বিরূপ মন্তব্য করছেন। বলেছেন—আজকাল আপনারা সর্বত্র ভূত দেখার মতো সি, আই, এ'র এজেন্ট দেখতে শুরু করেছেন। একটা ভাল সংগ্রামী ছেলেকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছেন। এটা নাকি এক ধরনের সংশোধনবাদ। অবশ্য এ নিয়ে তর্কে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। কেননা প্রমান ছাড়া কারো বিরুদ্ধে এই ধরনের উক্তি করাটা নিশ্চয়ই কুৎসা। যদিও কেউ কোনদিনই জাহাঙ্গীরের মুখের সামনে কোনো কথা বলেনি। কিন্তু অনেককেই দেখেছি জাহাঙ্গীরকে দেখা মাত্রই আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে য়েছে। ১৯৬৯-এর শেষ পর্যায়ে জাহাঙ্গীরকে কেমন ম্লান মনে হতো।

কেমন উদ্‌ভ্রান্ত. হাব-ভাব। চলাফেরাতেও কেমন নিস্প্রভতা। ঠিক যেন আগের মতো উচ্ছল নয়। অতটা উজ্জলতাও নেই চোখের দৃষ্টিতে। হঠাৎ একদিন শুনলাম জাহাঙ্গীর মারা গেছে। শুনে চমকে উঠেছিলাম।

কেমন একটা খট্‌কা লেগেছিল, জাহাঙ্গীর মারা গেছে, নাকি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে? ধ্রুব নক্ষত্রের মতো একটা অবিচল ধারণা হয়েছিল আমার, না, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

ক্রমে ঘটনার যবনিকা উঠতে লাগল। হ্যাঁ, আমার ধারণা মিথ্যে নয়, জাহাঙ্গীর খুন হয়েছে। তাকে খুন করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের মায়ের ভাষ্য— মৃত্যুর দিন দু'জন আমেরিকান অল্প বয়েসী ছোকরা তাদের বাসায় এসেছিল সকালের দিকে। তারা অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কি সব ব্যাপারে আলোচনা করেছে, তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু জানা যায়নি, তবে মাঝে মাঝে কেমন উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেছে উভয় পক্ষেরই। জাহাঙ্গীরের মা এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি। ঘামাবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। কারণ জাহাঙ্গীরের অনেক আমেরিকান বন্ধু, ওর স্কুলেরই নাকি তারা, প্রায়ই আসতো জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। কখনো জাহাঙ্গীরকে খুঁজতেও। ওদের সঙ্গে অনেকদিনই বাইরে বেড়াতে গেছে জাহাঙ্গীর। মাঝে মাঝে অনেক রাত করেও ফিরতো বাড়িতে। কিন্তু এ নিয়ে কোনদিনই মা অথবা বাবা কেউই জাহাঙ্গীরকে কিছু বলেননি। ওর ছিল স্বগৃহে অবাধ স্বাধীনতা। যখন যা খুশী তাই করত। যেখানে খুশী সেখানে যেতো। ঘটনার দিনও দু'জন আমেরিকান অল্পবয়েসী 'বন্ধু'র সঙ্গে জাহাঙ্গীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মাকে কিছুই বলে যায় নি।

পরবর্তী পর্যায়ে হাসপাতালে পাওয়া যায় জাহাঙ্গীরকে। জ্ঞান হারানোর আগে জাহাঙ্গীর তার বুক দেখিয়ে সম্ভবতঃ জ্বলে পুড়ে যাওয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছিল। ফুপ্‌রি উঠছিল ওর মুখ দিয়ে। মৃত্যুর পূর্বমূহুর্তে একটিমাত্র শব্দই শুধু উচ্চারণ করতে পেরেছিল জাহাঙ্গীর। শব্দটি হলো 'সরবৎ'। এ থেকেই অনুমান করা যায়, ওই আমেরিকান 'বন্ধু'দের সঙ্গে কোনো রেষ্টুরেন্ট অথবা অন্য কোথাও গিয়েছিল জাহাঙ্গীর, এবং উগ্র বিষক্রিয়াযুক্ত সরবৎ পান করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঢাকার অত বড় হাসপাতালে অত বড় বড় বিদেশী ডিগ্রীধারী ডজন ডজন ডাক্তার থাকতেও, এবং জাহাঙ্গীর বেশ কয়েকঘণ্টা বেঁচে থাকতেও—কেন তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নাই? কেন তার মুখ

থেকে কিছু শোনার চেষ্টা করা হয় নাই? কেন তাকে ভাল করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয় নাই? এর পেছনেও কি কোনো রহস্য আছে? এ ব্যাপারে তদন্ত করতে পারলে নিশ্চয়ই একটা কোনো সূত্র ধরে অনেক রহস্যের জাল আবিষ্কার করা সম্ভব হতো। আরো সম্ভব হতো এই রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে বড় বড় রুই কাতলাদের অদৃশ্য কারসাজি খুঁজে বের করা।

যাই হোক জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সুস্পষ্ট কারণ জানা গেলো আরো কিছু পরে। যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক মহলে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এবং বামপন্থী শিবিরের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে ওঠে পারস্পরিক মিথ্যে সন্দেহ।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে ওর বাবা একদিন ছেলের আলমিরা ও বাক্স ঘাটতে বসে ইংরেজীতে লেখা পৃষ্ঠা কয়েকের একটি প্যাকেট খুঁজে পেয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। হাতের লেখাটা পাকা হলেও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা 'এক্সপার্ট' ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। তবুও জাহাঙ্গীরের বাবার পক্ষে যতটুকু পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়—তাতেই তিনি সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এবং এটার পুরো ঘটনা জানার জন্যে তিনি ওই কাগজগুলো 'দৈনিক পাকিস্তান' সংবাদপত্রের বিশিষ্ট সাংবাদিক আহমদ নজীরের হাতে দেন। কিন্তু আহমদ নজীরের পক্ষেও পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ার জন্যে—ওই কাগজগুলো তিনি মোহাম্মদ তোয়াহার কাছে নিয়ে আসেন। তোয়াহা সাহেবও এই হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ পড়তে সক্ষম হননি। তবে এটাকে সি, আই, এ'র 'দলিল' বলে তিনি উল্লেখ করেন ও পরে 'এক্সপার্ট' দিয়ে এই দলিলের সঠিক বক্তব্য উদ্ধার করান।

এই 'দলিল' প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা বলার আগে, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট পৃথিবীর কোথায় যে সক্রিয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নেই, তা কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে না। সি. আই. এ. পৃথিবীর সর্বত্র তার এজেন্ট মারফত কোটি কোটি ডলার খরচ করে কমিউনিজম্ বিরোধী তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। এবং সি. আই. এ'র এজেন্ট তৈরী করার প্রচেষ্টা সেইসব স্থান থেকে যারা যে কোনো শ্রেণীর জনগণের সঙ্গে ভালো-ভাবে সম্পর্কিত, ভার্সিটির প্রফেসর, লেকচারার, সংবাদপত্রের প্রখ্যাত সাংবা-দিক ও সম্পাদক, রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা, বামপন্থী ক্ষমতাবান কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ—এবং বিশেষ করে বামপন্থী রাজনৈতিক শিবিরের

মধ্যে থেকে সি. আই. এ তার এজেন্ট তৈরী করার প্রচেষ্টা চালায়। অনেক ক্ষেত্রেই সি. আই. এ. তার এজেন্ট তৈরী করার চেষ্টায় সফল হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা সম্পর্কে অনেক রকম কথাই শোনা গেছে ; এবং এসব কথা গুজব নয়। এর পেছনে যথেষ্ট অস্তিত্ব আছে। এই তফাজ্জল হোসেনই মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত ও নিজ হাতে তোলা সাহায্য দিয়ে 'ইত্তেফাক' বের করেছিলেন। ইত্তেফাক পত্রিকার শিরোনামার নিচে বহুকাল ধরে মুদ্রিত থাকতো, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সেই ইত্তেফাক পত্রিকা বামপন্থীরা ঘাড়ে করে করে একসময় বিক্রি করেছে ও প্রচার করেছে। দরিদ্র তফাজ্জল হোসেনই তখন সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসী—সোহরাবর্দীর অন্যতম দোসর তফাজ্জল হোসেন একদিন ইত্তেফাক থেকে মুছে দিলেন মওলানা ভাসানীর নাম। তারপর ক্ষমতায় যাওয়ার পরে এর প্রকাশনা, মালিকানা সব কিছু নিজের নামে করে নিলেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন বামপন্থীদেরকে। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকার পুঁজির মালিক হলেন এককালের খদ্দর পরিহিত দরিদ্র তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা। এই লক্ষ লক্ষ টাকা কোত্থেকে এসেছে ? শুধু কি তিনটি পত্রিকার মালিক ছিলেন তফাজ্জল হোসেন ? দি ঢাকা টাইমস, ইত্তেফাক ও চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী'র ? শুধু কি নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসেরই মালিক তিনি ? না, এর বাইরেও লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা ছিলো তফাজ্জল হোসেনের। যে খবর সাধারণ লোকে জানে না, জানে না আজকের অনেক নতুন আওয়ামী লীগ কর্মীও। শুধু এক তফাজ্জল হোসেনই নয়, অনেক তফাজ্জল হোসেনের সঙ্গেই সি. আই. এ-র সম্পর্কের কথা জানা গেছে। জানা গেছে অনেক ষড়যন্ত্র আর অপকৌশলের কথা।

সি. আই. এ-র সঙ্গে একবার তার কোনো এজেন্টের মতবিরোধ ও অনিয়মানুবর্তীতার প্রশ্ন দেখা দিলে, সি. আই. এ. প্রাথমিক পর্যায়ে তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, এবং তাতে ব্যর্থ হলে—সেই এজেন্টের নাকি জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কারণ মতবিরোধ হলে, এই সংস্থার ভয় থাকে—অবাধ্য এজেন্টের দ্বারা বহু গোপন ও মারাত্মক তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার। সেই আশঙ্কাতেই অবাধ্য এজেন্টকে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে হত্যা করে ফেলে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে জাহাঙ্গীরের সঙ্গেও নাকি সি. আই. এ-র মতবিরোধ

চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এবং জাহাঙ্গীরের ঘর থেকে পাওয়া উক্ত 'দলিলটি' নাকি সি. আই. এ.-র কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিল জাহাঙ্গীর। এতে ওরা আরো ক্ষেপে যায়। কিন্তু কেন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ওদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তার সঠিক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্ততঃ আমার জানা নেই তেমন কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা।

প্রাপ্য 'দলিলটি'র মূল ষড়যন্ত্রের ও নকশার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। যার মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোপন নেতৃত্বে ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীচক্রের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা ছিল। এবং এতে জড়িত ছিল—শেখ মুজিব ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালী কিছু অফিসার এবং সৈনিক। ১৯৬৬-৬৭'র দিকে এই কমিউনিজম ও চীন বিরোধী ষড়যন্ত্র সফল হলে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে কেবল মাত্র পূর্ববাঙলার বুকেই নিবিচার কমিউনিষ্ট হত্যা সংঘটিত হতো না, তার ঢেউ এসে পশ্চিম বাঙলাতেও ছড়িয়ে পড়তো। যদিও ভারতের ফ্যাসি-বাদী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার খুবই যোগ্যতার সঙ্গে বামপন্থী হত্যা অব্যাহত রেখেছে; প্রগতিবিরোধী সমস্তরকম প্রতিক্রিয়ার পথে পা বাড়িয়েছে, এবং এখনো তাদের পোষা গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে, পুলিশ, সি. আর. পি. দিয়ে নির্লজ্জভাবে বামপন্থী ঠেঙানোর কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত গণতন্ত্র রক্ষার দোহাই দিয়ে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রকেই তারা দিন দিন জোরদার করছে। বামপন্থী ঠেঙানোর কাজে শাসক ও শোষকশ্রেণীর তথাকথিত গণতন্ত্র রক্ষার আওয়াজ খুবই চমৎকার হাতিয়ার হিসেবে সহযোগিতা করছে তাদের প্রতিক্রিয়ার হাতকেই। অথচ এখনো জনগণের মধ্যে বিরাজ করছে চরম একটা হতাশা ও বিভ্রান্তি। তেমন কোনো পরিবর্তনের প্রগতিশীল হাওয়া এখনো উত্তাল হয়ে উঠছে না, উঠবে কিনা তারও তেমন শক্তিশালী ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন।

যাই হোক, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক যে ষড়যন্ত্রের তথ্য ফাঁস হয়ে গেলো—তা থেকে আমরা পাকিস্তান তথা পূর্ববাঙলার পরবর্তী রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণগুলো আর স্বচ্ছভাবে খুঁজে বের করতে পারবো। শুধু বামপন্থী শিবিরের মধ্যে অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টি ও পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ির ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের ঘর থেকে পাওয়া ওই দলিলটি কতটা ক্ষতি করেছিল, সে সম্পর্কে এখনো অনেকের মনেই নানারকম প্রশ্ন ও সন্দেহ

আছে। এ নিয়ে তেমন কোথাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হয়নি। এখনো এই প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করেই কিছু কিছু বামপন্থীগ্রুপ তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে। তাতে বামপন্থী শিবিরের ঐক্য ও সাংগঠনিক ভিত দুর্বল না হয়েই যায় না। এই ধরণের প্রচারনা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতকেই আরো শক্তিশালী করে। যেমন তোয়াহা-ভাসানীর মধ্যে ভাঙনের ব্যাপারে এই দলিলটির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এবং তোয়াহা-ভাসানীর ভাঙন যে পূর্ববাঙলার বামপন্থী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতটা মারাত্মক ক্ষতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মওলানা ভাসানীকে কিছু হঠকারী লোকজন এই 'দলিল' প্রসঙ্গে ভুল বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। এবং সেই হঠকারীদের 'বালকসুলভ' মেজাজকে খুশী করার জন্যেই মওলানা ভাসানীর মতো নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা সম্পর্কে খুবই কুৎসিত কথা উচ্চারণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা কি ছিল?

জাহাঙ্গীরের বাবার কাছ থেকে 'দলিল' পাওয়ার পরে সেটা মোহাম্মদ তোয়াহার কাছে হস্তান্তর করেছিলেন সাংবাদিক আহমেদ নজীর। মোহাম্মদ তোয়াহা এই 'দলিলে'র বক্তব্য নিয়ে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনা করেন বিশদভাবে। এবং মওলানা সাহেবকে 'দলিল'টি দেখান। মওলানা সাহেব সুগভীর চিন্তা ভাবনা ছাড়াই মোহাম্মদ তোয়াহাকে এই 'দলিল'টি সাধারণ্যে প্রকাশ করে দেয়ার কথা বললে, মোহাম্মদ তোয়াহা ওই সময় আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের অপ্রতিহত জনপ্রিয়তা ও উগ্রজাতীয়তাবাদের মুখে, পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার মার্কিনী এই ষড়যন্ত্রের 'দলিল' প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তার কারণ পূর্ববাঙলায়—পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী. একটা বিদ্বেষ তখন আওয়ামী লীগের 'জয় বাঙলা' শ্লোগানের মধ্যে মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে 'পূর্ব বাঙলা বিচ্ছিন্ন' করার 'দলিল' প্রচার করলে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং আওয়ামী লীগের প্রচারনায় মনে করতে পারতো যে আমেরিকা ও ভারত তাঁদের বন্ধু; এবং বন্ধু হিসেবেই ওই দুই দেশ তাঁদের (জনগণের) মুক্তির জন্যে সঠিক একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। এতে বামপন্থী রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতো, সামনে এসে দাঁড়াতো প্রচণ্ড রকমের বাধা। শক্তিশালী হতো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের ষড়যন্ত্রের হাত। মোহাম্মদ তোয়াহা পরামর্শ দেন—এটা আরো পরে প্রচার

করতে, যখন আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব তাদের ফ্যাসিবাদী গণবিরোধী ভূমিকার জন্যে জনগণের কাছে অনেকখানি নিন্দাই হয়ে উঠবে, সেই অবস্থায় এই 'দলিল' প্রচার করলে ওরা জনগণ থেকে খুব তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এই যুক্তি মওলানা সাহেব 'প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য প্রত্যাখ্যান করানোর ব্যাপারে 'কিছু বালক সুলভ মেজাজী' মওলানা সাহেবের কানে ইন্ধন যোগায়। ইন্ধন যোগানোর কারণ হলো, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক 'ঘোষিত নির্বাচনে' ন্যাপের অংশ গ্রহণ করা—না করার প্রশ্ন নিয়ে ন্যাপের মধ্যে ক্রমশই বিতর্কের যে ঝড় সৃষ্টি হচ্ছিলো, মোহাম্মদ তোয়াহা, ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ সায়েদুল হাসান, শান্তি সেন, আবদুল হক প্রমুখ নির্বাচনের বিরোধীতা করে, ন্যাপকে শ্রেণী সংগ্রামের সহায়ক সংগঠন হিসেবে আরো কিছুটা এগিয়ে আনতে চাইলেন। কিন্তু হাজী দানেশ, নূরুল হুদা, কাদের বক্স ও বিপ্লবী আবদুল মতিন-আলাউদ্দীন সাহেবরা নির্বাচনের এই সব মতামত নিয়ে মওলানা সাহেবকে বিভ্রান্ত করতে থাকেন। যার ফলে মোহাম্মদ তোয়াহার 'যুক্তি'কে অগ্রাহ্য করেন মওলানা ভাসানী। এবং সি. আই. এ-র উক্ত 'দলিলটি' প্রকাশ করার জন্যে চাপ দেন।

যেহেতু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি হিসেবে পার্টির সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহাকে নির্দেশ দানের ক্ষমতা মওলানা সাহেবের ছিলো। সেই ক্ষমতার দিকে তাকিয়েই মওলানা ভাসানী যুক্তি-তর্ক না মেনে চরম একটা ভুল করে বসলেন। মোহাম্মদ তোয়াহা এই 'চাপ' এর কাছে নতি স্বীকার করতে পারেন নি এই জন্যে যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, মার্কসবাদী, লেনিনবাদীর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা। পার্টির সিদ্ধান্ত ছাড়া তিনি যে কোনো হঠকারীতা থেকে নিশ্চয়ই পার্টি ও তার রাজনীতিকে অবশ্যই রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন। অবশ্য ওই 'দলিল' প্রকাশ করার পথে সব চাইতে বড়ো বাধা ছিলো উপযুক্ত প্রমাণের অভাব। কেউ আইনগত চ্যালেঞ্জ করলে হাতে লেখা ওই 'দলিলে'র খসড়া ছাড়া আর কিছুই তখন উপস্থিত করার ছিলো না। যদিও সুনিশ্চিত যে, ওই 'দলিল' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই হাতে গড়া। যাই হোক মোহাম্মদ তোয়াহা মওলানা সাহেবকেই অনুরোধ করেন সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে এই দলিল প্রকাশ করার জন্যে। কিন্তু মওলানা ভাসানী নিজে সেই দায়িত্ব ও 'ঝুঁকি' নিতে রাজি হলেন না, মোহাম্মদ তোয়াহার উপরেই ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

১৯৫৭ সনের পর থেকে মওলানা ভাসানী সব সময়েই 'কৃষক সমিতি' ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে যে সব নীতি নির্দ্ধারনী বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছেন, তার সবই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তের সংগে সঙ্গতি রেখেই করেছেন। এটা করেছেন তিনি তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার জন্যেই। এই সি. আই. এ.-র 'দলিল'এর ব্যাপারেও তিনি তাই করতেন, কিন্তু ওই সময় পূর্ব পাকিস্তান সি. পি. এম. এল-এর সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য উপস্থাপনা এবং 'গ্রুপ', সৃষ্টি করার অভিযোগে কিছু ব্যক্তিকে পার্টি থেকে বহিস্কার করা হলে, ওই বহিস্কৃত ব্যক্তিরা সবাই (যদিও ক্যারিয়ারিষ্ট ওই ব্যক্তিরাও পৃথক পৃথক মত পোষণ করতেন) মূল পার্টির বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হন এবং মোহাম্মদ তোয়াহার বিরুদ্ধে একযোগে মওলানা ভাসানীকে বিভ্রান্ত করার কাজে পর্যায়ক্রমে সাফল্য লাভ করেন। মওলানা ভাসানী হঠাৎ করে উক্ত সি. আই. এ-র 'দলিল' সাধারণ্যে প্রকাশ করার জন্যে প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। তখন উপায়ান্তর না দেখে মোহাম্মদ তোয়াহা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে মওলানা ভাসানীকে স্বয়ং এই 'দলিল' প্রকাশ করতে বলেন। ইংরেজী এই বিবৃতিতে 'said to be a C. I. A. Dacu-ment, -এর স্থলে বাঙালী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হামিদুল হক চৌধুরীর কাগজ 'পাকিস্তান অবজারভার' কৌশল করে বামপন্থী শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্র করার জন্যে 'So called C. I. A. Dacument' হিসেবে তোয়াহার বিবৃতিটি ফলাও করে প্রকাশ করে। পাকিস্তান অবজারভার'এর এই অপপ্রয়াস পুরোপুরি কাজে লেগে যায়। 'সি. আই. এ'র উক্ত 'দলিল'টিকে তোয়াহা 'তথাকথিত দলিল' বলেছেন, এই মিথ্যে কুৎসা প্রচারের কাজে 'পার্টি বহিস্কৃত ব্যক্তিরা' আদাজল খেয়ে লেগে যান। অবশ্য তোয়াহা পাকিস্তান অবজারভারের এই পুকুর চুরির ব্যাপারে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু প্রতিক্রিয়া-শীলদের এজেন্টরা সেই বিবৃতিটি না ছেপে চেপে দেয়। আর এই বিবৃতিকে 'হাতিয়ার' হিসেবে বেছে নেন পার্টি বহিস্কৃত ব্যক্তিরা। তারা মওলানা ভাসানীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁকে (ভাসানীকে) প্রকাশ্যে পাকিস্তান অবজারভারে ওই বিবৃতি দিয়ে অপমান করেছেন। এতে মওলানা ভাসানী চটে যান। তিনি মনে করেন যে, সি. আই. এ'র উক্ত 'দলিল'টিকে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিতে বলায়,

তোয়াহা ওই ‘দলিল’কে ‘তথাকথিত দলিল’ হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর মর্যাদা-হানি করেছেন। চিরকালই মওলানা সাহেব একটু গরম প্রকৃতির মানুষ, তিনি মোহাম্মদ তোয়াহার কোনো ব্যাখ্যাই আর গ্রাহ্য করলেন না। পাল্টা বিবৃতি দিলেন তোয়াহার বিরুদ্ধে। আর মওলানা সাহেবকে বিভ্রান্ত করে, ‘তোয়াহা বিরোধীরা’ মোহাম্মদ তোয়াহার মতোন একজন নির্যাতীত দেশ-প্রেমিক কমিউনিষ্ট নেতাকে ‘সি. আই. এ’র এজেণ্ট বলে প্রচার করতে লাগলেন যত্রতত্র। ফলে পূর্ব পাকিস্তান সি. পি. এম এল-এর সঙ্গে মওলানা ভাসানী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দ্বন্দ্ব ক্রমশই জটিল হয়ে উঠতে থাকে। সব চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা হলো—ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তান সি. পি. এম. এল-এর প্রকাশ্য মুখপত্র ‘সাপ্তাহিক গণশক্তি’ পত্রিকার মতোন আপোসহীন অগ্নিমুখ মুখপত্রকেও পার্টি বহিষ্কৃতরা ‘সি. আই. এ-র মুখপত্র বলে প্রচার চালায়। অর্থাৎ সি. আই. এ-র ওই ‘দলিল’টি ইচ্ছে করে মোহাম্মদ তোয়াহা চেপে দিয়ে—‘সি. আই. এ-র কাছে ওটা ছয় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে, ওই টাকা দিয়েই ‘গণশক্তি’ প্রকাশ করেছেন তিনি!

অদ্ভুত প্রচারনা! ‘গণশক্তি’ যারা একটি সংখ্যাও পড়েছেন, এবং ‘গণশক্তি’র সঙ্গে যাদের সামান্যতম পরিচয়ও রয়েছে—এই কুৎসার জবাব তাঁরাই ভালোভাবে দিয়েছেন ও দেবেন ভবিষ্যতেও। এই প্রসঙ্গেই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি, আমেরিকার সি. আই. এ’ ও ভারতের ‘র‍্যাড’ এর যৌথ ষড়যন্ত্রের বর্তমান ফসল ‘বাঙলা দেশ’ প্রতিষ্ঠার পরে—‘গণশক্তি’ প্রচণ্ডতমভাবে দেশীয় শোষকশ্রেণী ও তাদের আন্তর্জাতিক দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়া শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু’র ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাদের দ্বারা রাত্রির দ্বিপ্রহরে হঠাৎ করে একদিন আক্রান্ত হয়ে বিধ্বস্ত হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় ‘গণশক্তি’র প্রকাশনা। আর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাবীবুর রহমানকে আদালতে হাজির হতে বলা হয়। শুধু কি তাই; ‘বঙ্গবন্ধু’র পুলিশ, গুণ্ডারা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় মোহাম্মদ তোয়াহার স্ত্রী ও কন্যাকে। নির্যাতন করা হয় তাঁদের উপরে। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। উল্লেখযোগ্য যে, মোহাম্মদ তোয়াহার কন্যার জামাতা—পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। সদ্য স্বামীহারা বিধবা বধূকে ‘বঙ্গবন্ধু’র ‘আইন’ সত্যিই যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছে। এ থেকেই কি

প্রমাণিত হয় না—'গণশক্তি' কাদের টাকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল?

এসব কথা লেখার উদ্দেশ্য আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সি.আই.এ. দেশে দেশে বামপন্থী শিবিরের মধ্যে কি চরম ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে পারে ও সংগঠন প্রায় ভেঙে ফেলার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে—এই 'দলিল'টিই তার জলন্ত স্বাক্ষর। এজন্যেই বামপন্থীদেরকে আরো অনেক বেশী সতর্ক ও হঠকারীতা-মূলক বক্তব্য থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় যত্নবান হওয়া উচিত। একটা প্রবণতা বামপন্থী শিবিরের মধ্যে দেখা গেছে পৃথক সংগঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধ সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে—তার রাজনীতিগত জবাব ও সমালোচনা না করে অপপ্রচার চালানো হয়, ওরা সি. আই. এ'র এজেন্ট। এই প্রবণতা খুবই জঘন্য ও মারাত্মক। এতে বামপন্থী ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হতে বাধ্য। ফলে ভবিষ্যতের বৃহত্তর সংগ্রামী ঐক্য সৃষ্টির পরম প্রয়োজনীয়তা গড়ে ওঠার পথ সুগম থাকে না। আর 'বামপন্থী অনৈক্য' প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতকেই তখন আরো বেশী শক্তিশালী করে।

১৯৭০ সনের ২০শে জানুয়ারী মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল মহকুমার সন্তোষ রাজবাড়ি ময়দানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলনে—সি. আই. এ'র উক্ত 'দলিল'টির ব্যাপারে সরাসরি মোহাম্মদ তোয়াহাকে সি. আই. এ'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মারাত্মক ও অসত্যি অভিযোগ উত্থাপন করেন। অভিযোগে তিনি বলেন, 'তোয়াহাকে আমি সি. আই. এ'র 'দলিল'টি প্রকাশ করতে বলেছিলাম। কিন্তু তোয়াহা আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে সি. আই. এ'র 'দলিল'টি চেপে দিয়েছে। এবং ওই 'দলিল'টিকে ভিত্তিহীন বলেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে সে (তোয়াহা) সি. আই. এ'র সঙ্গে জড়িত। এই জন্যেই কৃষক সমিতির সম্পাদক আবদুল হক এবং তোয়াহারা কেউই এই সম্মেলনে উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু ঘটনা কি ছিলো? কেন মোহাম্মদ তোয়াহা ও কৃষক সমিতির সম্পাদক আবদুল হক ও পূর্ব-পাকিস্তান সি. পি. এম. এল. এ'র কমরেডরা ওই কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি? এর যথাযথ ব্যাখ্যা আমি নিশ্চয়ই তুলে ধরবো। তার আগে বলে রাখছি—মওলানা ভাসানী যখন সি. আই. এ'র 'দলিল'-এর প্রসঙ্গে বক্তৃতা করছিলেন—ঠিক সেই মুহূর্তে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতামঞ্চের পেছনে কয়েক হাজার সাইক্লোষ্টাইল করা সি. আই. এ'র 'দলিল'টির অনুলিপি করা কপি নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী

পার্টির কোষাধ্যক্ষ সায়েদুল হাসান সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে মোহাম্মদ তোয়াহাই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধী গ্রুপের মধ্যে একাকী অসহায় সায়েদুল হাসান বারবার মওলানা সাহেবকে উক্ত সাইক্লোষ্টাইল করা কপি-গুলির কথা বলা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নি। ধমক দিয়ে তিনি চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন সায়েদুল হাসানকে। আর 'তোয়াহা বিরোধীদের' নির্লজ্জ টিট্‌কারী ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শিরোধার্য করে—সাইক্লোষ্টাইল করা কপিগুলো নিয়ে সম্মেলন থেকে ফিরে এসেছিলেন সায়েদুল হাসান। আর কৃষক সম্মেলনের সমবেত জনতা ফিরে গিয়েছিল তোয়াহা সম্পর্কে দ্বিধা ও সন্দেহ নিয়ে। যদিও পরবর্তীতে এই সন্দেহ ও দ্বিধা দূরীভূত হয়েছিল। তবুও তোয়াহাকে সি. আই. এ'র এজেন্ট বানানোর এই অপপ্রয়াসে পূর্ববাঙলায় কাদের হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন মার্কসবাদী'র দাবীদার, পার্টি বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা ? মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তোয়াহার বিরোধ সৃষ্টি করে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে ব্যাপক ভাঙন সৃষ্টি করে—কোন্ প্রগতির ভিত্তি গড়েছিলেন 'তোয়াহা বিরোধীরা ?' নাকি তারা তোয়াহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে সি. আই. এ. ও প্রতিক্রিয়ার অন্যান্য হাতগুলোকেই শক্তিশালী করার জন্যে এই ধরণের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ?

সন্তোষের কৃষক-সম্মেলনে তোয়াহা এবং আবদুল হক প্রমুখরা অংশ গ্রহণ করেন নি বলেই যে তারা সি. আই. এ'র এজেন্ট এই তত্ত্বই বা 'মার্কসবাদীরা' কোন্ যুক্তিতে উপস্থিত করেছিলেন সেদিন ? ঘটনা কি তাই ছিলো ? কোল্‌কাতা থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। বইটির লেখক জনৈক রফিকুল হাসান। বইটির নাম 'মুক্তির সংগ্রামে পূর্ববাঙলা।' এই বই সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার প্রবৃত্তি আমার আদৌ ছিল না। আমি জানি না কে এই রফিকুল হাসান। পূর্ববাঙলার বামপন্থী রাজনীতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি যে সব মনগড়া জঘন্য কুৎসা ও বানোয়াট ঘটনার অবতারণা করেছেন—তাতে পশ্চিমবাঙলার প্রগতিশীলদের মধ্যে পূর্ববাঙলার বামপন্থী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও তার সংগঠন এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে চরম একটা বিভ্রান্তি ও বাজে অসত্যি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু এই বইটির সবগুলো অধ্যায়ই কোল্‌কাতার সাপ্তাহিক 'দর্পণ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সনে। ওই

সময় পূর্ববাঙলায় যুদ্ধ-বিগ্রহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। ফলে পশ্চিমবাঙলায় বসে কলম দিয়ে যা আসে—তাই লিখে এপার বাঙলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক মহল বুদ্ধিজীবিদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল। সন্তোষের কৃষক সম্মেলনে মোহাম্মদ তোয়াহাকে সি. আই. এ'র এজেন্ট বলায়—রফিকুল হাসান খুবই উল্লসিত ও ভাসানীর ওই বক্তব্যকে সমর্থন করে তার বইতে ফিরিস্তি দিয়েছেন। যদিও মোহাম্মদ তোয়াহা, ও আবদুল হক ওই সম্মেলনের সফলতার জন্যে তাঁদের সামর্থানুসারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং ২০শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে বেলা তিনটেয় জনসভা থাকার দরুণ তাঁরা সন্তোষে উপস্থিত থাকতে পারেন নি ও ২০শে জানুয়ারী সমগ্র ঢাকা শহরে কিসের জন্যে সাফল্যজনক হরতাল পালিত হয়েছিল; ২০শে জানুয়ারীর কি গুরুত্ব ছিল, রফিকুল হাসান এসব কিছুই তার বইতে লেখেন নি। আমি ২০শে জানুয়ারী সম্পর্কে ও সন্তোষের সম্মেলনে তোয়াহা-আবদুল হকের অনুপস্থিতির সামগ্রিক ঘটনাসমূহ সংক্ষেপে ব্যক্ত করার আগে রফিকুল হাসানের মূঢ়তার দৃষ্টান্ত স্থাপনের কিছুটা অংশ নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। তাহলে পশ্চিমবাঙলার বামপন্থী রাজনৈতিক মহল ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যে, সামান্য পরিমাণ বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা হয়েছে এই বই পড়ে, তাঁরা (পাঠকরা) তা থেকে অব্যাহতি পাবেন। এবং ভবিষ্যতে যেন পশ্চিমবাঙলার বামপন্থী রাজনৈতিক মহল ও বুদ্ধিজীবিরা এই ধরণের বইপত্র পড়ে ভুল ধারণা পোষণ না করেন; সেদিক থেকেও আমার আলোচনা করার রয়েছে।

'পূর্ববাঙলার বামপন্থী রাজনীতি: ভাসানী-তোয়াহা সম্পর্কের ইতিকথা' শীর্ষক অধ্যায়ে (২২ পৃঃ দ্রঃ) রফিকুল হাসান লিখেছেন—"আয়ুব সরকারের এই চীন ঘেঁষা নীতিকে ভাসানী গ্রুপে অবস্থানরত চীনপন্থী পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, বদরুদ্দীন উমর, আহসাব উদ্দীন, নজরুল ইসলাম ও ইন্দুসাহা প্রমুখ নেতৃবর্গ প্রগতিশীল আখ্যা দেন এবং প্রতিকর্মে এ সরকারকে তাঁরা সমর্থন জানাতে থাকেন।"

রফিকুল হাসান বামপন্থী রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে যে কুৎসার আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই বইতেই নিজেকে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান সি. পি. এম. এল-এর এক সময়ের কর্মী বলে ও 'মার্কসবাদী' বলে দাবী করেছেন, তার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে এই বানোয়াট তথ্য থেকেই একথা প্রমাণ করে—

পূর্ববাঙলার বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা তার পক্ষে কত বড় আহাম্মকী ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক। ব্যক্তিগতভাবে আমার (ইন্দুসাহা) নামটি এতে দেখে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি। রফিকুল হাসান আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা বানিয়ে দিয়েছেন, এতে আমার খুশী হওয়ারই কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ার সুযোগ বা যোগ্যতা আমার ছিল না। সম্ভবতঃ আমাকে সংবাদপত্রে সরাসরি লিখতে দেখে ও সাংগঠনিক কাজে অনেক জায়গায় বিদ্রোহী দেখে, রফিকুল হাসান ধারণা করেছেন আমি কেন্দ্রীয় কমিটির। উল্লেখিত নামগুলির মধ্যে আমি কারো যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতা রাখি না; কিন্তু বদরুদ্দীন উমর সাহেবও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নন। তিনি সাপ্তাহিক 'গণশক্তি'র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। অধ্যাপক আহসাব উদ্দীনও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন না। নিঃসন্দেহে তিনি নেতৃস্থানীয়। আশ্চর্য বিষয়, কেন্দ্রীয় কমিটির কমরেডদের পরিচয় না জেনে রফিকুল হাসান কি করে এই সব মিথ্যে তথ্য হাজির করতে পেরেছেন? এটা কোন্ 'মার্কসীয় দর্শন'?

আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, আয়ুব সরকারের পুলিশের অত্যাচারে আমি রক্তাক্ত হয়েছিলাম ও জ্ঞানহীন ছিলাম, যে আয়ুবের কারা-প্রাচীর আমাকে দুঃস্বপ্নের জগতে ঠেলে দিয়েছিলো, যে আয়ুবের মুসলীম লীগের গুণ্ডারা, তার পুলিশ বাহিনী ও আওয়ামী লীগের লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে ১৯৬৯ সনের একুশে ফেব্রুয়ারীর মহান শহীদ দিবসে সিরাজগঞ্জে প্রকাশ্য দিবালোকে আমার বাড়ির উপরে আক্রমণ চালিয়ে, অবাধে লুটতরাজ করে, আমার বৃদ্ধ মায়ের ও বোনের উপরে নির্যাতন চালিয়েছিল, সে কথা কি রফিকুল হাসান জানতেন না? জানতেন না ১৯৬৮ সনের ৩০শে ডিসেম্বর সারারাত ধরে আমার উপরে আয়ুবের পুলিশ বাহিনীর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের ঘটনা? পূর্ববাঙলার অধিকাংশ কাগজেই তো সেই ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিলো। ঢাকায় স্ট্রীট কর্ণার মিটিং হয়েছিলো, এবং তিনি কি ১৯৬৮তে টাঙ্গাইলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে আমার আয়ুব বিরোধী বক্তব্য শোনেন নি? যে বক্তব্য নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছিলো? এছাড়া আমার প্রকাশিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ সমূহের কোথায় আমি আয়ুবকে সমর্থন করেছি—রফিকুল হাসান যদি

তা দেখাতে পারতেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদাহ হতেন আমার কাছে। কিম্বা বদরুদ্দীন উমরের কোন্ লেখায় তিনি আয়ুবকে সমর্থন করেছেন, তারও প্রমান তিনি দিতে পারতেন। কিম্বা মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হকের রাজনৈতিক জীবন ও তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা সম্পর্কে, তাদের জনগণের জন্যে নির্যাতন ও বাধার প্রাচীর অতিক্রম করার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, তাঁদের সুদীর্ঘ আট বৎসরাধিক কাল 'পলাতক জীবন' যাপনের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে রফিকুল হাসান কতটুকু জানেন? কতটুকু জানেন তিনি বামপন্থী রাজনীতির ধারাবাহিক তত্ত্ব ও তথ্য? কোনোদিনই পূর্বপাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী, লেনিনবাদী, আয়ুব খানকে প্রগতিশীল বলে নি। কিন্তু দ্রুত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর থেকে, পাকিস্তানের উপরে তার অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে হাল্কা করার জন্যে—(যদিও আয়ুব খান মার্কিনী সেবাদাস) আয়ুব সরকারের (বাধ্য হয়ে) চীনঘেষা নীতিকে ওই সময়ের জন্যে (কৌশলগত কারণেই) অভিনন্দন জানিয়েছিলো। এই অভিনন্দন আয়ুব খানকে জানানো হয় নি; জানানো হয়েছিল মহান চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের জনগণের বন্ধুত্ব ও মৈত্রী স্থাপনের পদক্ষেপকে। রফিকুল হাসান ভাসানী তোয়াহা সম্পর্কের ইতিকথা বলতে গিয়ে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভাসানীই আয়ুব খানকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন এবং মোহাম্মদ তোয়াহাই আয়ুব খানকে প্রগতিশীল আখ্যায়িত করে ভাসানীর সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত করেন। কিন্তু ইতিহাস কি বলে? মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সময়েই—গণচীন সফর করে আসেন। এই সফরের পেছনে আয়ুবের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। এটা মওলানা ভাসানী সম্পর্কে কুৎসা রটনা নয়। এটা ঐতিহাসিক সত্য। ভাসানী তোয়াহা মতবিরোধের অন্যতম কারণ হলো—সাম্প্রদায়িকতা। বলা যায় 'রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা'। মওলানা ভাসানীর 'ইসলামিক সমাজতন্ত্র' ও মোহাম্মদ তোয়াহার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে'র বিরোধই হলো মূল বিরোধ। পরবর্তীতে সি. আই. এ'র 'দলিল' নিয়ে এই বিরোধ চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। অথচ পশ্চিম বাঙলার প্রগতিশীল মহলকে রফিকুল হাসান মিথ্যে তথ্য হাজির করে বিভ্রান্ত করেছিল ভালো ভাবেই।

তিনি পূর্বপাকিস্তান সি. পি. এম. এল. এর বিরুদ্ধে আজগুবি তথ্য দিতে গিয়ে (কোথাও কোথাও বিশ্বাসঘাতক বলেছেন) বলেছেন যে, অন্যায়ভাবে

তোয়াহা সাহেবরা পাবনার বিপ্লবী নেতা আবদুল মতিন, আলাউদ্দীন আহম্মদ চট্টগ্রামের আবুল বাশার, দেবেন শিকদার প্রমুখকে বহিষ্কার করেছেন নিজেদের গণবিরোধী প্রতিবিপ্লবী লাইনকে শক্তিশালী করার জন্যে কিন্তু রফিকুল হাসান কি জানেন না যে, কমিউনিষ্ট পার্টিতে আভ্যন্তরীন মতবিরোধ, দুই লাইনের দ্বন্দ্ব থাকাটা স্বাভাবিক, এবং সেই দ্বন্দ্ব এবং মতবিরোধের লাইন নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তা প্রাদেশিক ও জেলা কমিটিতে আলোচনার জন্যে প্রেরিত হয়ে থাকে, প্রত্যেক সদস্য এমন কি গ্রুপ সদস্যরাও লিখিতভাবে তাঁদের মতামত জানাতে পারে—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তার পক্ষে-বিপক্ষে, কিম্বা সাধারণ্যে পাল্টা বক্তব্য ছাপিয়ে প্রকাশ করার প্রবনতা হলো পার্টির অভ্যন্তরে দুই লাইনের দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে—পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবনতা। যা পার্টিতে ফ্যাকশন সৃষ্টির মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সমালোচনা করা হয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। এটাই কমিউনিষ্ট পার্টির নিয়ম পদ্ধতি। অর্থাৎ 'ঐক্য সমালোচনা ঐক্য'। কিন্তু পাবনার বিপ্লবী মতিন-আলাউদ্দীন সাহেবরা কি করেছিলেন? পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে থাকাকালীন অবস্থায় মতিন সাহেবরা 'জাতীয় অর্থনৈতিক চরিত্র ধনতান্ত্রিক' শিরোনামে একটি পালটা অযৌক্তিক অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বক্তব্য সম্বলিত বই বের করেন স্বনামে। ফলে পার্টির নির্দ্ধারীত (যা পরে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়ে মতিন সাহেবরাও স্বীকার করেছিলেন) 'আধা সামন্তবাদী আধা ঔপনিবেশিক' শোষণ ও নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চরিত্রের বিশ্লেষণকে মতিন-আলাউদ্দীন সাহেবরা অস্বীকার করেন। এতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদেরকে 'আইন শৃঙ্খলা' ভঙ্গ করার দায়ে গঠনমূলক সমালোচনা করেন ও তাদেরকে দোষ স্বীকার করে পার্টিতে টিকে থাকার সুযোগ দেন। কিন্তু এর পরেও মতিন-আলাউদ্দীন সাহেবরা পার্টির অভ্যন্তরে 'উপদল' সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। এই সময় চট্টগ্রাম থেকে দেবেন শিকাদার সমর্থিত আবুল বাশারও 'অগ্নিগর্ভ' নামে মতিন সাহেবদের ওই একই ভুল ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যপুষ্ট একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে মতিন সাহেবদেরও সমর্থন ছিল। বার বার পার্টিকে সাধারণ্য হেয় করা ও নিয়ম শৃঙ্খলাকে পদদলিত করা, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে সংখ্যালঘিষ্ঠের মেনে না নেয়ার নীতি, পার্টিতে উপদল, সৃষ্টি করার মতো মারাত্মক প্রচেষ্টা সত্বেও পার্টি এদেরকে

সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দিতে থাকে বিভিন্ন গঠনমূলক সমালোচনা করে মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সে তুঙ চিন্তাধারার আলোকে শিক্ষা দেয়ার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নজীর সৃষ্টির পরেও—যখন মতিন, আলাউদ্দীন, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, অনল সেনরা বারবার পার্টি বিরোধী কার্য অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন তখন কেন্দ্রীয় কমিটি বাধ্য হয়েই পার্টির সংগঠনকে ও শ্রমিক শ্রেণীর সুস্থ আন্তর্জাতিকতার লাইনকে রক্ষা করার জন্যে—এদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেয়। রফিকুল হাসান কি এই ইতিহাস জানতেন না? জানলেও তিনি হয়তো নিজেদের সঙ্কীর্ণতাবাদ, সুবিধাবাদ ও ইউরোপীয়ান চিন্তাধারাকে আঁকড়ে ধরে, তাকে রক্ষা করার জন্যেই পূর্বপাকিস্তান সি. পি. এম. এল-এর মতো অত বড়ো শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যে কুৎসার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সঠিক রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে কখনো টিকে থাকা যায় না, টিকে থাকতে হলে ভুল রাজনীতির বিরুদ্ধে সঠিক রাজনীতি নিয়ে লড়াই চালাতে হয়। রফিকুল হাসানের সমর্থিত মতিন সাহেবরা এই ঐতিহাসিক ধারার বিরুদ্ধেই তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে তাদের গতি অবরুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং রফিকুল হাসান তার কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বইতে ভাসানী-তোয়াহার মতবিরোধ ও বামপন্থী কতিপয় নেতার পার্টি থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে যে সব আজগুবি তথ্য হাজির করে 'লেখক' হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করেছেন; তা কেবল অসত্যিই নয়, আজগুবিই নয়, এর পেছনে কোনো অসৎ কারসাজি আছে কি না এ সম্পর্কে ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাই বলছি, 'সাধু সাবধান।'

দশ

ঘটনাগুলো যেন 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চেপে বসার মতন। সি. আই. এ'র 'দলিল' যাদের জন্যে সৃষ্টি, তাদের প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো আলোচনা না উঠে শেষ পর্যন্ত যারা পূর্ব-বাঙলায় 'দ্বিতীয় ভিয়েতনাম' সৃষ্টির মার্কিনী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন—তাঁদের অন্যতম অগ্রনায়ক মোহাম্মদ তোয়াহার ঘাড়ের উপরে চাপানো হলো সেই জঘন্য ষড়যন্ত্রের মিথ্যে অভিযোগ। বামপন্থী রাজনীতিতে অভিমানের, কিম্বা দুঃখ

করার কোনো অবকাশ নেই। তাই মোহাম্মদ তোয়াহা [তোয়াহা যেহেতু একটি ব্যক্তির নাম নয়, একটি মহান সংগ্রামের নাম তোয়াহা, এবং তাঁর সেই সংগ্রামী আলেখ্য যেহেতু ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর বিশাল অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর মহান পার্টিও এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে] এই জঘন্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই করেছেন।

সন্তোষের দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলনে মোহাম্মদ তোয়াহা ও কৃষক সমিতির সম্পাদক আবদুল হক কেন উপস্থিত হতে পারেন নি, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন একান্তভাবেই অপরিহার্য। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ৬৯' এর মহান গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে তাই কিছুটা আলোকপাত করা দরকার।

মিলিটারিম্যান স্বৈরাচারী আয়ুব খানের সুদীর্ঘ এক দশকের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারী শোষণ ও শাসনের নাগপাসে পূর্ববাঙলা তথা পাকিস্তানের জনগণ ক্রমাগত তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবার প্রতীক্ষায়। বিশেষ করে পূর্ববাঙলার বাষট্টি হাজার গ্রামে আয়ুবের লক্ষপ্রায় 'মৌলিক গণতন্ত্রী'দের দৌরাত্ম্য, ইজারাদারী, তহশীলদারী, মহাজনী, জোতদারী ও তাঁদের দালাল টাউট প্রভৃতি শতধাবিভক্ত সামন্তশ্রেণীর অব্যাহত শোষণ পীড়ন ও অফিস-আদালতের সর্বত্র ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতির অবাধ রাজত্ব, থানা, সার্কেল অফিসারদের দাপট, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রির অগ্নিমূল্য, ব্যাপক বেকারী, শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বামপন্থী আন্দোলনের উপরে কুখ্যাত আয়ুব সরকারের স্টীম রোলার, ইত্যাদি কারণে পূর্ববাঙলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই স্বৈরাচারী শাসনের নাগপাস থেকে তাঁরা মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হওয়ার সময় থেকে আওয়ামী লীগ কার্যতঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই চরিত্রের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

এলো ১৯৬৮ সন। পূর্ববাঙলার তুষানলকে বিস্ফোরণে পরিণত করার মহাকাল। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সোনার বাঙলায়—নির্যাতীত, নিপীড়িত লাঞ্ছিত কংকালসার কৃষকের চোখে জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসার আগুন। না, তারা আর মুখ বুজে, দুর্বলের মতো, ভীরুর মতো, 'ভাগ্যবাদী' হয়ে মার খাবে না। এবার আঘাত করার পালা। প্রত্যাঘাতের পালা। দিন বদলের

পালা। আঘাত কর প্রতিক্রিয়ার দুর্গে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চট্টগ্রামের রাওজান। বীর চট্টগ্রাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতার চট্টগ্রাম গর্জে উঠলো। রাওজানে বীর কৃষকরা হাতিয়ার তুলে নিলেন। সশস্ত্র আঘাত হানলেন তহশীলদারী অফিসে। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের। শহীদ হলেন পুলিশের গুলিতে কয়েকজন কৃষক।

বদ্‌লা চাই ; গর্জে উঠলো পূর্ব পাকিস্তান সি. পি. এম. এল। গর্জে উঠলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, মোহাম্মদ তোয়াহা, মওলানা ভাসানী। এগিয়ে এলো তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্বপাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন। এগিয়ে এলো ভাসানী-আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক সমিতি। দৃঢ়তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষনা করলো ভাসানী-তোয়াহা সমর্থিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ। ৬ই ডিসেম্বর রাওজানের কৃষক হত্যার প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ববাঙলায় পালিত হলো হরতাল। অনুষ্ঠিত হলো শত শত জনসভা, মিছিল, বিক্ষোভ।

বদ্‌লা চাই।

স্তিমিত পূর্ববাঙলায় ঐকতান বেজে উঠলো। ঢাকার জনতা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রাজপথে। মওলানা ভাসানী ও তোয়াহার নেতৃত্বে বিশাল জনতা গভর্ণর হাউস ঘেরাও করলো পুলিশের বেরিকেড ভেঙে। মওলানা ভাসানী পুলিশ অফিসারদেরকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে গভর্ণর হাউস ঘেরাও করে প্রতিবাদ লিপি দিলেন, জনতা প্রচণ্ড ঝড়ের মতো বিক্ষোভ করলো। ৭ই ডিসেম্বর ১৪৪ ধারা ভেঙে মওলানা ভাসানী বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন থেকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে—পুলিশ বাধা দেয়। মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গে ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট-এর তুমুল বাকযুদ্ধ হয়। জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। তীব্র উত্তেজনার মুহূর্তে মওলানা ভাসানী পুলিশ বেরিকেড ভেঙে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি'র 'উপহার' কাঁদুনে গ্যাস ও হোচপাইপ দিয়ে গরম জল ছেটানোর 'জনতা ঠ্যাঙানো' বিশাল লাল রঙের রায়োটিং কারটা সচল হয়ে ওঠে এবং জনতার মিছিলে উপুর্যুপরী গরম জল ছিটিয়ে দিতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে এলোপাথারি পুলিশের লাঠি চার্জ শুরু হয়। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুলিশের উপরে প্রচণ্ড ভাবে পাল্টা আক্রমণ চালায়। মওলানা ভাসানী নিজেও 'মার্কিনী রায়োটিং-কার' এর আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। ফলে উত্তেজনা খুবই চরমে পৌছে।

পুলিশ গুলি চালায় কোনো রকম সতর্ক সংকেত ছাড়াই। ফলে কয়েকজন ঘটনা স্থলেই হতাহত হয়।

ঘুমন্ত পূর্ববাঙলায় শুরু হলো ঘুম ভাঙার গান। 'বদ্‌লা চাই। আয়ুব-মোনেমের মুণ্ডু চাই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, ভিয়েতনামের পথ ধরো সাম্রাজ্যবাদ খতম করো। সামন্তবাদ-পুঁজিবাদ নিপাত যাক—নিপাত যাক।' প্রভৃতি শ্লোগানে কেঁপে ওঠে প্রতিক্রিয়ার ভিত। শুরু হয় গণজাগরনের পালা।

এই সময় আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী উদাত্ত আহ্বান জানান গণসংগ্রামে সামিল হয়ে মিলিটারীম্যান আয়ুবের সরকারকে প্রতিহত ও উৎখাত করার আন্দোলনে অংশ নিতে। কিন্তু চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালী সামন্তশ্রেণী ও বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ বামপন্থাদের এই গণআন্দোলন ও রক্তদানের বিনিময়ে গড়ে ওঠা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে মুজিবের 'ছয়দফা'কেই কেটে-সেটে নিজেদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সহযোগে 'আটদফা' দাবী পেশ করে। যার সার কথা হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এই 'আটদফা'কে সমর্থন করে প্রগতিশীলতার মুখোশধারী মস্কোপন্থী ন্যাপ, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলাম, প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালী মুৎসুদ্দি হামিদুল হক ও নূরুল আমিন চক্রের পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি। এই চারদল একত্রিত হয়ে গঠন করে D.A.C. (ডাক) অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি। এরা 'আটদফা'র লাশ নিয়ে কেউ কেউ বামপন্থীদের ব্যাপক আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকে। এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তান সি. পি. এম. এল ১১ দফা দাবী প্রণয়ন করে নিজস্ব ছাত্র সংগঠন পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে জণগনের সামনে তুলে ধরে। ১১ দফার দাবীর মধ্যে ছিলো—স্বাধীন নিরপেক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি ও 'সিয়াটো' 'সেন্টো' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জোট ত্যাগ, পাকিস্তানের প্রত্যেক জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, প্রত্যেক শ্রমিকের চাকরীর নিরাপত্তা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, ধর্মঘটের অধিকার, কৃষকের উপরে বকেয়া খাজনা-ট্যাক্সের সমস্ত বোঝা মওকুফ, ছাত্রদের গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাজবন্দীদের মুক্তি সহ অনেক প্রগতিমূলক দাবি সম্বলিত ১১ দফা দাবীর কাছে আট দফা দাবী ম্লান হয়ে গেলো। জনতা জঞ্জালের আস্তাবলে নিক্ষেপ করলো আটদফা। আর ১১ দফার কর্মসূচীকে সামনে নিয়ে 'ক্রমশই গণজাগরণ'কে

জনগণই দ্রুত থেকে দ্রুততর করতে লাগলো। পূর্ববাঙলার শহর-গ্রাম ও গঞ্জে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো '১১ দফা মানতে হবে'। 'আয়ুবশাহী গুণ্ডাশাহী নিপাত যাক নিপাত যাক'। জনতার রুদ্ররোষের বজ্রকণ্ঠ সৃষ্টি করতে লাগলো মহান সংগ্রামের সেতুবন্ধন। ১৯৬৯' এর ২০শে জানুয়ারী পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত—পূর্বপাকিস্তান সি. পি. এম. এল-এর ক্যাণ্ডিডেট মেম্বার কমরেড আসাদুজ্জামান ঢাকা পোষ্টগ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল কলেজের সামনে নিজের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়ে—ঢাকা-সহ সমগ্র পূর্ববাঙলায় সৃষ্টি করলেন এক মহান দৃষ্টান্ত ও গড়ে দিয়ে গেলেন সংগ্রামের নতুন দিক।

গর্জে উঠলো ঢাকা নগরী। গর্জে উঠলো পূর্ববাঙলার হাট-ঘাট-মাঠ-বন্দর-নগর-গ্রাম ও গঞ্জ; ক্ষেতে কিষাণ, কলে মজুর—'আসাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র।'

'আসাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র' এই নতুন শ্লোগান সামনে নিয়ে বামপন্থী ছাত্র সমাজ ও পূর্বপাকিস্তান সি. পি. এম. এল. গড়ে তুললেন দুর্জয় গণপ্রতিরোধ। এমন কি আসাদুজ্জামানের মতাদর্শগত জীবনালেখ্য ওই সময় গণআন্দোলনের ঢেউ-এর মুখে 'দৈনিক আজাদ' এর মতো প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রও বিশেষ নিবন্ধ লিখেছিলো। 'প্রেসট্রাস্ট' এর কাগজগুলো পর্যন্ত 'সত্য' প্রকাশ থেকে সবসময় বিরত থাকতে পারেনি। অন্ততঃ আসাদের আত্মত্যাগের ব্যাপারে প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ-এর মতো বামপন্থী বিরোধী ছাত্র প্রতিষ্ঠানও 'জনগণতন্ত্র' শ্লোগানের সেই সময় বিরোধীতা করতে সাহস পায়নি। চতুর্দিকে 'আসাদ'-'আসাদ' উত্তাল গণজোয়ারে ভেসে গেলো D. A. C. (ডাক) এর আটদফা, মুজিবের 'ছয়দফা।' আর এই দুর্বার গণজাগরনকে শুদ্ধ করার জন্যে আয়ুব-মোনেম চক্র পূর্ববাঙলার সর্বত্র চালাতে লাগলো ব্যাপক দমন পীড়ন, গুলি, লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, হাজারে হাজারে গ্রেফতার, হুলিয়া, কিন্তু কোনো কিছু দিয়েই আয়ুব খান ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে প্রতিহত করতে পারলো না। বরং দমন পীড়ন যত বাড়তে লাগলো, গণবিস্ফোরোন ততই প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হতে লাগলো। অবশ্য এর অবদান কমরেড আসাদের আত্মত্যাগ। লক্ষ লক্ষ মানুষ ২০শে জানুয়ারী আসাদের রক্তাক্ত লাশ নিয়ে ঢাকার আকাশ বাতাস দলিত মথিত করেছিল। আসাদ যেন একটা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। আসাদ হলো সারা পূর্ববাঙলার সাড়ে সাতকোটি জনতার মহান সংগ্রামের নাম।

২৪শে জানুয়ারী লক্ষ লক্ষ ক্ষিপ্ত জনতার সমাবেশে দাঁড়িয়ে মওলানা ভাসানী

ঘোষনা করলেন—'আয়ুব, তুমি যদি মুজিবকে ছেড়ে না দাও, তাহলে আমি ফ্রান্সের বাস্তিল্‌ দুর্গ বিধ্বস্ত করার মতো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করে মুজিবকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো।' জনতা শ্লোগান দিয়ে উঠলো—'ক্যান্টনমেন্ট ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' 'জেলের তালা ভাঙবো রাজবন্দীদের আনবো।' মিছিলে মিছিলে—সমাবেশে সমাবেশে ওই শ্লোগান উঠলো। আয়ুব খান বামপন্থী নেতৃত্বকে এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা (হুলিয়া) জারী করলো। এমনকি তোয়াহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো। মোহাম্মদ তোয়াহা পলাতক অবস্থায় এই উত্তাল গণসংগ্রামকে—শ্রেণী সংগ্রামে রূপ দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে—গ্রামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। শহর ছেড়ে ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর নেতা ও কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। পার্টির সিদ্ধান্ত হলো-'খাজনা বন্দ' ডাক কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। এবং একে কেন্দ্র করে—ক্রমশ কৃষকদেরকে শ্রেণী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে জোতদারী, মহাজনী, ইজারাদারী ও তহশীলদারী সমস্ত সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে-সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রপাত করা ও তার বিকাশ সাধনে পার্টির সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা।

জনগণ তখন এতবেশী উত্তেজিত ও বিস্ফোরোন্মুখী যে, ১৪৪ ধারা, কারফিউ, গুলি, লাঠি, জেল-জুলুম সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে—ঢাকা সেন্ট্রাল জেল আক্রমণ করে জেল গেট ভেঙে, সুউচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করে অন্ততঃ লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যাঘাতের শপথে স্তব্ধ করে দিলো 'Iron man' আয়ুবের পুলিশ, মিলিটারী, ই. পি. আর-এর সমস্ত রকম আস্ফালোনকে। কণ্ঠে কণ্ঠে তাদের দুর্বার শপথবাণী 'রাজবন্দীদের আনবো, জেলের তালা ভাঙবো'। 'জেলের তালা ভাঙবো রাজবন্দীদের আনবো'। 'কারার প্রাচীর ভাঙবো রাজবন্দীদের আনবো।' সে এক উন্মত্ত ছন্দ লাখো জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে কণ্ঠে। এই একই দৃশ্যের অবতারনা ঘটলো পূর্ববাঙলার সর্বত্র।

● 'লৌহ মানব' আয়ুব খান এই প্রমত্ত গণবিস্ফোরোনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে পরাজিতের মতন বেতার ঘোষনায় জানালো আগামী নির্বাচনে সে আর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে না। কিন্তু আয়ুবের এই ঘোষনা হলো অরণ্যে রোদনের নামান্তর। আন্দোলন আরো ব্যাপক হতে লাগলো। এবং ক্রমে ক্রমে তা

গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত আয়ুব খান পূর্ববাঙলার ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীর লোল্ জিহ্বার সামনে—ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ার প্রসঙ্গ তুলে 'গোল টেবিল' বৈঠকের 'টোপ' ধরলো। শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি (সাময়িক মুক্তি) দিয়ে এই 'গোল টেবিল' বৈঠকে যোগদান করার সুযোগ দেবার কথা নিজেই ঘোষনা করলো আয়ুব খান। আর নির্লজ্জের মতোন সম্পূর্ণ মুক্তির শর্ত ছাড়াই (বিনাশর্তে) শেখ মুজিব খুনী আয়ুবের 'গোল টেবিলে'র 'টোপ' গিলে ফেললেন। এমনকি তারই সঙ্গে ক্যান্টনমেণ্টে বন্দী 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম আসামী কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম সহ শতাধিক 'রাজবন্দী'কে ক্যান্টনমেণ্টে রেখেই 'গোল টেবিলে' যোগ দেয়ার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও অন্যান্য রাজবন্দীরা শেখ মুজিবের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করলে শেখ মুজিব তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন যে, 'আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি আয়ুবের সঙ্গে কথা বলে তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবো।' কিন্তু মুজিবের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক চাতুরীপূর্ণ আশ্বাসে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম ও অন্যান্যরা রাজি হয়নি। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম নাকি শেখ মুজিবের উপরে শারীরিক শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলেন। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম শেখ মুজিব সম্পর্কে এইসব কথা বলতে গিয়ে রাগে ঘৃণায় ফেটে পড়তে চেয়েছিলেন। সঘৃণায় বলেছিলেন 'কল্পনা করতে পারিনি আমরা যে, যে আয়ুব খান 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আড়ালে আমাদের উপরে সুদীর্ঘকাল ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টের মধ্যে বন্দী করে দিনের পর দিন শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে, (শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাদ ছিল না) সমগ্র পূর্ববাঙলায় চালিয়েছে নির্বিচার অত্যাচার—উৎপীড়ন, খুন-জখম, ত্রাস, সেই আয়ুবের সঙ্গে পূর্ণমুক্তি ছাড়াই এই 'বঙ্গ দরদী'র দাবীদার লোকটি (শেখ মুজিব) কি করে (প্যারোলে) বিনাশর্তে আপোস আলোচনায় বসতে রাজি হতে পারলো—ভাবতে পারি না।'

মওলানা ভাসানী মুজিবের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করে বললেন—'তুমি পূর্ণ মক্তি ছাড়া বাইরে এসো না। অপেক্ষা করো—আমিই তোমাকে ছাড়িয়ে আনবো।' আয়ুব আর জল ঘোলা না করে তাড়াতাড়ি মুজিবকে ছেড়ে দিলো। কারণ আয়ুব খুব ভালো ভাবেই জানতো যে, মুজিবকে বন্দী করে রাখাটা হলো কমিউনিষ্টদের গণআন্দোলন তীব্রতর করার পথকে সুগম করে রাখা।

মুজিবকে ছেড়ে দিয়ে—বরং তাকে দিয়েই পৃথিবীতে নজীর বিহীন এই গণ-জাগরনকে নস্যাৎ করা সম্ভব হবে। হলোও তাই। মুজিব বাইরে এসেই ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিরাট সমাবেশে দাঁড়িয়ে ঘোষনা করলেন—'আর আন্দোলন নয়। এবার আন্দোলন বন্ধ করো। আমি তোমাদের দাবী পিণ্ডি থেকে আদায় করে এনে দেবো।'

আশ্চর্য বিশ্বাসঘাতকতা! যে উত্তাল গণজাগরনকে আয়ুবের মতো সুদক্ষ মিলিটারীম্যান—তার প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে, রাইফেল, মেশিনগান, ষ্টেনগান-ব্রেনগান চালিয়ে, জেল-জুলুম চালিয়ে মুহূর্তের জন্যেও স্তব্ধ করতে পারেনি, সেই এতবড়ো নজীর-বিহীন গণসংগ্রামকে শেখ মুজিব মুখের কথা দিয়ে স্তব্ধ করে দিলেন। আর 'গোল টেবিল' খুনীর সঙ্গে করমর্দন করে—পোলাও, কোর্মা, মুর্গীর রোষ্ট চিবিয়ে ক্ষমতার হালুয়া রুটি ভাগাভাগির লোলুপ রসনা চরিতার্থ করার বাসনায়—পূর্ববাঙলার বুকে শতশহীদের রক্ত পিচ্ছিল পথ মাড়িয়ে 'বঙ্গবন্ধু' উড়োজাহাজে উড়াল দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে লাগলেন 'শান্তি প্রতিষ্ঠা'র ডাক দিয়ে।

মওলানা ভাসানী বললেন—'মুজিব, তুমি আয়ুবের সঙ্গে আপোস করতে যেও না; তুমি পনেরো দিন অপেক্ষা করো, আমার পাশে থাকো, তাহলেই আমরা পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নিতে পারবো। আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি; তুমি 'গোল টেবিলে' যোগ দিয়ে আমাদেরকে পিছিয়ে দিয়ো না।'

নির্লজ্জ শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীকে 'পাগল' বলে অভিহিত করলেন। এবং উপদেশ দিলেন—'মওলানা সাহেবকে এখন রাজনীতি থেকে অবসর নেয়াই উচিত।' অর্থাৎ কয়লার দুই পিঠেই সাবান দিয়ে মুছলে তা যেমন থাকে, বা হয়, তেমনি বিশ্বাসঘাতকতাই যার মতাদর্শ, তাকে সংগ্রামে আহ্বান জানালেও তেমনিই হয়। কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। নইলে যে, ভাসানী ও বামপন্থীদের বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে শেখ মুজিব মুক্তি পেলেন; সেই ভাসানীকে কোন্ স্পর্দ্ধায় সমস্ত শিষ্টাচারের মাথা খেয়ে শেখ মুজিব 'পাগল' আখ্যায়িত করতে পারলেন এবং উপদেশ খয়রাত করতে পারলেন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার?

বামপন্থী ছাত্রসমাজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী (অবশ্য মস্কোপন্থীরা গোল টেবিলের লোভে 'ভাই সব বসে পড়ুন এখনই মচ্ছবের খিচুড়ি লাবড়া দেয়া

হবে' মতোন 'বঙ্গবন্ধু'র কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'আর আন্দোলন নয়' এবার 'গোলটেবিল' বলে হুকা হুয়া, শুরু করে দিয়েছিলো) ভাসানী-তোয়াহার নেতৃত্বাধীন গ্রুপ, শ্রমিক ফেডারেশন, কৃষক সমিতির প্লাটফরম থেকে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা-ক্ষোভের সঙ্গে ধ্বনিত হলো 'গোলটেবিল না রাজপথ—রাজপথ রাজপথ।' 'গোলটেবিলে যাচ্ছে যারা আয়ুব খানের দালাল তারা।' 'গোলটেবিল না সংগ্রাম—সংগ্রাম সংগ্রাম' প্রভৃতি শ্লোগানে পূর্ববাঙলা উচ্চকিত হতে লাগলো। শেখ মুজিব গোলটেবিলের বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে—কায়েমী স্বার্থের এজেন্ট বলে গালাগালি দিতে লাগলেন। এ এক চমৎকার নাটক। অর্থাৎ 'ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাচ্ছি না'র মতো শেখ মুজিবের নাট্যানুষ্ঠান। যারা সংগ্রাম করছে তাঁরা হলো কায়েমী স্বার্থের দালাল, আর যারা কায়েমী স্বার্থের 'মহাপ্রভু' আয়ুবের সঙ্গে আপোস করতে চলছেন তারা হলেন জনগণের বন্ধু। ইতিহাস বুঝি এই যুক্তিই মেনে নেবে! তবে—জনগনের বন্ধু না হলেও তারা 'বঙ্গবন্ধু' তো বটেই! কাল মহাকালের ইতিহাস অন্ততঃ এই সাক্ষ্যটুকু নিশ্চয়ই দেবে। একথা ঠিক যে, শেখ মুজিবের এই গালাগালিকে হাতিয়ার করে—১৯৫৬ সনের মতো আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ষণ্ডা-পাণ্ডারা আরেক দফা গুণ্ডাবাজী করার মওকা পেয়েছিলো। পূর্ব বাঙলার প্রত্যেক স্থানেই সংগ্রামরত বিপ্লবী বামপন্থীদের উপরে সশস্ত্র গুণ্ডামী চালিয়েছে মুজিব সমর্থকরা। অবশ্য তাদের সঙ্গে এবারে যোগ দিয়েছিলো 'কমিউনিষ্ট' নামধারী মস্কোপন্থীরা।

নোয়াখালীর এক জনসভায় (বেলা দু'টো থেকে রাত দু'টো পর্যন্ত এই সভার কাজ চলেছিলো) মোহাম্মদ তোয়াহাকে বক্তৃতাদানরত অবস্থায় গ্রেফতার করলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ক্ষিপ্ত কৃষক-জনতা থানা আক্রমণ করে তোয়াহাকে ছিনিয়ে এনে জনসভার কাজ শুরু করেছিলো। মোহাম্মদ তোয়াহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'গোলটেবিল যাত্রীদের' উদ্দেশ্যে এই সময়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেন 'আপনারা এই মহান গণআন্দোলনের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করে গোলটেবিলে 'খুনী'র সঙ্গে বসে হাতে হাত মিলিয়ে ক্ষমতার হালুয়া-রুটি ভাগাভাগি করতে যারা যাচ্ছেন, তাদেরকে খালি হাতেই ফিরে আসতে হবে। পূর্ববাঙলার জনগণ তাদেরকে ক্ষমা করবে না কোনোদিনই।'

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মস্কোপন্থী গ্রুপের মুজাফ্‌ফর আহমদ, নেজামে

ইসলামের মওলানা ফরিদ আহমদ, জামাতে ইসলামীর প্রফেসর গোলাম আজম, পি. ডি. পি'র নূরুল আমিন, ও পশ্চিম পাকিস্তানের নবাবজাদা নসরুল্লাহ্, মমতাজ দৌলতানা, খান আবদুল কায়ুম খান, মাহ্মুদ আলী কসুরী, আবদুল ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, মুফ্তি মাহ্মুদ, প্রভৃতিরা আয়ুবের গোলটেবিলে বসে "খানাপিনা" আলাপ আলোচনা, খুব করে কদিন করতে লাগলেন।

এদিকে পূর্ব বাঙলায় ভাসানী, তোয়াহার অনুসারীরা রাজপথ জনপথ থেকে আন্দোলনকে টেনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে তা শ্রেণীসংগ্রামের স্তরে পৌছানোর কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'খাজনা বন্ধ্' এর ডাক ছড়িয়ে পড়ছিলো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ব্যাপক উদ্দীপনা দিয়ে এগিয়ে আসছিলো নির্যাতীত লাঞ্ছিত কৃষক সমাজ। ৯ই মার্চ ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কের এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে গোল্টেবিলের বিরোধীতা করে বক্তৃতা করেন হাজি দানেশ, শান্তি সেন, ইন্দুসাহা প্রভৃতি বামপন্থী আপোস বিরোধী ব্যক্তিবর্গ। এবং (গোলটেবিল তখনো চলছিলো) গোল্টেবিলের ব্যর্থতা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার জন্যে এবং বামপন্থীদের আপোস বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে পূর্ববাঙলার মেহনতি জনগণকে সামিল হয়ে চূড়ান্ত বিজয় অবধি সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

মওলানা ভাসানী পূর্ববাঙলায় বামপন্থী শিবিরের একক সংগ্রাম অব্যাহত ভাবে চলাকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান। পূর্ববাঙলায় বামপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জামাতে ইসলাম তখন খুবই তৎপর। পথে পথে, তারা 'জাগো জাগো মুসলীম জাগো, ভাগো ভাগো কমিউনিষ্ট ভাগো' শ্লোগান দিতে শুরু করে। এবং গ্রামে গ্রামে 'তবলিক জামাত' (ছোটো ছোটো ধর্ম প্রচার করার দল) নিয়ে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধেই শুরু করে অপপ্রচার। 'কমিউনিষ্টরা পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু' এই হলো 'তবলিক জামাতে'র মূল বক্তব্য। এমন কি জামাতে ইসলাম আমেরিকার কাছ থেকে গোপনে 'ডলার' পেয়ে শহরের ও গ্রামের সমস্ত মসজিদে মসজিদে কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচার চালাতে শুরু করে। অবশ্য পবিত্র মসজিদে এই ধরণের 'জামাতি ষড়যন্ত্রের' ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অনেক সময় প্রতিবাদ করেছেন। এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে এই ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে তারা সতর্ক করে দিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে জামাতে ইসলামীর প্রভাব পূর্ববাঙলার তুলনায় ওই সময় অনেক

বেশী ছিলো। মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে শাহীওয়াল রেল স্টেশনে জামাতী গুণ্ডাদের এক সুপরিকল্পিত হামলার শিকার হন। রেল কম্পার্টমেণ্টের মধ্যেই জামাতী গুণ্ডারা ঢুকে পড়ে মওলানা ভাসানীর উপরে হামলা চালায়। অসমসাহসী মওলানা সাহেব একটা বিরাট জলভরা বোতল তাঁর বা হাতের তালু দিয়ে প্রতিহত করেন। তা না হলে ওই বোতলের আঘাতেই মওলানা ভাসানীর মাথাটা সেই মুহূর্তে গুড়ো গুড়ো হয়ে যেতো। হামলার খবর পেয়ে অন্যান্য কামড়া থেকে ভাসানীর সহযাত্রীরা ছুটে আসেন এবং তুমুল ধস্তাধস্তির পরে মওলানা সাহেবকে আহত অবস্থায় জামাতী গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। এই খবর পূর্ববাঙলায় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাত বিরোধী প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ভাসানী সমর্থকদের মধ্যে। সমগ্র ঢাকা শহরে ভোর থেকে লাল ঝাণ্ডা হাতে মাইক পাহারা দিয়ে অসংখ্য কর্মী ও নেতা খণ্ড খণ্ড ভাবে সমগ্র ঢাকা শহরে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সন্ধ্যায় হাজার হাজার মশালের প্রোজ্জ্বল শিখায়, মিছিলে-মিছিলে ধ্বনিত হয়—আগামীকাল হরতাল। মওদুদীর কল্লা চাই, রক্ত চাই, নিপাত চাই। বামপন্থী ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ অবস্থায় ষড়যন্ত্রের মুল নায়ক মাকিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা কালীন তোপখানা রোডস্থ ইউ. এস. আই. এস-এর অফিসে হামলা চালায় ও অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের ব্যাপক তৎপরতার জন্যে সেদিন ইউ. এস. আই. এস. অফিসটি ভস্মীভূত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

পরদিন ঢাকা শহরে সম্পূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়। হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক জনতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মিছিল ও মিটিংয়ে অংশ নিয়ে জামাত বিরোধী ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ বাতাসকে কম্পিত করে তোলে। মোহাম্মদ তোয়াহা এই প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এই সময় সর্বপ্রথম মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানে 'ইসলামিক সমাজতন্ত্র'র কথা ওই সময় উচ্চারণ করেন। যাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে তোয়াহা-ভাসানীর মতবিরোধ দেখা দেয়। যাই হোক বিক্ষুব্ধ পূর্ববাঙলায় 'গোল টেবিল'-এর খানাপিনা শেষ করে জনগণের জন্যে 'শূন্য হাত' নিয়ে ঢাকা বিমান বন্দরে এসে অশ্রুরুদ্ধ আবেগময় কণ্ঠে সেই সময় শেখ মুজিব বললেন—'আমি তোমাদের জন্যে কিছুই নিয়ে আসতে পারি নি।' ব্যস্ ওই পর্যন্তই। ধানমণ্ডির প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন শেখ মুজিব। আর মাঝে মাঝে বামপন্থীদের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করতে

লাগলেন সতর্কবাণী। 'কমিউনিষ্ট' নামধারী মস্কোপন্থীরাও হাপুস নয়নে, বিরস বদনে রাজপথের কথা ভুলে গিয়ে আশ্রয় নিলো শান্তির রাজ্যে।

ভাসানী ফিরে এলেন ঢাকায়। সঠিক তারিখের কথা আমার মনে নেই। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় ১৯৬৯'এর। 'ভাসানী আসছেন' এই একটি মাত্র খবর শুনে লক্ষাধিক ছাত্র শ্রমিক-কৃষক জনতা লালঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিলে মিছিলে তেজগাঁও বিমানবন্দরকে সচকিত করে তুললো। অবাঙালী এক বিরাট জনতা ঢাকার মুহম্মদপুর থেকে মিছিল করে এলো বিমানবন্দরে। তাদের হাজারো কণ্ঠে বাঙালী জনতা শুনলো—'সেরিগেলি সরকারকো এক ধাক্কা ঔর দো। এক মওদুদী—লাখো ইহুদি। ভাসানী—লাল সালাম।' শ্লোগান দিচ্ছিলো ব্যাপক বাঙালী জনতাও। বিমানবন্দর মুখরিত। সবাই প্রতীক্ষা করছে, কখন মওলানার বিমান ঢাকার মাটি স্পর্শ করবে। সবাই দেখতে চায়—বৃদ্ধ মওলানা—জামাতী গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কেমন আছেন। এসেছিলো ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশী সাংবাদিকরাও। তারা ছবি তুলছিলো টেলিভিশন ক্যামেরায় অনবরত। পার্টির কর্মীরা সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কথা ভেবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিমানবন্দরের প্রবেশ পথে লাঠিধারী ভলান্টিয়ার বাহিনীর সাহায্যে সুদীর্ঘ বেরিকেড তৈরী করে ভেতরে কাউকেই প্রবেশ করতে দিচ্ছিলো না। দীর্ঘ প্রতাক্ষার পরে অবশেষে তেজগাঁও বিমানবন্দরের আকাশে পাখনা মেলে রোদ্দুর ঝিল্‌মিল্ ভাসানীর বিমানকে দেখা গেল। অমনি লক্ষকণ্ঠে বেজে উঠলো শ্লোগান—মওলানা ভাসানী, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আর বিমানটি মাটি স্পর্শ করা মাত্র উল্লসিত জনতা পলকের মধ্যে ভেঙে ফেললো ভলান্টিয়ার বাহিনীর সুদীর্ঘ বেরিকেড। যেন সমুদ্রে ঝড় শুরু হয়ে গেল। জনতা অবাধ্য। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে অনুগামী বেষ্টিত মওলানা সাহেব ফুলে ফুলে ডুবে গেলেন মুহূর্তের মধ্যে। অভ্যর্থনা জানালেন মোহাম্মদ তোয়াহা। মওলানার হাসিমুখ। কিন্তু কোনো কথা শোনার উপায় ছিলো না শ্লোগানের উত্তাল গর্জনে। ঢাকার জনতা দেখলো—'পূর্ববাঙলায় বামপন্থীরা অস্তিত্বহীন নয়। বিশাল মিছিল মওলানাকে নিয়ে এগিয়ে চলছিলো শহীদ মিনারের দিকে। ট্রাকের উপরে আকণ্ঠ ফুলের মালায় ডুবে গিয়ে বসেছিলেন ভাসানী। পথের দুই পাশে সারিবদ্ধ বিপুল জনতা হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছিলো তাঁদের প্রিয় নেতাকে। হাত নাড়ছিলেন মওলানা ভাসানী। আর লাখো জনতার মিছিলে গজারী ও

সুন্দরী কাঠের লাঠি—তার মাথায় লালঝাণ্ডা। প্রতিক্রিয়াশীলরা অনুধাবন করল, না, এত সহজেই এদেশকে 'ইন্দোনেশিয়া' তৈরী করা যাবে না। প্রতিক্রিয়ার আঘাতের চাইতে প্রগতির প্রত্যাঘাত কোনো অংশেই দুর্বল নয়। বরং অসম্ভব প্রাণস্পন্দনে সজীব প্রগতির দুর্বার গতিধারা। তাকে অত সহজে রোখা যাবে না।

শ্লোগান চলছিলো—'মালিক তুমি হুশিয়ার, শ্রমিক এবার জেগেছে। সামন্তবাদ হুশিয়ার কৃষক পথে নেমেছে।' শ্লোগান চলছিলো—'মালিক খাবে আর শ্রমিক খাবে না—তা হবে না, তা হবে না।' তুমি খাবে আর আমি খাবো না—তা হবে না, তা হবে না।' শ্লোগান চলছিলো—'আমাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র।' 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধরো—সমাজতন্ত্র কায়েম কর।' শ্লোগান চলছিলো—'ক্ষেতে কিষাণ, কলে মজুর, জোট বাধো তৈরী হও। আসছে দিন জোর লড়াই। কাস্তে হাতুড়ি শান্ চালাও,' ইত্যাদি শ্লোগানে শ্লোগানে মধ্যাহ্নের খররৌদ্দুরে ঘর্মাক্ত লাখো মানুষের মিছিল এল শহীদ মিনারে। মওলানা ভাসানী বক্তৃতা করলেন, না, কোনোরকম আপোস নয়। সংগ্রাম চলবেই।

হ্যাঁ। সংগ্রাম চলবেই। ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর ডাক—। সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাও। শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সৃষ্টি কর দুর্বার শ্রেণী সংগ্রাম। আঘাত কর প্রতিক্রিয়ার দুর্গে। আর সেই আঘাত করার সব চাইতে সুবিধাজনক শত্রুর দুর্বল ঘাঁটি হচ্ছে গ্রাম।

মওলানা ভাসানী যখন শহীদ মিনারে বক্তৃতা করেছিলেন, তখন দু'টো সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার আকাশ দিয়ে চক্কোর মেরে দেখছিলো লাল ঝাণ্ডার বিশাল জনতরঙ্গ। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার দুর্গে দুর্বার প্রগতির আঘাতে কাঁপন ধরে গিয়েছিলো তখন। শোষকশ্রেণীর সিংহ দুয়ারে কাঁপন ধরানোর মূল কারণ হলো শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমাগত দুর্বার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। প্রমাদ গনলো আয়ুব-মোনেম চক্র। প্রমাদ গনলো আমেরিকা। কই, শেখ মুজিবও তো স্তব্ধ করতে পারলো না আন্দোলন! যদিও জনতার এক অংশ শেখ মুজিবের 'আর আন্দোলন নয় এবার শান্তি'র ডাকে বিভ্রান্ত ও নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু তাতে আন্দোলন তো থেমে গেলো না? বরং বামপন্থীদের একক নেতৃত্বে আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে গিয়ে ক্রমশই তা শ্রেণী সংগ্রামের দিকে গতি পরিবর্তন করলো। শোষক ও শাসক শ্রেণী ভীত সন্ত্রস্ত হলো ভয় পেলো

আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব, নূরুল আমিন, মওলানা মওদুদী প্রভৃতি পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও তার মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থবাহকেরা। ষড়যন্ত্র করতে লাগলো সবাই মিলে এই দুর্বার শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগতিকে প্রতিহত করা যায় কি ভাবে। এই সময় বামপন্থী নেতৃত্বের উপরে—মুসলীম লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, জামাতে ইসলাম প্রভৃতি রাজনৈতিকদল এক যোগে একই স্বার্থের ধারক বাহক হিসেবে চালাচ্ছিলো সুপরিকল্পিতভাবে হামলা ও গুণ্ডামী। মোনেম খান গভর্ণর হাউসে 'শেষ চেষ্টা' হিসেবে ঢাকার কুখ্যাত গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদেরকে ডেকে এনে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানোর জন্যে প্রচুর অর্থ বিলি করলো। কোথাও কোথাও টুক-টাক হাঙ্গামাও হয়ে গেলো। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী, লেনিনবাদী (ই. পি. সি. পি. এম. এল) শোষক ও শাসক শ্রেণীর এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করে চূড়ান্ত জয়লাভ না করা পর্যন্ত সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান জানালো। এই ডাকে সাড়া দিয়ে অসংখ্য কমরেড—দল বেধে বেধে রাত্রির পর রাত্রি ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা সমূহে দাঙ্গা বিরোধী মিছিল করে, পাহারা দিয়ে, গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদেরকে শাসিয়ে—, শান্তি কমিটি গঠন করে মোনেম খানের ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বানচাল করে দিতে সক্ষম হলেন। অবশ্য দাঙ্গা বিরোধী শান্তিমিছিল করতে গিয়ে পার্টির অনেক কমরেডকে মারাত্মক ভাবে জখম হতে হয়েছিল, লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। তবুও যে কোনো সাম্প্রদায়িক হামলাকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে ওই সময় ঢাকার সদরঘাট অঞ্চলে অসংখ্য কমরেডকে সশস্ত্র পর্যন্ত রাখা হয়েছিলো। পূর্ববাঙলার ইতিহাসে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে এই দাঙ্গা বিরোধী বামপন্থী অভিযান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মতো একটি দৃষ্টান্ত। ওই সময় ব্যাপক দাঙ্গা বিরোধী অভিযান না চালালে—হাজার হাজার সরল নিরীহ মানুষের রক্তে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের রক্তপিপাসুরা তাদের রসনা তৃপ্ত করতো।

এই সময় ঢাকা নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চলে চলছিলো শ্রমিক শ্রেণীর দুর্জয় 'ঘেরাও আন্দোলন'। মালিকরা, মালিকের প্রতিনিধিরা কেউই অফিসের বাইরে যেতে পারছিলো না। শ্রমিকরা তাদেরকে 'ঘেরাও' করে রেখে তাঁদের প্রাপ্য দাবী আদায়ের সংগ্রামে রত ছিলো। এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর ওই প্রচণ্ড

মারমুখী আন্দোলনের সামনে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারেই অচল হয়ে গিয়েছিলো। কোনো মিল ফ্যাক্টরীতে পর্যন্ত পুলিশ ঢোকার সাহস পাচ্ছিলো না তখন। ফলে মালিকেরা বহুক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের দাবীকৃত বোনাস, ও অন্যান্য দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যে সব জায়গায় পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃত্ব ছিলো, সেই সব জায়গায় শ্রমিকরা তাঁদের দাবী আদায় করতে পেরেছে পাই পাই করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের ভূঁইফোড় পাতি নেতারা এই আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যে শ্রমিকদের দাবী আদায় করার শ্লোগান দিয়ে মালিক শ্রেণীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণ করে, বহুক্ষেত্রেই শ্রমিকদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে। এবং অনেক আওয়ামী লীগ কর্মী যারা ছেড়া পোশাকে ঘুরে বেড়াতো, দেখা গেলো তারাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে বাড়ি ও গাড়ির মালিক হয়ে গেলো। বিনিময়ে সেই সব মিল ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা পেলো লাঞ্ছনা। ক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীরাও শুরু করলো 'ঘেরাও আন্দোলন'। ফলে মালিক শ্রেণীর 'ব্যবসায়িক সংগঠন' একেবারেই অচলাবস্থার মধ্যে পতিত হলো। এদিকে বামপন্থী ছাত্র শ্রমিক জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো 'তোমার পার্টি আমার পার্টি—বাঁচার পার্টি—কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ট পার্টি। শ্লোগান উঠলো—ভিয়েতনামের পথ ধরো—সাম্রাজ্যবাদ খতম করো। শ্লোগান উঠলো—তোমার আমার বাঁচার পথ—মহান লেনিন-মাও-এর পথ।' ভীত সন্ত্রস্ত আয়ুবশাহী এই কমিউনিষ্ট তৎপরতাকে রোখার জন্যে পূর্ববাঙলার কুখ্যাত বাঙালী কুলাঙ্গার গভর্ণর আবদুল মোনেম খানকে অপসারিত করে এক নতুন খেলা দেখালো। ভার্সিটির অধ্যাপক এম.এ হুদাকে গভর্ণরের পদে বহাল করলো। আর গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এম.এ. হুদা আয়ুবের শেখানো বক্তৃতাগুলো—'বেতার ভাষণ' মারফত অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে প্রচার করলেন—'আমি সারা জীবন অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করে আছি, কখনো রাজনীতির তিক্ত পরিবেশের মধ্যে নিজেকে টেনে আনি নি। আমার বাবাও সারাজীবন শিক্ষকতার মহান ব্রত নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন। আমি তোমাদের (ছাত্রদের) অভিভাবক। তোমরা রাজপথে শ্লোগান দেয়ার প্রবণতা ছেড়ে দিয়ে বিদ্যালয়ে ফিরে এসো। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তোমরাই দেশের ভবিষ্যত। রাজনীতির তিক্ত পরিবেশ তোমাদের জন্যে নয়, তোমাদের জগৎ হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। তোমরা সেই শিক্ষাঙ্গনের শোভা……।' ইত্যাদি হাজারো নাকি কান্নার কাঁদনে বেতার ভাষণ শেষ করলেন নতুন গভর্ণর এম. এ. হুদা।

কিন্তু হুদা সাহেবের সেই নাকি কান্নায় আর চিড়ে ভিজলো না। শহরে দুর্বার ঘেরাও অভিযান আর গ্রামে দুর্জয় সঙ্কল্প 'খাজনা বন্দ্' এর ডাক থেমে রইলো না। ক্রমশই তা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। ঢাকা শহর পরিণত হলো ঘেরাও শহরে। ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর কমরেডরা গেরিলা কায়দায় শুরু করল মিছিল এবং 'চড়ুই সভা'। অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পিত বিশেষ স্থানে পার্টির কমরেডরা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এককভাবে সমবেত হয়ে স্বল্প সময়ের জন্যে খণ্ড মিছিলে'র মাধ্যমে কিছু বাছাই করা শ্লোগান প্রচার করে, কিম্বা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে একে একে জমায়েত হয়ে পার্টির নির্দ্ধারিত বক্তব্য জনগণের কাছে পৌছে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে [শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগেই] যে যার মতো মিশে গিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টির এই কৌশল অবলম্বন করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা কেমন হতচকিত হয়ে পড়ে। চড়ুই পাখিগুলো যেমন হঠাৎ করে জড়ো হয়ে অনেকগুলো মিলে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে হই চই করে নিমেষে উধাও হয়ে যায়, ঠিক ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলসমূহে তেমনি কায়দায় পার্টির কমরেডরাও মিছিল পথসভা করতে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো—ব্যাপক জনগণের কাছে কমিউনিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব ও তার বক্তব্যকে তুলে ধরা। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি ব্যাপক বিপ্লবী কর্মসূচী প্রয়োগ করার পূর্বেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগণে নেমে এলো আর এক ষড়যন্ত্রের কালো রাত্রি।

এগারো

১৯৬৯-এর ২৫শে মার্চ রাত্রিতে আচমকা কোনো পূর্ব নির্দ্ধারীত ঘোষনা ছাড়াই, বেতারে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সংক্ষিপ্ত ভাষণ শোনা গেলো। খুবই স্বল্পকালীন ভাষণে আয়ুবের অন্তিম আবেগময় কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—"আমার প্রিয় দেশবাসী, পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আপনাদের কাছে এই আমার শেষ ভাষণ। আমি আপনাদের সেবার জন্যে আমার সাধ্যানুযায়ী সব কিছুই

করেছি। ……কিন্তু,……দেশে আজ চরম অরাজকতার বিরাজ করছে। সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেছে।…জনগণ নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে।…পাকিস্তানের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন…।…দেশ ও জাতিকে এই চরম অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আমি সারা দেশে সামরিক আইন জারী করছি…।"

অর্থাৎ ঘায়ের উপরে নুনের ছিটে'র মতো 'দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার' নামে দ্বিতীয়বারের মতোন সারা দেশে মিলিটারী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হলো। পুরোনো নাটকেরই 'পট ও নট' এর পরিবর্তন হলো মাত্র। আয়ুবের প্রস্থান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে 'হিটলার' নামে খ্যাত আগা, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মঞ্চাবতারনার মাধ্যমে শুরু হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন খেলা। এই নতুন খেলায় সুচতুর ইয়াহিয়া খান আয়ুবের সামরিক আইনের প্রাথমিক স্তরের ব্যাপক দমন পীড়ন, ও রাজনৈতিক পার্টি সমূহ নিষিদ্ধ, গ্রেফতারী, শারীরিক নির্যাতন, জরিমানা,'বাজেয়াপ্ত'র পথে না গিয়ে—ক্ষমতালোভী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরলো 'ভোট'-এর টোপ। ২৭শে মার্চ এক বেতার ঘোষনায় ইয়াহিয়া খান প্রতিশ্রুতি দিলো—আইন শৃঙ্খলা ফিরে এলেই 'সার্বজনীন ভোটাধিকার' দেয়া হবে। সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া ও দেশ শাসনের ইচ্ছা নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী তাদের ব্যারাকে ফিরে যাবে।

ইয়াহিয়ার এই ঘোষনা দানের পেছনে ছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দেশীয় দালাল শ্রেণী সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার নতুন কৌশল। শাসক ও শোষকশ্রেণী পুরোনো কায়দায় কিছুতেই আর তাদের শাসন-শোষণকে টিকিয়ে রাখতে পারছিল না। ক্রমশই দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিলো। এবং এই পরিস্থিতিতে দেশে, বিশেষ করে পূর্ববাঙলায় দ্রুতভাবে সৃষ্টি হচ্ছিলো বিপ্লবী অবস্থার। অবশ্য সেই সময় ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর নেতৃত্বে পূর্ববাঙলার গ্রামে প্রাথমিক স্তরে শুরু হয়ে গিয়েছিল গেরিলা যুদ্ধ। নোয়াখালি ঢাকা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পাবনা ও চট্টগ্রামে এই গেরিলা যুদ্ধের সূচনা হয় এবং তা খুবই দ্রুততার সঙ্গে বিকাশলাভ করতে শুরু করে। ব্যাপক কৃষক জনতার মনে জাগে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রচণ্ড অভিপ্সা আর

আত্মত্যাগের মহান চেতনা। অপরদিকে শোষক শ্রেণী ও তাদের দালালদের মনে জাগে আতঙ্ক, তারা স্থানে স্থানে আত্মসমর্পন করতে থাকে—বিপ্লবী পার্টির কাছে। এবং অনেকে 'প্রচুর অর্থ' দেয়ার লোভ দেখিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং নিজের গ্রাম ছেড়ে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অঘোষিত পার্টির মুক্তাঞ্চলে পার্টির কমরেডরা দিবারাত্রি প্রকাশ্যভাবে জনগণের সঙ্গে মেলামেশা ও পার্টির কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, এবং প্রতিক্রিয়াশীলরাই প্রাণের ভয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড লাইফ অবজারভ করতে থাকে। এমন কি ঘরের দেয়ালের বাইরে কোনো কোনো গ্রামে রাঘব বোয়াল জোতদার-মহাজনরা বেরুতে সাহস পাচ্ছিলো না বিপ্লবী কৃষক গেরিলাদের ভয়ে। তারা ঘরের মধ্যেই বসে থাকতো দরোজা বন্ধ করে ও রাত্রিতে পাহারা দানের ব্যবস্থা করেও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারতো না। গ্রামের এই শোষক শ্রেণীর আতঙ্ক ক্রমশঃ শহরের ধনিক ও মহাজন শ্রেণীর মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছিলো এবং তারা এই বিপ্লবী পরিস্থিতিকে নির্মূল করার জন্যে করছিলো ষড়যন্ত্র। পূর্ববাঙলায় সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছিলো বিপ্লবী স্লোগান "মার্কসবাদ লেনিনবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।" "কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধরো—রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করো।" "মাও সে তুঙের পথ ধরো, বিপ্লবী 'রাজ' কায়েম করো।" "ভিয়েতনামের পথ ধরো, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত করো।"

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। পূর্ববাঙলার প্রত্যেক দেয়ালের দিকে তাকিয়ে শোষক শ্রেণীরও মাথা বিগড়ে গিয়েছিলো ভয়ে ও আতঙ্কে। "গ্রামে গ্রামে শ্রেণীসংগ্রাম, কৃষকের মহান গেরিলাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ; কমরেডস্ এই মহান বিপ্লবীযুদ্ধকে আরো তীব্র ও রক্তাক্ত করে তুলুন।" "এ যুগের দুই প্রধান প্রবনতা, হয় বিপ্লব বিশ্বযুদ্ধকে পদানত করবে, না হয় বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে।" "কমরেডস্ আমরা বিপ্লব দিয়ে আসুন বিশ্বযুদ্ধকে পদানত করি।" এই ধরনের বিপ্লবী স্লোগানে পূর্ববাঙলার শহরের দেয়ালগুলো ভরে উঠেছিলো। এমন কি গ্রামের স্কুল ও দেয়ালওয়ালা বাড়ির দেয়ালেও উৎকীর্ণ হলো বিপ্লবী স্লোগান। জনগণের প্রতি বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার ডাক। আর এই বিপ্লবী পরিস্থিতির বিরুদ্ধে একযোগে হামলা চালাতে লাগলো আওয়ামী লীগ, জামাতে ইসলাম, মস্কোপন্থী গ্রুপ। মস্কোপন্থীদের কাগজ 'দৈনিক সংবাদ' আওয়ামী লীগের কাগজ 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লিখতে শুরু করলো। সুতরাং ইয়াহিয়া খানের সামরিক

আইন এদের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে এলো। দেশীয় ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলসমূহ ইয়াহিয়ার 'ভোট' এর কথা প্রচার করার সুযোগ পেয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ও বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়ার হাতকে শক্তিশালী করার মতো একটা মোক্ষম সুযোগ লাভ করলো। ১৯৭০ সনের ৫ই অক্টোবর 'নির্বাচন' অনুষ্ঠানের দিন ঘোষনা করে, আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে ইয়াহিয়া খান 'লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডার, নামে পাঁচটি শর্ত আরোপ করলো। নির্বাচনে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক দলসমূহকে এই 'দাসত্বমূলক' শর্তের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। নইলে এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার অধিকার কোনো রাজনৈতিক দল কিম্বা স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তিরই থাকবে না। 'লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডারের' পাঁচটি শর্ত হচ্ছে—(১) নির্বাচিত 'গণ প্রতিনিধি'দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত প্রেসিডেণ্টের হাতে (ইয়াহিয়া তখন প্রধান সামরিক শাসক থেকে 'প্রসিডেণ্ট' সেজেছে) সর্বময় নির্বাচনী ক্ষমতা ও দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে (২) 'আইন শৃঙ্খলা'র অবনতি ঘটলে নির্বাচিত পরিষদকে প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছে করলে বাতিল করে দিতে পারবে এবং এ জন্যে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে প্রেসিডেণ্ট বাধ্য থাকবে না। (৩) পরিষদে গৃহীত কোনো বিল দেশের জন্যে কল্যাণকর না হলে প্রেসিডেণ্ট তাতে স্বাক্ষর দেবে না, এবং তার অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো 'আইন'ই শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করা যাবে না (৪) পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলাম বিরোধী—কোনো 'শাসনতন্ত্র' প্রণয়ন করা হলে—প্রেসিডেণ্ট পরিষদকে বাতিল করে দেবে (৫) ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করতে না পারলে—নির্বাচিত পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

এই 'দাসত্বমূলক' নির্বাচনের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানে একটি মাত্র কণ্ঠস্বর প্রতিবাদ জানালো। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা—'পুরোনো বোতলে নতুন মদ' বলে ইয়াহিয়ার এই ঘোষনাকে বিদ্রূপ করলেন। তিনি জনগণকে হুশিয়ার করে দিলেন—এই 'প্রহসন' থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা ও সামরিক সরকারের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে শ্রেণী সং৭ামের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার পথই হচ্ছে শোষণহীন, সুখী-সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের একমাত্র গ্যারান্টি। 'নির্বাচনে'র নামে এই প্রহসন করার অর্থই হচ্ছে জনগণের অধিকার সচেতন বিপ্লবী সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করে শোষক ও শাসক শ্রেণীর নয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার পথকে সুগম করার প্রচেষ্টা। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ বিবৃতিতে

(যদিও সে বিবৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কাগজগুলো ছাপেনি) নির্বাচনের বিরোধীতা করে—শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দেন। এবং অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার দাবী জানান।

কিন্তু আজকের 'বঙ্গবন্ধু' 'বাংলার নয়নের মণি' ইয়াহিয়ার এই দাসত্ব প্রস্তাবকে মেনে নিয়ে—ইয়াহিয়াকে 'গণতন্ত্রে বিশ্বাসী' 'প্রগতিশীল' বলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। শেখ মুজিবর রহমানের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'কমিউনিষ্ট মস্কো'রা শুরু করলো একের পর এক অভিনন্দন জ্ঞাপন। ইয়াহিয়ার গলায় চড়লো ফুলের মালা—বঙ্গবন্ধু'র। ধন্য শেখ মুজিব, ধন্য ইয়াহিয়া খান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইয়াহিয়ার 'লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডার' মেনে নিয়ে যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তারা 'বাঙলার নয়নের মণি' কিনা তা উল্লেখিত ওই পাঁচটি শর্ত ব্যাখ্যা করলেই বুঝতে পারবেন। এখানে তাই আর 'লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডার' এর ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজনীয়তা নিষ্প্রয়োজন। যাই হোক ক্ষমতা লিপ্সু শেখ মুজিব বামপন্থীদের নির্বাচন বিরোধীতার জন্যে তাঁদেরকে দেশের শত্রু, বিদেশের দালাল (চীনের), সমাজ বিরোধী, গণ বিরোধী চক্র, বলে যথেচ্ছ গালাগাল দিতে আরম্ভ করেন। শুধু তাই নয়, কমিউনিষ্টদেরকে নির্মূল করার জন্যে শেখ মুজিব স্বয়ং 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' নামে (তাদের পোশাক তৈরী করে, মাথায় শাদা ও সবুজের টুপি পরিয়ে, হাতে প্রকাশ্যে লাঠি দিয়ে অপ্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে) হিটলারের 'ঝটিকা বাহিনী'র মতো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এক সুপরিকল্পিত 'গুণ্ডা বাহিনী' তৈরী করে—কমিউনিষ্টদের উপরে যত্র-তত্র হামলা চালাতে শুরু করেন। ঢাকা শহরের বুকে সেই 'লাঠিধারী বাহিনী' লেফ্‌ট্ রাইট করে 'জয় বাঙলা' শ্লোগান দিয়ে 'উগ্রজাতীয়তাবাদের' তীব্র প্রচার করতে শুরু করে।

শাসক-শোষক শ্রেণীর পশ্চিম পাকিস্তানী অনুচর জুল্‌ফিকার আলী ভুটোর পিপল্‌স পার্টির শ্লোগান হলো—'ইসলামিক সমাজতন্ত্র' ও শক্তিশালী পাকিস্তানী গঠনের শ্লোগান। পাকিস্তানের উভয় অংশে 'জয়বাঙলা' ও 'ইসলামিক সমাজতন্ত্রের' শ্লোগানের মাধ্যমে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার শুরু হইলো। শেখ মুজিব পূর্ববাঙলার গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করতে লাগলেন "তোমরা কলাগাছকে ভোট দাও, আমি তাহলেই সেই ভোট পেয়ে যাবো। তোমাদের অধিকার আদায় করে দেবো আমি।" কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিম্বা, তাদের এজেন্টদের (যদিও শেখ মুজিব মার্কিনী সেবাদাস,

তবুও কৌশলগত কারণেও) বিরুদ্ধে কোনো টুঁ' শব্দ পর্যন্ত করলেন না। বরং গণচীনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে লাগলেন। যাই হোক কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রেসিডেণ্ট, নির্বাচনের তারিখ ৫ই অক্টোবরের বদলে ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের কথা ঘোষনা করলো। এতে শেখ মুজিব 'কমিউনিষ্টরা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছে' বলে অভিযোগ করেন এবং নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়ার জন্যে কমিউনিষ্টদেরকেই দায়ী করেন।

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের 'গণদরদী চরিত্রে'র একটা ঘটনার উল্লেখ করলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন, এরা কতটা ক্ষমতার কাঙাল। ক্ষমতার জন্যে এরা করতে পারে না—হেন কাজ পৃথিবীতে নেই। ১৯৭০ সনের ২২শে মে ঢাকার উপকণ্ঠে পোস্তগোলা শ্যামপুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া সেদিন শত শত শ্রমিকের বুকের রক্তে লালে লাল হয়ে গিয়েছিলো। এর পেছনে কাদের অদৃশ্য হাত ছিলো? পোস্তগোলার 'বিক্রমপুর মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ' এর মালিক ছিলো একজন বাঙালী ধনিক। শ্রমিকরা তাঁদের 'বোনাস' এর দাবীতে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়চিত ভাবে ধর্মঘট করলে মালিকপক্ষ অন্যায়ভাবে 'লক আউট' ঘোষণা করে। ফলে সুদীর্ঘ তিনমাস ধরে 'বেকার' শ্রমিকরা তাঁদের পরিবার পরিজন নিয়ে সম্পূর্ণ অনাহারে কালাতিপাত করে, শেষ পর্যন্ত সবরকম মীমাংসার পথ ব্যর্থ হলে—অনন্যপায় হয়েই অনাহারী শ্রমিকরা 'বিক্রমপুর মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ' নিজেরাই চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, কথিত ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর ট্রেড-ইউনিয়নটি ছিলো আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন 'শ্রমিক লীগ'-এর হাতে। 'শ্রমিক লীগ' সর্বহারা নিঃস্ব শ্রমিকদের কাজে বহাল করার কোনো প্রচেষ্টাই করে নাই। বরং গোপনে গোপনে মালিকপক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের নেতারা যোগসাজশ করে—মালিকের হাতকেই শক্তিশালী করেছিলো। এ জন্যেই একজন পাতি মালিক পূর্ববাঙলার ওই দুর্জয় গণঅভ্যুত্থানের সময়েও অতটা ক্ষমতা এবং দীর্ঘ তিনমাস একটানা ইণ্ডাষ্ট্রি বন্ধ রেখে শ্রমিকদেরকে অনাহার ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার দুঃসাহস পেয়েছিলো। তাই বাধ্য হয়েই মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার। এই খবর মালিকের কানে পৌছাতে দেরী হয়নি। শ্রমিকরা 'মিল দখল করবে' এই আশঙ্কায় উক্ত মালিক রাত্রির অন্ধকারে ইণ্ডাষ্ট্রিজের মেশিনারী পার্টস্ খুলে নেয়ার ষড়যন্ত্র করে। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে শ্রমিকরা

ফ্যাক্টরী চালু করতে না পারে। আর পার্টস্ খুলে নিতে গেলে শ্রমিকরা টের পেলে তাঁরা যে বাধা দান করবে—মালিকপক্ষ তা অনুধাবন করেই, তাঁদেরকে প্রতিহত করার সব রকমের ষড়যন্ত্র আগেই পাকাপাকি করে 'পার্টস্' খোলার কাজে হাত দিয়েছিলো। ফলে পাহারারত শ্রমিকরা মালিকপক্ষের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এবং মালিকের গুণ্ডাদের দ্বারা সংগ্রামী শ্রমিকরা প্রাথমিক অবস্থায় আহত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে এই খবর বামপন্থী নেতৃত্বাধীন অন্যান্য মিল ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের কাছে গিয়ে পৌছালে পরিস্থিতি শ্রমিকদের আয়ত্বে চলে যায়। হাজার হাজার শ্রমিক 'বিক্রমপুর মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের' সামনে এসে সমবেত হয়। এই পরিস্থিতিতে সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে পৌছে, এবং কোনোরকম শান্তিস্থাপনের প্রয়াস ছাড়াই—(পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লীগপন্থী একজন ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিল, যার নির্দেশে গুলি চালানো হয়) শ্রমিকদের উপরে 'যুদ্ধক্ষেত্রে পোজিশন নেয়ার মতো' শুয়ে পড়ে বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করে। শ্রমিকরা হতচকিত ভাবে আত্মরক্ষার জন্যে পথের ঢালুতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তবুও তাঁরা রেহাই পায়নি। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো পুলিশবাহিনী তাঁদের উপরে গুলি চালাতে শুরু করে। আর নিরীহ শ্রমিকের বুকের রক্তে ভিজে ওঠে—রাজপথ, নালার জল, আর সবুজ ঘাস। পরে শ্রমিকরাও আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। রাইফেলের বিরুদ্ধে শুরু হয় 'ইট পাথরের' লড়াই। অন্ততঃ কয়েক শত শ্রমিক নিহত হয়। তাঁদের লাশ গায়েব করা হয় সঙ্গে সঙ্গেই। ঢাকার মানুষ বুড়ি গঙ্গা নদীর বুকে সপ্তাহধিককাল ধরে দেখেছে হতভাগ্য শ্রমিকদের লাশ ভেসে থাকতে। ২২শে মে—'পোস্তগোলা শ্যামপুর' তৈরী করলো এক মহান ইতিহাস। রক্তাক্ত 'চিকাগো'র ইতিহাস বুঝি মে মাসে ঢাকায় তার চুরাশি বছরের অতীতকেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলো—'দুনিয়ার মজদুর এক হও।'

ক্ষমতালোভী শেখ মুজিব এই ঘটনার নিন্দা না করে কমিউনিষ্টদেরকেই দায়ী করলেন। তিনি বললেন—সমাজবিরোধীরা (অর্থাৎ কমিউনিষ্টরা) নির্বাচন বানচাল করার জন্যে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। তিনি কমিউনিষ্টদেরকে হুশিয়ার করে দেন, এর পরিণাম খুব ভয়ানক হবে। আর আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বিশ্ববাসীকে বলছি—আপনারা শুনুন—শত শত শ্রমিকের রক্তে হোলি খেলে ক্ষিপ্ত শ্রমিকদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে সেই

বিক্রমপুর মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের মালিক সেইসময় কার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো—জানেন? 'বাঙলার নয়নের মণি' 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বিলাস বহুল—নিকেতনে। এর পরেও কি ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন আছে—শেখ মুজিবের চরিত্রের? আর আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক' তার সম্পাদকীয়তে 'পুলিশের সম্মান' শীর্ষক নিবন্ধে কি লিখেছিলো? পরোক্ষভাবে 'ইত্তেফাক' শ্রমিকদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করে—তার প্রভু 'নির্বাচন দাতা' ইয়াহিয়ারই মনোস্তুষ্টি করেছিলো নাকি? 'ইত্তেফাক' পরিষ্কারভাবে লিখেছিলো—দেশে এখন ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন না করাই উচিত। তাহলে ইয়াহিয়া খান নির্বাচন বাতিল করে দেবে। এবং সামরিক আইনে গ্রেফতারকৃত 'বিশেষ রাজবন্দীদের' (অর্থাৎ বিপ্লবীদের বাদ দিয়ে) বেছে বেছে মুক্তি দেওয়া উচিত। 'বিশেষ পন্থী'দেরকে ছেড়ে দিলে তাঁরা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবে।—এই ধরণের লেখায় 'ইত্তেফাক' তার সংস্করণের পর সংস্করণ পরিপূর্ণ করতে থাকে। ফলে ঢাকার চতুর্থ শ্রেণীর ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ও ঢাকার উত্তাল সংগ্রাম সৃষ্টিকারী প্রেস শ্রমিকরা 'ইত্তেফাক' অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং 'ইত্তেফাক ইত্তেফাক—হুশিয়ার হুশিয়ার' বিভিন্ন ধরণের ধ্বনি দিয়ে—'ইত্তেফাকে'র গণবিরোধী ভূমিকার নিন্দা ও প্রকাশ্য রাজপথে ইত্তেফাক পুড়িয়ে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। 'ইত্তেফাক' এই ঘটনার বিরুদ্ধে নির্লজ্জভাবে শ্রমিকদেরকে হুশিয়ার করে দিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাতে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, শ্রমিকদের কোনো খবর 'ইত্তেফাক' আর প্রকাশ করবে না। 'ইত্তেফাক' এর কাছে শ্রমিকরা শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা করলে—তাঁদের খবর ছাপার ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে। 'ইত্তেফাক' এর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রমিক সমাজ ঘৃণায়-ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। শ্রমিকরাও 'ইত্তেফাক'কে হুশিয়ার করে দিয়ে বলে—শ্রমিকরা কোনোদিন কোনো প্রতিক্রিয়ার হুমকির কাছে তাঁদের সমুন্নত শির নত করে নাই। 'ইত্তেফাক' তো কাগুজে বাঘের একটা নখমাত্র। সে নখের ধারও শ্রমিকরা যে কোনো মুহূর্তে বিকল করে দিতে পারে।

ক্ষমতা লিপ্সু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের গণবিরোধী ভূমিকার ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত দু'টি একটি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের জন্ম হয়েছিলো 'গণবিরোধীতারই সূতিকাগারে। তাদের আদর্শই হলো মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে স্বপক্ষে কাজ করা। তাদের লক্ষ্যই হলো গণস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতার গদিতে পা নাচানো এবং দেশীয় বাঙালী সামন্তবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটানো। এই জন্যেই নির্বাচনী প্রচারে শেখ মুজিব ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বেরই শ্লোগান তুলেছিলেন "তোমরা কলাগাছকে ভোট দাও (অবশ্য আওয়ামী লীগ মার্কা কলাগাছকে) তাহলেই সেই ভোট আমি পেয়ে যাবো।" অর্থাৎ জনগণের নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাকে পদদলিত করে 'কলাগাছ'কে ভোট দিতে বলার এই স্পর্দ্ধা শেখ মুজিবের হয়েছিলো—'ডলারের' গোপন খুঁটির জোরে। 'কলাগাছ'কে ভোট দিতে বলার অন্যতম আরো একটি কারণ ছিলো। আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কা টিকেটে যারা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলো—তাদের অর্দ্ধেকই হচ্ছে আয়ুবের কালো দশকের স্বার্থরক্ষাকারী রং-বেরঙের মুসলীম লীগার। এরা আয়ুবের অত্যাসন্ন পতনকে দেখেই 'কন্‌ভেনশন্ মুসলীম লীগ' থেকে পদত্যাগ করেছিলো এবং আওয়ামী লীগের প্লাটফরমে এসে দাঁড়িয়েছিলো। একথা সুবিদিত যে, ওই সব নয়া আওয়ামী লীগার প্রচুর কালো অর্থের বিনিময়ে নির্বাচনে নৌকা মার্কার প্রার্থীপদ প্রাপ্ত হয়েছিলো। এবং যারা স্থায়ী আওয়ামী লীগার—তাদেরও চরিত্র জনগণ জানতো ভালোভাবেই, আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার সময়ে এই সব আওয়ামী লীগাররা 'সোনা'র 'রূপা' সহ বহু রকমের জিনিস-পত্রের ইম্‌পোর্ট, এক্সপোর্ট লাইসেন্স পারমিট পেয়ে জনসেবার নামে নিজেরা রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হয়েছিলো। 'গ্যাম্‌লার' হিসেবেও এদের অনেকেই সুপরিচিত, শুধু স্মাগলারই নয়। সুতরাং জনগণ এদের চেহারা দেখেই আৎকে উঠেছিলো। এ জন্যেই শেখ মুজিবকে বলতে হয়েছিলো—'আমি কাকে দাঁড় করিয়েছি, সেদিকে তোমরা তাকিও না। আমি তোমাদের 'কলাগাছকে' ভোট দিতে বলছি; তোমরা কলাগাছকেই ভোট দাও।' উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে পূর্ববাঙলা টল্‌টলায়মান। 'জয়বাঙলা' 'জয়বাঙলা' ধ্বনিতে হাট-ঘাট-মাঠ মুখরীত। কিন্তু জনগণ এই মুখরতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি। জনগণ পেশাদারীদের প্রচারনায় প্রলুব্ধ হয়েছে মাত্র। পূর্ববাঙলার নিরক্ষর কৃষক সমাজ হাঁটে-হাঁটে বাজারে বাজারে দেখেছে—শেখ মুজিবের রঙীন প্রতিকৃতি নিয়ে (আওয়ামী লীগ নিয়োজিত) বয়াতীরা রঙীন পোশাক পরে—'নৌকা মার্কার' ও শেখ মুজিব, জয়বাঙলার গান গাইছে নেচে নেচে। দেখেছে হাজার হাজার পোস্টারে

শেখ মুজিবের বর্ণাঢ্য ছবি—নৌকা মার্কার পাশে। দেখেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকার প্রতীক যত্রতত্র টাঙানো। দেখেছে সেই নৌকা প্রতীকের পাশে শেখ মুজিবের ছবি টাঙিয়ে (মাজারের অনুকরণে) কৌটোয় করে পয়সা তোলার আকর্ষণীয় দৃশ্য। শুনেছে গাঁয়ের সরল মানুষকে সহজে আকর্ষিত করার ঝাঁক বাধা শ্লোগান—নৌকা চলে ভাইসা, ভোট দিমু ঠাইসা, শুনেছে—তোমার কি? নৌকা! আমার কি? নৌকা! ডাইনে কি? নৌকা! বায়ে কি?—নৌকা! আকাশে কি?—নৌকা! বাতাসে কি? —নৌকা! সামনে কি?—নৌকা! পেছনে কি?—নৌকা! শুনেছে—হেঁইও হেঁইও নৌকা-নৌকা। নৌকা চলে ভাইসা—ভোট দিমু ঠাইসা। নৌকা চলে বাইয়া—শেখ মুজিব নাইয়া।

এই প্রচারনার পেছনে হাজার হাজার নয়, লাখ লাখও নয়, কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। খরচ করার কৌশল বাতলানো হয়েছে। শহরে শহরে নিয়নের আলোয় নৌকার প্রতীক তৈরী করা হয়েছে। কাপড় দিয়ে, পিসবোর্ড দিয়ে পঁচিশ-তিরিশ গজ লম্বা নৌকার প্রতীক 'জয়বাঙলা' গেট করে তার মাথায় টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র লোকেরা খণ্ড-খণ্ড দলে 'জয়বাঙলা' ধ্বনিতে শহরের পথঘাট আচম্কা মুখর করে তুলেছে। জীপে চড়িয়ে—শেখ মুজিবকে মিছিল করে ঢাকার শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে। মিছিলের সামনে ও পেছনে চলেছে 'মাস্তানদের বেতাল নর্তন কুর্দন' আর 'জয়বাঙলা'র জিকির 'জয়বাঙলা' 'জয়বাঙলা'।

অন্য কোনো দল এই তাণ্ডব প্রচারের কাছে মাথা তুলে বলার সুযোগ পায় নি। বরং আওয়ামী গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে। মস্কোপন্থীরা (আওয়ামী লীগের বি টিম) শেখ মুজিবের স্তুতি গেয়ে। পারিষদ দল বলে তার শত গুণ-এর মতো মহিমা কীর্তন করে ভেবেছিলো মুজিব তাদের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠন করবে। কিন্তু মুজিব তাদেরকে বিদ্রূপ করে বললেন 'তোমরা সাইনবোর্ড পালটে দিয়ে আমার দলের সঙ্গে এসে যোগ দাও কারণ আমরা পরস্পরে যখন একই আদর্শ ও একই নীতিতে বিশ্বাসী, তখন আর আলাদা সাইনবোর্ড রাখার দরকার নেই'। শেখ মুজিব মস্কোপন্থীদের বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিলেন। মস্কোরা অভিমানে কেঁউ কেঁউ করে তাদের 'কুঁড়ে ঘরে'র মার্কা নিয়ে ভোট ভিক্ষে করতে লাগলো।

১৯৭০ সনের ১২ই নভেম্বর। পূর্ববাঙলার বুকে নেমে এলো মহাকালের

সর্বনাশা সামুদ্রিক গোর্কি। নোয়াখালী, সন্দীপ, হাতিয়া, ভোলা, পটুয়া খালী খুলনা ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গেলো প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা। কেউ জানলো না, বুঝলো না, সুযোগ পেলো না এই সর্বনাশা রাহুগ্রাসের খবর আর পেলো না আত্মরক্ষা করার এতটুকু অবলম্বন। রাত্রির অন্ধকারে ক্ষিপ্ত মেঘনা তার বাঁধ ভেঙে দিয়ে তিরিশ ফুট উঁচু ফনা মেলে ধেয়ে এলো জনপদের উপরে। এক রাত্রির আগ্রাসন। তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালো। আহত হলো সমধিক। আর বিস্তীর্ণ উপক্রুত অঞ্চলে কোনো ঘর-বাড়ি-গাছপালার চিহ্ন রইলো না। মাইলের পর মাইল ধোয়া, ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ। দেখে মনে হয় না যে, কোনোদিন, কোনোকালে এখানে মানুষের বসতি ছিলো। আর সব চাইতে মর্মান্তিক দৃশ্য হলো লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ স্তুপ হয়ে খড়ের গাদার মতোন উঁচু হয়ে থাকা। বাঁধের মুখে, কিম্বা অপেক্ষাকৃত উঁচু টিলার নিচে শত শত মৃত শিশুর লাশ জমা করা। দীর্ঘ তিন দিন এই অবিস্মরণীয় মর্মান্তিক ঘটনার কথা ঢাকার মানুষের কানে পৌছেনি। জানেনি পূর্ববাঙলার মানুষ। পৃথিবীর অন্য কেউ। খবর প্রচার হওয়ার সপ্তাহকাল পরেও—সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন উপক্রুত অঞ্চলের মানুষের কাছে কোনো রকম সরকারী সাহায্য গিয়ে পৌছালো না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তখন ঢাকায় হেলিকপ্টারে বসে (পাশে সুন্দরী এয়ার হোস্টেস ও মদের বোতল নিয়ে) ইয়াহিয়া কতিপয় অঞ্চলের কয়েকশো গজ উপর দিয়ে চক্কোর মেরে—সাহায্য তো দূরের কথা, কোনোরকম মন্তব্য না করে চোরের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে পাড়ি জমালো। এরপর আর কোনো রকম সারা শব্দ পাওয়া গেলো না তার। সারা বিশ্ব যখন মানবতার এই মর্মন্তুদ খবর পেয়ে স্তম্ভিত তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সরকারী সহানুভূতি তো এলোই না, কোনো রাজনৈতিক দলের ও একটা লোক ছুটে এলো না বিধ্বস্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে।

ছুটে গেলেন মওলানা ভাসানী উপক্রুত অঞ্চলে। দেখলেন ঘুরে ঘুরে সেই নারকীয় দৃশ্য। গলিত শবের গন্ধে টিকে থাকা দায়। বেঁচে থাকা পুরুষেরা সবাই প্রায় উলঙ্গ। মেয়েরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কলাগাছের ফাৎড়া দিয়ে বে আব্রু ইজ্জৎ ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মৃত্যু কামনায় রত। খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, সে এক বীভৎস দৃশ্য। আশ্চর্য, বেঁচে থাকা আত্মীয়-পরিজন-বন্ধু-বান্ধব স্বজাতি হারা মানুষগুলোর চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। শুকনো-ঠা-ঠা

চোখের মণি। কাঁদতে যেন ভুলে গেছে তারা। মেঘনার উন্মত্ত জলরাশি যেন তাদের সব কান্না ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। পায়ের নিচে লাশ। সামনে লাশ। পেছনে লাশ। ডাইনে-বায়ে-যতদূর তাকানো যায় শুধু লাশ আর লাশ। সেই দৃশ্য দেখে অস্থির হয়ে গেলেন মওলানা ভাসানী। ঢাকার পল্টন্ ময়দানে জনগণের কাছে সেই দৃশ্যের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন। সমগ্র সভাস্থলে কান্নার যেন শিস্ বেজে উঠলো। গর্জে উঠলেন আজীবন 'পাকিস্তানের সংহতি'র ধারক বাহক মওলানা ভাসানী। না, আর আমরা কাঁদবো না। আর আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখতে চাই না। আর আমার কোনো দফা নেই। চৌদ্দ দফা, একুশ দফা, এগারো দফা, অনেক দফা দফা করেছি। দফা দফা করেই আমাদের অবস্থা রফা হয়ে গেছে। আমাদের এই ঘোর দুর্দিনে আমরা কেন্দ্রের কোনো সাহায্য পাই নি; একটা রাজনৈতিক দলের নেতা কিম্বা কর্মী পর্যন্ত ঢাকার মাটিতে পা দেয় নি। আমরা তাহলে কিসের জন্যে 'সংহতি'র দোহাই দেবো কিসের জন্যে শক্তিশালী পাকিস্তান চাইবো? আমি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চাই। পশ্চিম পাকিস্তানকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি 'তোমরা তোমাদের মতো থাকো, আমরা আমাদের মতো থাকবো। আজ থেকে আমি পূর্ব পাকিস্তানকে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে ঘোষণা করছি। তিনি 'স্বাধীন পূর্বপাকিস্তান' শ্লোগান দেন ও জনগণ 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে চরম উত্তেজনাকর পরিবেশে তা সমর্থন করেন।

আশ্চর্য 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমানের ক্ষমতার সিংহাসনের লোভ। তিনি তাঁর দেশে এতবড়ো একটা 'জাতীয় বিপর্যয়' ঘটে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেও উপদ্রুত অঞ্চলে যাবার সময় পেলেন না। তিনি ঘুরে ঘুরে তখনো উত্তর বাঙলায় 'নির্বাচনী সভা' করে 'কলাগাছ'কে ভোট দাও বলে চিৎকার করছিলেন। এই সময় বিরোধী দল থেকে দাবী ওঠে—নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে 'জাতীয় দুর্যোগ' ঘোষণা করে উপদ্রুত অঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে বললেন "ত্রিশ লক্ষ মানুষ মরেছে, নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করলে, আরো দশ লক্ষ মানুষ জীবন দেবে।"

শেখ মুজিবের এই ঘোষণায় বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ত্রিশ লক্ষ মানুষের লাশের উপর দিয়ে হেঁটে শেখ-

মুজিব নির্বাচনে অংশ নেবেন, এবং তখনো পর্যন্ত তিনি উপদ্রুত অঞ্চলে যেতে সময় পাননি, এই সব কারণে—আওয়ামী লীগের তরুণ ছাত্রকর্মীদের মধ্যেও চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। কি করে শেখ মুজিব নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবীকে 'ষড়যন্ত্র' বলে আরো 'দশলক্ষ মানুষ জীবন দেবে' বলে হুমকি দিতে পারলেন—এই নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। আমার একটা ঘটনার কথা মনে আছে; ঢাকার নারায়ণগঞ্জে সারোয়ার জুট মিলের বাঙালী মালিক মুস্তাফা সারোয়ার আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী তরুণ নেতা। তিনি কিছু সাহায্য সামগ্রি নিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়ে স্বচক্ষে ঘটনার মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে—দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় একটা রিপোর্ট ছাপতে দেন, কিন্তু নির্বাচন ব্যাহত হবে এই আশঙ্কায় 'ইত্তেফাক' ওই রিপোর্টটি না ছেপে চেপে দেয়। মুস্তাফা সারোয়ার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন 'অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান' (আমি ওই কাগজের নিউজ এডিটর ছিলাম) অফিসে এসে উপদ্রুত অঞ্চলের অসহায় মানুষদের দুর্দশার একটি করুণ রিপোর্ট আমাকে দিয়ে তা প্রকাশ করার অনুরোধ জানান। এবং তখনো শেখ মুজিব 'উপদ্রুত অঞ্চলে' না গিয়ে নির্বাচনী সভা করায় তিনি তীব্রভাবে তার সমালোচনা করেন। 'ইত্তেফাক' তার রিপোর্টটি চেপে দেয়ায় ওই পত্রিকার তৎকালীন কার্যকরী সম্পাদক সিরাজুদ্দিন হোসেন ও তার সম্পাদক মইনুল হোসেনের 'গণবিরোধী' ভূমিকার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শেখ-সাহেবকে আমরা অনেক বুঝিয়েও তাকে উপদ্রুত অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারি নি। বরং উল্টে তিনি (মুজিব) চোখ রাঙিয়ে আমাদেরকেই নির্বাচন বানচাল্‌কারী বলে গালাগাল দিয়েছেন। জনাব সারোয়ার আমাকে বললেন—'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে শেখ সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনো ভালো কথা বললেও তিনি তা উল্টো করে দেখছেন।' আমি কোনোরকম মন্তব্য না করে জনাব সারোয়ারকে আশ্বাস দিয়েছিলাম তার রিপোর্টটি আমি ছাপবো। এবং আমি তা ছেপে ছিলাম 'চিঠিপত্র' কলামে। যদিও ওই রিপোর্টটির মধ্যে 'আওয়ামী লীগই একমাত্র সাহায্য করছে' এই রকম স্তুতি ছিলো।

পরে অবশ্য শেখ মুজিবের হুমকিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী শিবিরে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ায় শেখ মুজিব সেই দ্বন্দ্ব নিরসন করতেই (মানবতার সেবার জন্যে নয়) উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করতে যান। এবং দুঃসহ মানুষদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করার বড়ো বড়ো ছবি—'ইত্তেফাক' মুজিবের অনুগত 'পিপল্‌স' ও

অন্যান্য আওয়ামী লীগের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে চমকপ্রদ ক্যাপশন ও হেডিং দিয়ে আকর্ষণীয় ফিচারের মতো মুজিবের মহিমা প্রচার শুরু করে। এই প্রচারনা যে নির্বাচনী প্রচারেরই অঙ্গ, এটা বামপন্থী শিবির ও সচেতন বুদ্ধিজীবি ও জনগণ বুঝতে পারেন। আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাঙলার এই দুর্দিনে কোনোরকম সাহায্য সহযোগিতা ও লোকজন না আসায় এবং ৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকার পলটন ময়দানে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে 'স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান' ঘোষণার ফলে সৃষ্ট পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী জনগণের সেন্টিমেন্ট ওই সময় শেখ মুজিবের 'জয়বাঙলা' শ্লোগানকেই আরো শক্তিশালী করে তুললো। অর্থাৎ এই 'মানবিক বিপর্যয়' শেখ মুজিবের জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ ফলশ্রুতি এনে দিলো। ওই সময় মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের শ্লোগানকেই জনপ্রিয় করে তুললো। মওলানা ভাসানী যদি ভাবাবেগে পরিচালিত না হয়ে ওই সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক হওয়ার ডাক দিতেন, তাহলে পূর্ববাঙলায় 'উগ্র জাতীয়তাবাদ' এর ভিত্তি এত সহজেই মজবুত হয়ে উঠতে পারতো না।

ওই সময় 'সাহায্যে'র নাম করে 'ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায়' আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী করা হয়। এটা ছিলো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই কৌশল মাত্র। আমেরিকা থেকে হেলিকপ্টার ও এরোপ্লেন নিয়ে 'সাহায্য' করার আড়ালে (সমুদ্রপকূলের সন্দীপে বহুদিন থেকেই সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে ইচ্ছুক) মার্কিনী সৈন্যরা তাদের সামরিক কার্যকলাপ চালাতে থাকে। অঞ্চল সমূহের ছবি ও ম্যাপ নিতে শুরু করে। মার্কিনী ও ব্রিটিশ সৈন্যরা দীর্ঘদিন এদেশে অবস্থান করার জন্যেই এসেছিলো ; সুযোগ পেলে হয়তো একেবারেই থেকে যেতো ; কিন্তু বামপন্থীরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন, অবিলম্বে সমস্ত বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করার দাবী জানাতে থাকেন। জনগণের মধ্যেও বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবীতে। ফলে মার্কিনী ষড়যন্ত্র সফল হতে পারলো না। পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করলে অবশেষে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। অবশ্য ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন অবধি বিদেশী সেনাবাহিনী পূর্ববাঙলায় অবস্থান করেছিলো।

বারো

একটু পিছিয়ে গিয়ে আমি আলোচনা করবো ভাসানী-তোয়াহা বিরোধ ও তার পরিণতি সম্পর্কে। মওলানা ভাসানী ৬৯' সনে পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে জামাতে ইসলামির গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে 'সমাজতন্ত্র' শব্দের সঙ্গে 'ইসলামিক' শব্দটি জুড়ে দিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত করেন। এই বক্তব্য নিয়ে 'ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর মধ্যেও নানা রকম প্রশ্ন ওঠে। যদিও মওলানা ভাসানী ই.পি.সি.পি.এম.এল-এর কেউ নন, তবুও পার্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মওলানা সাহেব কখনোই কোনো রকম কাজ করেন নি। প্রকাশ্যেও পার্টির শ্লোগানকে হেয় করেন নি কিম্বা তার বিরুদ্ধে পাল্টা শ্লোগানও উত্থাপন করেন নি। ১৯৫৭ সনের পরে এই প্রথম তিনি সমাজতন্ত্রে'র সঙ্গে 'ইসলামিক' শব্দ ব্যবহার করে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সূত্রপাত করেন। মোহাম্মদ তোয়াহা এ সম্পর্কে মওলানা সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলে, মওলানা সাহেব বলেন এটা একটা সাময়িক কৌশলমাত্র। এবং তার ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি যুক্তি দেখান যে, সমগ্র দেশে, বিশেষ করে পূর্ববাঙলায়— আমেরিকার টাকা খেয়ে জামাতে ইসলাম ইন্দোনেশিয়ার মতো এখানেও কমিউনিষ্ট হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, এবং তিনি কমিউনিষ্টদের পক্ষে কাজ করছেন বলেই শাহীওয়াল রেল স্টেশনে জামাতী গুণ্ডারা তাঁর উপরে হামলা চালিয়েছিলো, এবং যেহেতু জামাতে ইসলাম প্রচার করছে যে, কমিউনিষ্টরা পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু, সেই হেতু 'সমাজতন্ত্রের' সঙ্গে তিনি ইসলামিক শব্দটি কৌশলগত কারণেই ব্যবহার করেছেন ও করছেন।

মওলানা সাহেবের এই ব্যাখ্যাকে ই. পি. সি. পি. এম. এল. 'কৌশলগত কারণেও' গ্রহণ করতে রাজি হলো না। কারণ কমিউনিষ্টরা কখনো জনগণের কাছে ভুয়ো দর্শন তুলে ধরে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। বিশেষ করে রাজনৈতিক বক্তব্যের ব্যাপারে কোনো বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কখনোই গোজামিল দিতে পারে না। মতাদর্শগত সংগ্রামের পতাকাকে তুলে ধরার জন্যেই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির জন্ম। শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সুখী সমৃদ্ধিশালী শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই হলো এই পার্টির লক্ষ্য। সুতরাং সেই

মহান পার্টির পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িক কিম্বা ধর্মীয় শ্লোগান ব্যবহার করার অর্থই হলো—শ্রমিক শ্রেণীর সুস্থ আন্তর্জাতিকতার বিরোধীতা করা। পার্টির এই সঠিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে—পার্টি বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা (আবদুল মতিন-আলা-উদ্দীন, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার ও অন্যান্য) মওলানা সাহেবকে উল্টো করে বোঝালেন যে মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখ তাঁকে (ভাসানীকে) কোনঠাসা ও ন্যাপ-কৃষক সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র করছে। ইতিমধ্যে সি. আই. এ-র 'দলিল'কে কেন্দ্র করে বিরোধের জট অনেকখানি পাকিয়ে উঠেছিলো; সন্তোষের কৃষক সম্মেলনে ভাসানী প্রকাশ্যভাবে প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তির দৃষ্টিভঙ্গীতে মোহাম্মদ তোয়াহাকে সি. আই. এ-র এজেন্ট হিসেবে মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত করেন এবং বলেন—তোয়াহারা এই জন্যেই সন্তোষ কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত হয় নি।

মওলানা সাহেবের ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন। ২০শে জানুয়ারী ১৯৭০ সন—ই. পি. সি. পি. এম. এল—বহু আগে থেকেই ঢাকা শহরে এক ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো। ১৯৬৯ সনে পার্টির ক্যাণ্ডিডেট মেম্বার কমরেড আসাদুজ্জামান বুকের রক্ত দিয়ে যে মহান গণ অভ্যুত্থানের সূচনা করে ছিলেন (শহীদ হওয়ার অব্যবহিত পরেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে পূর্ণ সদস্য বলে গ্রহণ করে) এবং 'জনগণতন্ত্র' শ্লোগানকে পূর্ববাঙলার জনগণের কাছে রক্তাক্ষরে পৌঁছে দেয়ার যে, মহান আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সমগ্র পূর্ববাঙলা 'আসাদ' নামের মহান দ্যোতনার সঙ্গে এই জন্যেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলো। আগেই বলেছি—আসাদ শহীদ হওয়ার পরে—সে কেবল একটি ব্যক্তির নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, 'আসাদ' একটি 'সংগ্রাম' এর নাম হয়ে সাড়ে সাতকোটি মানুষের মুখে মুখে প্রতিক্রিয়ার দুর্গে আঘাত হানার হাতিয়ার হিসেবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সুতরাং কমরেড আসাদ-এর মহান 'জনগণতন্ত্র' এর সংগ্রাম পতাকাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে তাঁর শহীদ হওয়ার পরবর্তী বছর ১৯৭০ সনের ২০শে জানুয়ারী পার্টি এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ২০শে জানুয়ারী ঢাকায় হরতাল আহ্বান করা হয়, (সম্পূর্ণ কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী'র নেতৃত্বে) এবং বিকেলে জনসভা আহ্বান করা হয়।

ওই সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে ইয়াহিয়া খানের 'নির্বাচন' নিয়ে চরম মতবিরোধ শুরু হয়েছিলো। মোহাম্মদ তোয়াহা ন্যাপকে নির্বাচনের

নামে ইয়াহিয়ার প্রদত্ত প্রহসনে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার প্রস্তাব দেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ববাঙলার জনগণের যে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, পরিপূর্ণ মুক্তির জন্যে প্রয়োজন 'শ্রেণী সংগ্রাম'—এই বক্তব্যকে ন্যাপ জনগণের সামনে তুলে ধরে—বুর্জোয়া নির্বাচনের মোহ থেকে জনগণকে মুক্ত করে বিপ্লবী পতাকাতলে সমবেত হওয়ার ডাক দিক—মোহাম্মদ তোয়াহা এটাই ন্যাপকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, অবশ্য 'ন্যাপ' সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পেটি বুর্জোয়া সংগঠন হিসেবে ওই বক্তব্য নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হোক—তোয়াহার প্রস্তাব ছিলো এই কৌশলেরই অঙ্গমাত্র। কিন্তু ন্যাপে অবস্থানরত নির্বাচন অভিলাষী অংশ এই বক্তব্যের বিরোধীতা করে, মওলানা ভাসানী নিজেও কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে (১৯৭০ সনের ২০শে জানুয়ারীর পরে) ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেবে কি নেবে না এই নিয়ে ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটি ঢাকায় মিলিত হয়। বহু বিতর্কের পরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভোটাভুটি হয়। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে নির্বাচনপন্থীরা প্রায় এগারো ভোট (হাজি দানেশ, মশিউর রহমান, নূরুল হুদা, কাদের বকস্, আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ) মোহাম্মদ তোয়াহার প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে দশ ভোট এবং 'বিপ্লবী' মতিন-আলাউদ্দীন সাহেবদের হাতে তিনটি মূল্যবান ভোট থাকা সত্ত্বেও—সম্ভবতঃ ন্যাপে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্টিত হওয়ার কথা ভেবেই তারা তোয়াহার নির্বাচন বিরোধী বক্তব্যের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট না দিয়ে তথাকথিত 'নিরপেক্ষতা'র মুখোশে স্বরূপ ঢেকে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ওই ভোট তিনটি তোয়াহার স্বপক্ষে দেয়া হলে—নিশ্চিতভাবেই ন্যাপ-এর মতো অতবড়ো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভাঙন নিরসন হতো। ন্যাপ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তো না। ন্যাপ নির্বাচনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করলে—ই. পি. সি. পি. এম. এল. এর পক্ষে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামকে আরো অনেক বেশী তীব্রতর করা সম্ভব হতো। কিন্তু মতিন-আলাউদ্দীন-দেবেন-বাশার এরা নির্বাচনের বিরোধী বক্তব্য প্রচার করা সত্ত্বেও-প্রয়োজনের সময় মোহাম্মদ তোয়াহার নির্বাচন বিরোধী প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোটদান না করে ওই সময় মূলতঃ প্রতিক্রিয়ার হাতকেই শক্তিশালী করে ছিলেন। এবং চরম এক বিভ্রান্তির বিপাকে পড়ে মওলানা ভাসানী নিজেও কখনো নির্বাচন করবো কখনো নির্বাচন করবো না, কখনো শান্তি, কখনো

সংগ্রাম ··নানা অসংগঠিত-অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে জনসাধারণের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন।

২০শে জানুয়ারী 'আসাদ' দিবস পালন করার আহ্বান জানালে মওলানা ভাসানী ওই একই সময়ে সন্তোষে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষনা করেন। ফলে তোয়াহা সমর্থক ও ভাসানী সমর্থকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করে যে, তাঁদের পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্তের কথা জেনেও মওলানা সাহেব ওই একই দিনে কৃষক সম্মেলন করার কথা ঘোষনা করে মূলতঃ কমরেড আসাদ ও কমিউনিষ্ট পার্টিরই বিরোধীতা করেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ২০শে জানুয়ারীতে পল্টনের জনসভায় সর্বপ্রথম 'নির্বাচনের' বিরুদ্ধে বিপ্লবী বক্তব্য উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। সুতরাং ইচ্ছে থাকা সত্বেও পার্টির সংগ্রামী কমরেডগণ কেউই ওই ঘোরতর দুর্দিনে (যখন সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীলরা নির্বাচনের 'টোপ' গিলে বিপ্লব বিরোধীতায় অত্যন্ত নগ্নভাবে ঐক্যবদ্ধ) পার্টির ওই বক্তব্যকে জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এড়িয়ে সন্তোষের কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি। ২০শে জানুয়ারীকে সফল করার জন্যে প্রায় একমাস আগে থেকেই পার্টির বিভিন্ন প্রকাশ্য ফ্রন্ট ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করে। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট 'উন্মেষ সাহিত্য সংসদ' সমগ্র ঢাকা শহরে তিন সপ্তাহ ধরে ব্যাপক প্রচারনায় অংশ নেয় এবং গণসঙ্গীত ও পথসভার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ২০শে জানুয়ারীর গুরুত্ব অনুধাবনে সফলতা লাভ করে। এব্যাপারে মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক কর্মীদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে হেঁটে ১৯শে জানুয়ারীর মাঝরাত্রি থেকে ২০শে জানুয়ারী মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সমগ্র ঢাকা শহরে ঘুরে ঘুরে 'হরতাল'কে সফল করে তোলেন। এমনকি মার্কিন অ্যাম্বেসীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইউ. এস. আই. এস.-এর সামনে 'হরতাল' অমান্য করে গাড়ি নিয়ে পথে বেরুলে কমরেড আবদুল হক স্বয়ং ক্রুদ্ধ হয়ে ওই গাড়ির গতিরোধ করেন। উত্তেজিত কর্মীরা গাড়িটির উপরে হামলা চালিয়েও গাড়িটির কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। গাড়িটি ছিলো ফায়ার ও বুলেট প্রুফ। ওই সময় পুলিশের সঙ্গে পার্টি কমরেডদের হাতাহাতি হয়, এবং কয়েকজন কমরেডকে পুলিশ গ্রেফতার করে, ওই সুযোগে মার্কিনী অফিসারটি গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সঙ্গে সঙ্গে তোয়াহার হস্তক্ষেপে পুলিশ ভীত হয়ে কমরেডদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

হাজারো প্রতিকূলতা সত্বেও সফল হরতাল পালিত হলো সমগ্র ঢাকা শহরে। বিকেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লক্ষাধিক জনতা সমবেত হলো পল্টনের জনসভায়। পার্টির নির্বাচন বিরোধী বক্তব্যকে আগুন ঝরানো কথায় ব্যক্ত করলেন কমরেড আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা। নির্বাচনের ভাওতাবাজী'র বাক্সে লাথি মেরে—জনগণকে কমরেড আসাদ-এর জনগণতন্ত্রের রক্তাক্ত পতাকাকে নিয়ে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানালে জনতা বিপুল করতালী দিয়ে নির্বাচন বিরোধী বক্তব্যকে সমর্থন জানায়। কমরেড আবদুল হকের অগ্নিঝরা বক্তৃতায় যখন সমস্ত পল্টন ময়দান উত্তেজিত, চোখে যখন তাঁদের শোষক ও শাসক শ্রেণীর প্রতি হিংসার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে; ওই সময় সন্তোষ কৃষক সম্মেলন থেকে মতিন-আলাউদ্দীন-দেবেন-বাশার সমর্থক 'লালটুপি' পরিহিত ও লাঠিধারী কিছু লোক মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে 'কৃষকের নয়ন মণি মওলানা ভাসানী' 'শ্রমিকের নয়ন মণি মওলানা ভাসানী, বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে কমরেড আবদুল হকের বক্তৃতায় বারংবার বিঘ্ন ঘটাতে শুরু করে। ফলে সভার কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। এ ব্যাপারে মোহাম্মদ তোয়াহা গোলোযোগকারীদের উদ্দেশ্যে শান্ত থাকার আবেদন জানালে—'লাঠিধারীরা' আরো বেশী চিৎকার করে 'শ্লোগান' দিতে থাকে। এবং মোহাম্মদ তোয়াহার 'কল্লা' ছিড়ে ফেলা হবে বলে তারা শাসাতে থাকে। পার্টি কমরেডরা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তোয়াহা তাতে বাধা দান করেন। কিন্তু জনগণ সেই বাধা না মেনে গোলোযোগকারীদেরকে উত্তেজিত হয়ে ধাওয়া করলে—প্রাণ ভয়ে 'লাঠিধারীরা' ছুটে পালিয়ে যায়। পরে সভার কাজ নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়।

ন্যাপ'এর 'নির্বাচনে' অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত, মোহাম্মদ তোয়াহাকে সি. আই. এ-এর এজেন্ট বলা, ও ন্যাপ ক্রমশই প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পরে চলে যাওয়া, মওলানা ভাসানীর 'ইসলামিক সমাজতন্ত্র'—ইত্যাদি কারণে মোহাম্মদ তোয়াহার পক্ষে কোনো ক্রমেই আর ন্যাপ-এর সম্পাদক পদে বহাল থাকা, কিম্বা ন্যাপ' এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব ছিলো না। ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি ন্যাপ থেকে পদত্যাগ করলেন। অবশ্য সুদীর্ঘ বক্তব্য হাজির করেই তিনি পদত্যাগ করলেন। এবং ঘোষণা করলেন—শ্রেণী সংগ্রামের পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন। ন্যাপ থেকে তোয়াহার পদত্যাগ ও শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দেওয়ার ফলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীদের মধ্যে 'দুর্ভাবনা'র সৃষ্টি হয়।

বি. বি. সি. থেকে পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচার করা হয়। মাথা খারাপ হয়ে যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। শেখ মুজিব শঙ্কিত হয়ে ওঠেন—'নির্বাচন' বানচাল হওয়ার অহেতুক আতঙ্কে। প্রতিক্রিয়ার অনুগামী কাগজের সংবাদিকরা 'প্রকৃত খবর' জানার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে থাকেন ভোয়াহার সঙ্গে। তাদের নানা প্রশ্ন—কি করবেন তিনি? নতুন পার্টি করবেন কি না? কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করবেন কি না? (যদিও তারা জানতো যে তোয়াহা কমিউনিষ্ট পার্টি করেন) বিপ্লবের ডাক দেবেন কি না? অবসর গ্রহণ করবেন কি না? দেশের ভবিষ্যত কি হবে? নানা প্রশ্ন তোয়াহার সামনে। আর সেই সব প্রশ্নের জবাবে তোয়াহা বলেছেন—আমার নতুন কিছু বলার নেই। আমি আমার বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি। তবে হাঁ—নির্বাচনের প্রতি তার সামান্যতম আস্থা নেই। নির্বাচন দিয়ে দেশের কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তি আসবে না, আসতেও পারে না। পৃথিবীর কোথাও তেমন দৃষ্টান্ত নেই। তিনি শ্রেণী সংগ্রাম বিশ্বাস করেন। একমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই শ্রেণীহীন শোষণহীন—কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশকে তার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের লীলাভূমি হিসেবে ব্যবহার করছে। শুধু তাই নয়, গণচীনের বিরুদ্ধে ও আমাদের বিরুদ্ধে—দক্ষিণ ভিয়েতনামের 'দালাল সরকার' এর মতোন এখানে কোনো 'দালাল সরকার' গঠন করে পূর্ববাঙলাকে ভিয়েতনাম তৈরী করার ষড়যন্ত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খুবই তৎপর। সুতরাং বামপন্থীরা ওই রকম সাম্রাজ্যবাদী নির্বাচনের শিকার হতে পারে না। জনগণকে এই চক্রান্তমূলক নির্বাচন থেকে মোহমুক্ত করাই হলো—পূর্ববাঙলাকে রক্ষা করার একমাত্র গ্যারান্টি।

মার্কিন অ্যামবাসীর প্রেস ডিপার্টমেন্ট থেকেও কয়েকজন ওই সময় তোয়াহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তোয়াহা তাদেরকে সাক্ষাৎ দান করেন নি। তারা কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী'র মুখপত্র 'গণশক্তি' পত্রিকার অফিসে এসে পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। পরে 'নির্বাচন বানচালকারী'-দের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গবন্ধু' সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। এবং 'যে কোনো কায়েমী স্বার্থের' হাতকে ভেঙে দেয়া হবে বলে (কমিউনিষ্টদের) তিনি আস্ফালোন দেখান। শেখ মুজিবের ওই আস্ফালোন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই পরামর্শের

ফল ; তা বুঝতে কারোরই কোনো অসুবিধে হয় নি। ওই একই সময়ে কৃষক সমিতির সম্পাদকের পদ থেকেও কমরেড আবদুল হক পদত্যাগ করেছিলেন। ন্যাপ কৃষক সমিতির দুই স্তম্ভের তোয়াহা-আবদুল হক-এর পদত্যাগের ফলে—ওই দুই সংগঠনই পরে 'নেতৃত্বের কোন্দলে' ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী দুর্বল হয়ে পড়েন। এবং ন্যাপ-এর সম্পাদকের পদে (গুলি করে কৃষক হত্যাকারী) কুখ্যাত মশিউর রহমানকে নিয়োজিত করেন—মতিন-আলাউদ্দীন-দেবেন-বাশাররা। 'কমরেড মশিউর রহমান' বলে মতিন-আলাউদ্দীন সাহেবরা খুনী মশিউর রহমানের মতোন একজন কুখ্যাত সামন্ত শোষককে ন্যাপ' এর সম্পাদক বলে বরণ করে নিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ তোয়াহা ন্যাপ থেকে পদত্যাগের পরে—গ্রামে গ্রামে গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ খুবই দ্রুত ভাবে শুরু হয়। এবং শহর ছেড়ে দিয়ে পার্টির কমরেডরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকে শুরু হয় বিপ্লবী জোয়ার, তুমুল উদ্দীপনা। কৃষি বিপ্লবের শ্লোগানে, 'শ্রেণী শত্রু' নির্মূল করার লড়াইয়ে গ্রাম বাঙলা দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। প্রতিক্রিয়াশীলরা কিছুতেই রুখতে পারলো না জনগণের সেই মহান লড়াইকে।

তেরো

তিরিশ লক্ষ মানুষের লাশের উপরে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব নির্বাচনে অংশ নিলেন। না, প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের ৭ই ডিসেম্বরের আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচনের তারিখ আর পিছিয়ে দেয়নি। নির্বাচন হলো যথা সময়ে। ৭ই ডিসেম্বর শেখ মুজিবের ভোট বিজয়ের মধ্যে দিয়ে সূচীত হলো—পূর্ববাঙলার ভাগ্যাকাশে অশুভ রক্তাক্ত ভবিষ্যতের বীজ। পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের ঘোষণায় জানানো হলো—মোট ভোটের শতকরা তেত্রিশভাগ পেয়েছে আওয়ামী লীগ, অন্যান্য দল পেয়েছে শতকরা ১৭ ভাগ, জাল ও বাতিল ভোট শতকরা ছয় ভাগ, গৃহীত ভোটের সর্বমোট পরিমান হলো শতকরা ৫৬ ভাগ। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিলো ৩০০টি। তার মধ্যে পূর্ববাঙলার আসন সংখ্যা ছিলো ১৬৩টি। আওয়ামী লীগ ১৬৩টি আসনের মধ্যে লাভ করে ১৬১টি। অর্থাৎ জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর

পিপলস্ পার্টি লাভ করে ১৩৭টি আসনের মধ্যে ৮০টি। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে জুল্‌ফিকার আলী ভূট্টো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাঞ্জাব ও সিন্ধেই ভুট্টো বেশী আসন লাভ করে।

পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর পাহারাদার ইয়াহিয়া খান মনে করেছিলো যে, পূর্ববাঙলার আওয়ামী লীগ কিছুতেই একশো কুড়ি থেকে পঁচিশটির বেশী আসন পাবে না। রঙবেরঙের মুসলীম লীগ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি পূর্ববাঙলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানে যে সব আসন লাভ করবে, তাদের দিকে 'ঐক্যফ্রন্ট' তৈরী করে—শেখ মুজিবকে ক্ষমতায় আসতে বাধা দেয়া সম্ভব হবে, কিম্বা 'বখ্‌রার' ভাগাভাগী করে—আপোসের পথে পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর শোষণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যাবে। এবং নতুন সরকারের মাধ্যমে প্রতিহত করা যাবে পূর্ববাঙলার বিপ্লবী পরিস্থিতি। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিষ্টদের বিপ্লবী অভিযানকে নির্মূল করার জন্যেই এই 'নির্বাচন' অনুষ্ঠান। কিন্তু তবুও পাকিস্তানের উভয় অংশের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাত শেখ মুজিবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ফলে খুবই প্রকট হয়ে উঠলো। মুজিব ক্ষমতায় এলে যদিও পূর্ববাঙলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করতো, কিন্তু তার পশ্চিম পাকিস্তানী সেবাদাসেরা এতে বিরূপ হতো, ও মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে তাদের চরম বিরোধ শুরু হয়ে যেতো। ফলে—দিশাহারা ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে খুশী করার (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে খুশী করার) জন্যে নতুন এক ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিলো। ৩রা মার্চ '৭১, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিলো। ভুট্টো বাগড়া দিলেন তাতে। তিনি বললেন—যদি আওয়ামী লীগ এককভাবে পরিষদের অধিবেশন ডাকে, ও এককভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়, শাসনতন্ত্র রচনায় যদি তার দলের পরামর্শ না নেয়া হয়, এবং যৌথভাবে আপোস-আলোচনার মাধ্যমে সরকার গঠন না করা হয়, তাহলে তিনি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে 'হরতাল' ধর্মঘট আহ্বান করে প্রশাসন ব্যবস্থা অচল করে দেবেন। ৩রা মার্চ অধিবেশন ডাকার আগে—শেখ মুজিব ও তার দলের মধ্যে অবশ্যই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। সুযোগ পেয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবী ঘোষণা করে। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে—পূর্ববাঙলায় তীব্র গণ অসন্তোষ দেখা দেয়।

নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েই আওয়ামী লীগ থেকে বলা হচ্ছিলো যে,যে সমস্ত দল 'ছয়দফা'র একটি দফারও বিরোধীতা করবে—আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনায় বসবে না। আওয়ামী লীগের এই বক্তব্য যে অন্য দল ও মতকে পর্যুদস্ত করার জন্যেই ; তাতে সন্দেহ নেই। নির্বাচনে কিছু আসন প্রাপ্ত দল সমূহের সবাই 'ছয়দফা' বিরোধী। সুতরাং আলোচনায় তারা যে 'ছয়দফা'র রদবদল দাবী করবেই—এবং দাবী করাটাই যে স্বাভাবিক এ কথা জেনেই আওয়ামী লীগ এই ধরণের বক্তব্য তুলেছিলো। অর্থাৎ 'চাপ' সৃষ্টি করে ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে ক্ষমতার হালুয়া রুটি ভাগাভাগির আসরে 'ছয়দফা'র সমর্থক হিসাবে হাজির হতে বাধ্য করা। অন্যথায় তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা নয়। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে জেড, এ, ভুট্টো বলে উঠলেন—"পিপলস্ পার্টির কার্যকরী অংশ গ্রহণ ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র বা সরকার গঠন সম্ভব নয়।" সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধং দেহী চেহারা নিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দিন আহমেদ হুংকার দিয়ে উঠলেন—"একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হিসেবে কারো সহযোগিতা কিম্বা অংশগ্রহণ ছাড়াই আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র রচনা ও সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখে।"···ভুট্টো বললেন—"সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের রায়, মেনে নিতে রাজি আছি। আমি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আসার সবরকম চেষ্টা করবো।" এই ভাবে ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগাভাগির ব্যাপারে—কখনো গরম, ও কখনো নরম—ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে "স্নায়ু যুদ্ধ" চলতে থাকে। এবং যতই দিন যেতে থাকে, পরিস্থিতি ততই গুরুতর আকার ধারণ করতে থাকে। রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞার দিক থেকে শেখ মুজিব যেমন অন্তঃসারশূন্য ; তেমনি ভুট্টোও ভাবপ্রবণ। বলতে গেলে ওই সময় ভুট্টোর রাজনৈতিক বয়স মাত্র আড়াই বছর। আয়ুবের আমলে তরুণ ভুট্টো বেশ কয়েক বছর মন্ত্রী ছিলেন। অবশ্য জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রী নন। দেশে সুস্থ রাজনীতির বিকাশে দমন-পীড়ন থাকাকালীন—মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্যে জনগণের কাছে দায়ী ছিলেন না। তারা দায়ী ছিলেন আয়ুব খানের কাছে। মন্ত্রীত্ব ছিলো আয়ুবের নীতি অনুসরণ করার চাকরী মাত্র। কাজেই মন্ত্রীরা আয়ুবের কাছেই দায়ী ছিলেন। এ জন্যেই ভুট্টোর সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। পাক-ভারত যুদ্ধ ও 'তাসখন্দ চুক্তি'কে কেন্দ্র করে আয়ুবের সঙ্গে ভুট্টোর চরম বিরোধ দেখা দেয়। যার পরিণতি হিসেবে তার মন্ত্রীত্ব চলে যায়। পরে ১৯৬৮ সনের

শেষার্ধে এসে ভুট্টো সাহেব পিপলস্ পার্টি গঠন করেন। 'তাসখন্দ' চুক্তির বিরোধীতা করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানে—বিশেষ করে "ক্ষমতার দুর্গ" পাঞ্জাবের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের কাছে এবং জনসাধারণের কাছেও ভুট্টো সাহেব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ওই সময় দেশে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠায়, জায়গীরদারী ও মুৎসুদ্দি পুঁজির পেষনে অতিষ্ঠ মেহনতি জনতার সামনে গিয়ে ভুট্টো সাহেব সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দেন। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামও শক্তিশালী পাকিস্তানের কথাও বলেন। এই সব শ্লোগানে আবেগ-প্রবণ ভুট্টো সাহেব খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এবং আয়ুবের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন সৃষ্টি করেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে। আয়ুব তার এককালীন 'ব্লু আইড চাইল্ড'এর এই ঔদ্ধত্যের জন্যে গ্রেফতার করে বেশ কিছু সময় কারারুদ্ধ রাখে। ভুট্টো সাহেব পিপলস্ পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই তার পার্টিকে প্রগতিশীল বলে প্রচার করছিলেন। এবং তার স্বীয় সাংগঠনিক চাতুর্য ও পিপলস্ পার্টির জনপ্রিয়তায় বহু পুঁজিপতি জমিদার জায়গীরদার, ও সৌখিন বামপন্থীরা তার দলে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে। দুই শ্রেণীর সমন্বয়ে পিপলস্ পার্টি গড়ে ওঠে। এক শ্রেণী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করে তাদের শোষণকে নতুন ভাবে অব্যাহত রাখতে চায়, অন্য শ্রেণী (তরুণেরা) যথাযথ ভাবেই বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণ ও পীড়নের অবসান কামনা করে। যার জন্যে ভুট্টো সাহেবকে মাঝে মাঝেই পার্টি সামলাতে অস্থির হতে হয়েছে। তাই মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর মতানৈক্যের ফলে—বামপন্থী ছদ্মবেশী জমিদার-জায়গীরদার-পুঁজিপতিরা শঙ্কিত হয়ে ভুট্টোর উপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে আপোস রফার মাধ্যমে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার। নইলে তারা পিপলস্ পার্টিতে থাকবে কি থাকবে না তা বিবেচনা করার হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। স্বার্থের প্রয়োজনে তারা মুজিবের সঙ্গেও হাত মেলাতে রাজি আছে বলে ভুট্টো সাহেবকে ভীতি প্রদর্শন করে।

সুতরাং তাদেরকে সামাল দেয়ার জন্যেই ভুট্টোকে বলতে হলো "পিপলস্ পার্টির কার্যকরী অংশ গ্রহণ ছাড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কিম্বা সরকার গঠন করা সম্ভব নয়।" ভুট্টো সাহেবের বিপদ শুধু এখানেই শেষ নয়; তিনি নির্বাচনে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশেই বেশী ভোট পেয়েছিলেন; পাঞ্জাব প্রদেশে তথাকথিত 'ইসলাম পসন্দ্‌দের' দুর্গ ভেঙে দিয়ে তিনি 'হিরো' হয়েছেন; পাঞ্জাবের সমর্থন হারানোর অর্থ হলো ভুট্টোর জীবনে চরম রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি

হওয়া। এ জন্যেই তিনি পাঞ্জাবকে সান্ত্বনা দেয়ার 'কৌশল' হিসেবে বললেন "Panjab and sind is Bastion of Power" অর্থাৎ "পাঞ্জাব ও সিন্ধুই হলো ক্ষমতার দুর্গ।" সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ করে পালটা হুংকার দিয়ে উঠলো—"পাঞ্জাব, সিন্ধু আর ক্ষমতার দুর্গ নয়। সে দুর্গ ভেঙে দেয়া হয়েছে। এবং এই দুর্গ ভেঙে দেয়ার জন্যেই পূর্ববাঙলার মানুষ এতদিন সংগ্রাম করে এসেছে।"

এই ধরণের 'স্নায়ুযুদ্ধ' চলতে থাকলে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাঙলায় ব্যাপক ভাবে 'বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ ছড়াতে শুরু করে। এবং 'জয়বাঙলা' স্লোগানকে আরো উত্তাল করে তোলে। ছাত্রলীগ প্রচার করতে থাকে 'জয়বাঙলা'র অর্থ হলো 'স্বাধীন বাঙলা'।

'বাঙালী বিহারী' সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে তখন এত জঘন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো আওয়ামী লীগ যে, ছোটো ছোটো ছেলেদের মুখে ঢাকার ও প্রদেশের সর্বত্র শোনা গেছে "দুই একটা বিহারী ধরো—সকাল বিকাল নাস্তা করো।" এই ধরণের ফ্যাসিবাদী নগ্ন কথাবার্তা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের মুখেও তখন ধ্বনিত হয়েছে। পূর্ববাঙলার সর্বত্র যখন 'বাঙালী-বিহারী' চরম দাঙ্গার পরিস্থিতি চলছে—সেই সময় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক ইয়াহিয়া খান নির্বোধের মতোন জাতীয় পরিষদের ৩রা, মার্চের নির্দ্ধারিত অধিবেশনের তারিখ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুলতুবী ঘোষণা করে সমগ্র পূর্ববাঙলাকে চরম সর্বনাশা গহ্বরে নিক্ষেপ করলো। ১লা মার্চ বিকেলেই ঢাকায় আওয়ামী লীগের মিছিলে আওয়াজ উঠলো—"ভূট্টোর মুখে জুতা মারো, বাঙলা দেশ স্বাধীন করো।" "ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো বাঙলাদেশ স্বাধীন করো।" সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো 'জয় বাঙলা'র জিকির। 'উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদে'র ঢেউ-এর মুখে অবাঙালী জনতা বলির পশুর মতো থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

ইতিপূর্ব ইন্দোনেশিয়ার কুখ্যাত 'কমিউনিষ্ট হত্যা কাণ্ড সংঘটনের নায়ক' ফারল্যাণ্ড শেখ মুজিবের সঙ্গে কয়েক দফা গোপন বৈঠকে মিলিত হলো। বহু রকম শলা পরামর্শ হলো উভয়ের মধ্যে। শলা পরামর্শের মূল প্রতিপাদ্য হলো পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে একটি সাজানো নাটকে শেখ মুজিবকে অভিনয় করতে হবে দক্ষতার সঙ্গে। শেখ মুজিব সময় চেয়েছিলো ফারল্যাণ্ডের কাছে। আমি এ সম্পর্কে পরে আলোচনার সূত্রপাত করবো।

১৯৭১'এর ২রা মার্চ ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল

করার প্রতিবাদে ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ২রা মার্চের নারকীয় ঘটনা-বলী আমি সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালিত করতে গিয়ে স্বচক্ষে যা দেখেছি, তাতে স্তম্ভিত না হয়ে পারি নি। সুপরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের গুণ্ডারা বিহারী অধ্যুষিত কলোনীগুলোয় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। নবাবপুর রোড ঠাটারী বাজার, পুরোনো রেল স্টেশন, ফুলবাড়ি রেল কলোনী প্রভৃতি বিহারী অধ্যুষিত এলাকায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলেছে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে নিরপরাধ অবাঙালী জনতাকে। অবাধে ধর্ষণ চালানো হয়েছে অবাঙালী মেয়েদের উপরে। চালানো হয়েছে অবাঙালীদের দোকানে দোকানে অবাধ লুটতরাজ। প্রকাশ্য দিবালোকে বাঙালী পুলিশদের সামনে এই লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ, খুন-জখম চলেছে, আর পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে সেই দৃশ্য অবলোকোন করেছে। সামান্য পরিমান বাধা পর্যন্ত দুষ্কৃতকারীদের দেয়া হয়নি। মুখে জয়বাঙলা শ্লোগান আর কাজে বিহারী নিধনের উন্মত্ততা দেখে ইতিহাসের পাতায় পড়া হিটলারের কথাই মনে হয়েছে তখন। সুস্পষ্টভাবে বলছি, বিহারী কিম্বা অবাঙালী জনগণ আগে কখনোই কোনো রকম উস্কানিমূলক কাজ করে নি। তাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে, তাদের মেয়েদেরকে বেইজ্জৎ করা হয়েছে তাদেরই সামনে, তারা দেখেছে তাদেরই দোকান-পসার-বাড়িঘর অবাধে লুট হয়ে যাচ্ছে, তারা চাকুর মুখে, গুলির ঘায়ে, লাঠির তলায় আগে জীবন দিয়েছে; তারা আক্রান্ত হয়ে উপলব্ধি করেছে—তারা অবাঙালী জনগণের বন্ধু নয়, এদেশে মান-সম্ভ্রম ইজ্জৎ নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার তাদের নেই। তারা বিহারী, পশ্চিম পাকিস্তানী, শুধু সেই অপরাধের জন্যেই—ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে আওয়ামী লীগের লোকেরা তাদের উপরে হিংস্র হায়নার মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই চেতনার বিদ্বেষ অবাঙালী জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগই সৃষ্টি করে দেয়। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই অবাঙালী জনগণ—এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকে। অবাঙালী জনগণকে আক্রমণ না করলে—পরবর্তী সময়ে তারাও বাঙালীদের উপরে আক্রমণ চালাতো না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম; আক্রমণ করলে আক্রান্ত হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদের উভয় অঞ্চলের স্বার্থের কামড়াকামড়ির ফলে পূর্ববাঙলায় যেমন অবাঙালী নিধন চলতে লাগলো, তারই পরিণতি হিসেবে বাঙালী জনগণের উপরে চাপিয়ে দেয়া হলো

সেনাবাহিনীর অমানুষিক নিপীড়নকে।

২রা মার্চ বর্বর সেনাবাহিনী ঢাকার তেজগাঁও মালিবাগে গুলি চালিয়ে বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এবং এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩রা মার্চ সমগ্র পূর্ববাঙলায় হরতাল পালিত হয়। ২রা মার্চ দুপুরে আমার সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের একজন সামরিক অফিসারের আলোচনা হয়। তাতে উক্ত অফিসারের কথা থেকেই জানতে পারি যে, ইষ্ট-পাকিস্তান রাইফেলস্ (ই. পি. আর.) ও বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্যরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে শেখ মুজিবের দিকে তাকিয়ে। শেখ সাহেব ডাক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উপরে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে—তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। ই. পি. আর. বেঙ্গল রেজিমেণ্ট ও পুলিশবাহিনী ৩রা মার্চের পলটন ময়দানে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করবে—এই আশা নিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েছিলো। ওই দিন সমগ্র পূর্ববাঙলায় হরতাল পালিত হলো। পলটন ময়দানে ছাত্রলীগ প্রতিবাদ সভা আহ্বান করলো। এই সভায় শেখ মুজিবের ভাষণ দেয়ার কোনো কথা ছিলো না। ছাত্ররা স্বাধীন বাঙলার পতাকা তৈরী করে ৩রা মার্চ পলটন ময়দানে পূর্ববাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করার আয়োজন করেছিলো। শেখ মুজিব তখনো আপোসের মাধ্যমে ক্ষমতার হালুয়া-রুটি ভাগাভাগি করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। এই স্বপ্ন নস্যাৎ হওয়ার আশঙ্কাতেই তিনি ছাত্রলীগের মিটিং-এ এলেন, যাতে স্বাধীনতা ঘোষণা না করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ জনসভায় অপেক্ষা করেছিলো—সঠিক কর্মসূচীর জন্যে। ছাত্রলীগের নেতারা শেখ মুজিব পৌঁছার আগেই 'স্বাধীন বাঙলা'র পতাকাত্তোলন করে। ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ববাঙলাকে স্বাধীন করার ডাক দেয়। ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা নূরে আলম সিদ্দীকির শ্লোগানগুলো আমার কানে এখনো লেগে আছে—"ভূট্টোর মুখে জুতা মারো—বাঙলাদেশ স্বাধীন করো; পশ্চিমাদের লাথি মারো—বাঙলাদেশ স্বাধীন করো।" ৩রা মার্চের জনসভায় অবাঙালী জনতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত নগ্নভাবে বিষক্রিয়া ছড়ানো হয়। শেখ মুজিব সভায় এসে 'স্বাধীন বাঙলাদেশ' এর ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য না করে—ঘরে ঘরে কালো পতাকা তুলে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে বলেন এবং 'বৈষ্ণব সেজে' ওই ঘোরতর জাতীয় দুর্দিনেও জনগণকে গান্ধীর মতো নিষ্ক্রিয়ভাবে 'অহিংস ও অসহযোগ'

আন্দোলনে শরীক হওয়ার ডাক দেন।

শেখ মুজিব যদি ৩রা মার্চ 'স্বাধীনতা'র ডাক দিতেন তাহলে পূর্ববাঙলায় ত্রিশ লক্ষ জনতার বুকের রক্তে পথঘাট রঞ্জিত হতো না, লক্ষ লক্ষ মানুষকে অসহায়ের মতো ভেসে ভেসে বিদেশও পাড়ি জমাতে হতো না। না খেয়ে পথ শ্রান্তিতে, কলেরা-মহামারীতে আক্রান্ত হয়েও লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ হতো না, বিদেশী সৈন্যবাহিনীকেও পূর্ববাঙলা দখল করতে হতো না। কারণ ওই সময় পূর্ববাঙলায় মাত্র কয়েক হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো (তিরিশ হাজারেরও কম)। কিন্তু আপোসকামী ক্ষমতা লিপ্সু শেখ মুজিব জনগণকে সশস্ত্র পথে না নিয়ে গিয়ে নিরামিষ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথে ঠেলে দিলেন। জনতা চাইলো হাতিয়ার, শেখ মুজিব দিলেন অহিংসার পথ। অর্থাৎ অহিংসার ডাক দিয়ে তিনি পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর উপরে চাপ সৃষ্টি করে ক্ষমতায় যাবার পথকে তরান্বিত করতে চাইছিলেন। ৩রা মার্চের প্রকাশ্য জনসভাতেই ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল খুবই প্রকট দেখা গেলো। ছাত্র-লীগের প্রভাবশালী নেতা আ. শ. ম. আবদুর রব-এর সমর্থক ছাত্ররা সশস্ত্রপথে পূর্ববাঙলাকে স্বাধীন করার চাপ দিচ্ছিলো শেখ মুজিবের উপরে। শেখ মুজিব সেই চাপ-এর কাছে নতি স্বীকার না করে—আপোসের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন। ফলে মুজিব সমর্থক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দীকি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি তোফায়েল-আহমেদের ছাত্র গ্রুপের সঙ্গে, 'রব' গ্রুপের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে থাকে। 'রব' গ্রুপ ওই সময় 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো' শ্লোগানের বিরোধীতা করে 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধরো পূর্ববাঙলা স্বাধীন করো' এই শ্লোগানকেই আঁকড়ে ধরেছিলো। ফলে ৩রা মার্চ ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ উভয় গ্রুপের ছেলেদের মধ্যে প্রকাশ্যে 'শ্লোগান যুদ্ধ' চলতে দেখা গেলো। অবশ্য উভয় গ্রুপই মুজিবের অনুগত। 'রব' গ্রুপ শ্লোগান দিচ্ছিলো 'শেখ মুজিবের পথ ধরো সমাজতন্ত্র কায়েম করো' 'নূরে আলম-তোফায়েল' গ্রুপ বলছিলো—'বঙ্গবন্ধু'র পথ ধরো গণতন্ত্র কায়েম করো। দুই গ্রুপের এই শ্লোগান যুদ্ধের মধ্যে তফাত হলো সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র' শব্দ দুটি। কিন্তু নীতিগত মৌলিক কোনো তফাত নেই। যেমন তফাত নেই আজকের ভারতের ইন্দিরা গান্ধী'র সমাজতন্ত্রের শ্লোগানের সঙ্গে মস্কোপন্থী (সি.পি.আই.) দের শ্লোগানের তফাত। শুধু নামে মাত্র বিরোধী শিবির। শেখ মুজিবের পথ ধরলে জনগণের গণতন্ত্র কিম্বা সমাজতন্ত্র কায়েম করা

সম্ভব তো দূরের কথা, বরং ওই ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের পথ অনুসরণ করলে— জনগণের গণতন্ত্রও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পথে যে প্রতি আক্রমণ আসবে এবং 'শেখ মুজিব'-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই যে জনগণের প্রগতির পথকে অবদম করার প্রজ্ঞা—তা জেনেই 'রব' গ্রুপের 'সমাজতন্ত্র' শ্লোগান সৃষ্টি। নইলে কোনো ফ্যাসিবাদীর পথ অনুসরণ করার ডাক কোনো সমাজতন্ত্রকামী বিপ্লবীর কণ্ঠ থেকে বেরুতে পারে না।

৩রা মার্চ শেখ সাহেব যখন পলটনে বক্তৃতা করছিলেন—তখন ঢাকার বিহারী কলোনীগুলোয় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিলো। এবং অত্যাচার চলছিলো ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাদের। চলছিলো লুটতরাজ। ওই সময় বিহারীদের কলোনী (পলটন ময়দানের সন্নিকটে, ফুলবাড়ি রেল কলোনী) থেকে লুট করে আনা দেশী দু'টো রাইফেল শেখ মুজিবের হাতে দেয়া হয়। শেখ মুজিব 'বিহারীরা হুশিয়ার' বলে হুমকি দেন। কিন্তু তারাই সামনে আগুনে পুড়ে যাওয়া রেল কলোনী ও নবাবপুর রোডের রেলক্রসিঙের কাছে বিহারীদের বাড়িতে আগুন দেয়ার জলন্ত দৃশ্য থাকা সত্বেও এই ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্যে একটা টু'শব্দও উচ্চারণ করলেন না তিনি। ফলে গুণ্ডারা অবাধ অধিকার পেয়ে গেলো অবাঙালী জনতার উপরে আক্রমণ করার। ওই দিন নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের প্রোজ্জলন্ত আগুনের সামনে বেরিকেড তৈরী করে—লাল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে সামরিক বাহিনীর লোকেরা নবাবপুর রোডে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলো। আর তাদেরই অদূরে গুলিস্তান, জিন্না এভিন্যু, ও বায়তুল মোকাররমে চলছিলো বিহারীদের দোকানে নির্বিবাদ লুটতরাজ। যদি এইসব ফ্যাসিবাদী তৎপরতা (হিটলারের ইহুদী হত্যার মতো) বন্ধ করা যেতো তাহলে বাঙালী জনতার উপরে পরবর্তীতে বিহারীরা উন্মত্ত প্রতিশোধের হিংস্রতা নিয়ে (অংশত পড়লেও) ব্যাপক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তো না। কিন্তু শেখ মুজিব পরোক্ষভাবে অবাঙালী নির্যাতনের প্রশ্রয় দিয়ে ইয়াহিয়া ভূট্টোকে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন তাড়াতাড়ি ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা করার জন্যে। কিন্তু এর ফল হলো ভয়ানক। ৩রা মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা শহরে কারফিউ জারী করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করলো। আর প্রকৃত স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনগণ অত্যন্ত বিস্ময়কর ভাবে কারফিউ জারীর দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়লো রাজপথে। হাতে লাঠি। মুখে 'কারফিউ মানি না' শ্লোগান। আরো-আরো শ্লোগান

ধ্বনিত হতে লাগলো—'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধরো, পূর্ববাঙলা স্বাধীন করো।' 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধরে বাঙলা দেশ স্বাধীন করো।'

পুরোনো ঢাকার অলিতে গলিতে পালিয়ে পালিয়ে ওই রাত্রিতে প্রত্যক্ষ করেছি—শেখ মুজিবের অহিংস পথে পরিচালিত জঙ্গীজনতা কি ভাবে অসহায়ের মতো মিলিটারীদের নির্বিচার গুলি বর্ষণে রাজপথের উপরে শেয়াল কুকুরের মতো পড়ে পড়ে মরছে। আশ্চর্য হয়ে গেছি, হঠাৎ শুনেছি কাছেই সামনে থেকে শ্লোগান, একঝাঁক বেপরোয়া বিদ্রোহী মানুষের ঘন ঘন শ্লোগান। পরমুহূর্তে সেখানে মিলিটারীর মেশিনগানের ট্যা-ট্যা শব্দ। সামনের শ্লোগান থেমে গেছে। পরক্ষণেই ডাইনে, বাঁয়ে শ্লোগান উঠেছে। কানে এসেছে মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলির আওয়াজ। স্তব্ধ হয়ে গেছে বিদ্রোহী কণ্ঠগুলো। কিন্তু প্রায় ছয় থেকে সাতঘণ্টা ৩রা মার্চের রাত্রির ঢাকা নগরী বিদ্রোহী প্রাণবন্যায় শ্লোগানের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা'র আকাঙ্খার কথা ঘোষণা করেছে। বাইরে থেকে তাড়া খেয়ে মাঝরাত্রি পর্যন্ত বাড়ির ছাদে ছাদে, ভার্সিটির হলে-হলে, বিদ্রোহী ছাত্র-জনতা শ্লোগান দিয়েছে। আর যেদিক থেকেই শ্লোগান এসেছে, (অবাঙালী নির্যাতন ও হত্যার প্রতিশোধে উন্মত্ত) বর্বর সেনাবাহিনী সেদিকেই চালিয়েছে বেপরোয়া মেশিনগানের গুলি। এবং ওই রাত্রিতেই নবাবপুর রোডে—অবাঙালী জনতা সর্বপ্রথম বাঙালীদের উপরে আক্রমণ চালায়। কয়েকজনকে খুন জখমও করে। আক্রান্ত হয়েও অবাঙালীরা যদি ওই দিন বাঙালীদের উপরে আক্রমণ চালানো থেকে বিরত থাকতো তাহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে তাদেরকে বৃহত্তর হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হতো না। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে পূর্ববাঙলার মফঃস্বল শহরগুলোয় 'কচু কাটা' হওয়ার পথে অবাঙালীদেরকে ঠেলে দেয়ার পথকেই তারা উন্মুক্ত করে দিলো নবাবপুর রোডে আক্রমণ চালিয়ে।

৩রা মার্চের কালো রাত্রির অন্ধকারে কয়েক হাজার মানুষ (বলা হয় কয়েক ডজন) বর্বর মিলিটারীদের গুলিতে প্রাণ হারালো। যদিও রাত্রির অন্ধকারে কারফিউ-এর সুযোগে অসংখ্য লাশ ছ' লরীতে তুলে নিয়ে গেছে মিলিটারীরা। তবুও বহু লাশ পরদিন বেলা দশটা এগারোটা পর্যন্ত ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো। রক্তে ভেসে গিয়েছিলো ভিক্টোরিয়া পার্কের মোড়। নতুন সূর্যের আলোয় সেই চাপ চাপ রক্তের

ছড়া দেখে শিউরে উঠেছিলো অগণিত মানুষ। শুধু কি ঢাকার বুকে ৺রা মার্চের কালোরাত্রিতে হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরেছিলো? রক্ত ঝরেছিলো চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরে। ক্ষিপ্ত মানুষ 'স্বাধীনতা'র দাবীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলিটারীর মেশিনগানের ও রাইফেলের মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন। ইতিমধ্যে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিতব্য শেখ মুজিবের 'ঐতিহাসিক' জনসভায় 'গুরুত্বপূর্ণ 'ভাষণ' দানের প্রচারনা করা হতে থাকে। জনগণ ৭ই মার্চের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তারা ভেবেছিলো ওই দিনই 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করবেন শেখ মুজিব। সমগ্রপ্রদেশে চলছিলো গান্ধীবাদী শেখমুজিবের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। অফিস-আদালত, মিল ফ্যাক্টরী, ব্যাঙ্ক-বীমা, সবই বন্ধ ছিলো। জনগণের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত অংশ কর্মহীন হয়ে পূর্ববাঙলার পরিস্থিতি নিয়ে প্রায় সব সময়েই একটা অস্থিরতার মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলো।

এই পরিস্থিতিকে আয়ত্বে রাখার জন্যে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক সংক্ষিপ্ত বেতার ঘোষণায় পূর্ববাঙলায় মিলিটারীর হত্যাকাণ্ডের সাফাই গেয়ে বললো— "পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা, ও বিশেষ এক শ্রেণীর (অবাঙালীদের) জান মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার অপপ্রয়াসকে রোধ করার জন্যেই 'যতটুকু প্রয়োজন' ততটুকুই সে ব্যবস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছিলো…।" এই ঘোষনাতেই ক্ষমতালোভী শেখ মুজিবের সামনে ১০ই মার্চ বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে এক বৈঠক করার কথা ব্যক্ত করলো ইয়াহিয়া খান। এবং ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার দিন জানালেন।

পূর্ববাঙলার অন্যান্য বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ১০ই মার্চের এই বৈঠককে (নূরুল আমীন পর্যন্ত) বর্জন করার কথা ঘোষণা করেন। জনগণও আপোসের পথকে পরিহার করে লড়াইয়ের মাধ্যমে পূর্ববাঙলার 'স্বাধীনতা' অর্জন করার জন্যে মুজিবের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ই. পি. সি. পি. এম. এল— জনগণকে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা' কায়েম করার আহ্বান জানায়। এবং শহর থেকে এই লড়াইয়ের ডাককে গ্রামে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে—সামন্তবাদ—সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ ও শাসনকে নির্মূল করার মহান সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্যে জনগণকে এগিয়ে আসতে বলে। জনতার মধ্যে বাঙালী অবাঙালী হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধেও ই. পি. সি.

পি. এম. এল. জনগণকে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দেয়। এবং পূর্ববাঙলার স্বার্থের পরিপন্থী সব রকমের আপোসের বিরুদ্ধে প্রদেশবাসীকে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো সতর্ক ও সচেতন থাকার কথা বলে। এই সময় কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) মুখপত্র 'গণশক্তি' পত্রিকা আপোসের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই চালায়। শেখ মুজিব সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল, আপোসপন্থী নেতৃত্বের চরিত্রও তুলে ধরে প্রদেশবাসীর সামনে। ওই সময় কমিউনিষ্ট বিরোধী-ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট হত্যাকারী মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ড খুবই ঘন ঘন শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকে। ভারতীয় বেতারের প্রচারনা ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে। খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, আমেরিকার সেনাবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড খুবই সঙ্গোপনে 'দিল্লী থেকে ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ঢাকার দৈনিক আজাদ পত্রিকায় তখন একটা ছোট্ট নিউজ ছাপা হয়। নিউজের ক্যাপশন 'ছোটো হলেও নিউজের মধ্যে অ্যাটোমিক এনার্জি ছিলো। নিউজে প্রকাশ করা হয়—অসুস্থতার জন্যে শেখ মুজিবের দু'দিন রাজনীতির সব রকমের পরিবেশ থেকে মুক্ত থাকার কথা আওয়ামী লীগের তরফ থেকে প্রচার করা হলেও, শেখ মুজিবকে বরিশালের কাছে দেখা গেছে। এবং সেখানেই ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডের সঙ্গে তার গোপন আলোচনা হয়। ওই আলোচনার বিষয়বস্তু জানা না গেলেও সি. আই. এ-এর 'দলিল', জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ও 'দলিল' এর ষড়যন্ত্রের নকশাই অনুমান করতে সাহায্য করে যে, ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড ও মুজিবের মধ্যে কী ধরণের গোপন মত বিনিময় হয়েছিলো। পূর্ববাঙলাকে কমিউনিষ্ট চীন বিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত করার জন্যেই যে একটা নাটক সাজানো হচ্ছিলো তা পরবর্তী ঘটনাসমূহ থেকে, তথ্য ও প্রমাণ থেকে ভালো ভাবেই অনুধাবন করা যায়। শুধু ফারল্যাণ্ড আর ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডই নয়, কমাণ্ডো নিধন তৎপরতায় জর্ডানে আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যীয় সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে বাদশা হোসেনের হাতকে শক্তিশালী করে নির্বিচার কমাণ্ডো হত্যায় যে লোকটি হাত পাকিয়েছিলো—তার হোতা জেনারেল বাইনও এই সময় ঢাকায় আসে এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়। যদিও ভেতরের খবরে জানা গিয়েছিলো যে, বাইনের সঙ্গে শেখ মুজিব টাঙ্গাইলের 'মধুপুর গড়' এলাকায় সাক্ষাৎ করেন, আমার এখবর সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় কোথায় তাদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছে তা বলতে পারছি না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই

'চীন বিরোধী' তৎপরতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে 'গণশক্তি' পত্রিকা পূর্ব বাঙলার বামপন্থী শিবিরকে হুশিয়ার করে দেয়। তখনই বোঝা যাচ্ছিলো (মুজিব ক্ষমতায় এলেও না এলেও) পূর্ববাঙলা' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সেবাদাস ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের অবাধ 'চীন বিরোধীতা'র বিচরণ ভূমিতে পরিণত হতে চলেছে।

বিপ্লবী বামপন্থী ছাত্ররা ঢাকায় 'ইন্দোনেশিয়ার চৌদ্দলক্ষ কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট সমর্থক হত্যার নায়ক ফারল্যাণ্ডকে খুন করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ৩রা মার্চের পরেও ফারল্যাণ্ড ঢাকায় ছিলো ; এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো।

৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশলক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিব সেই একই আপোসের পথে পা বাড়ালেন। যে ভাষণকে 'ঐতিহাসিক' বলে রেকর্ড করে যত্রতত্র বাজিয়ে শোনানো হয়েছে। পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম বাঙলার তেমন লোক খুব কমই আছে যারা শেখ মুজিবের ওই ভাষণ শোনে নি। তবে ময়দানের ভাষণের অনেক কিছুই রেকর্ড করার সময় কেটে ছেটে বাদ দেয়া হয়েছিলো। বাদ দেয়া হয়েছিলো যেটুকু শেখ মুজিবের 'বিপ্লবী প্রেসটিজে'র বিরুদ্ধে যাবে, সেই .অংশগুলো। যাই হোক পূর্ববাঙলার বাম-পন্থীরা এমন কি ছাত্রলীগের 'রবগ্রুপ'ও যখন সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলছে, জনতা যখন সশস্ত্র পথের কথা ভাবছে ; এবং নূরুল আমীন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া-শীলরাও যখন ইয়াহিয়ার ১০ই মার্চের বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন, সেই অবস্থায় সরাসরি আপোসের বৈঠকে মিলিত হলে একেবারেই ইজ্জৎ চলে যায় ; এই জন্যেই ক্ষমতার হালুয়া-রুটির গন্ধে বিভোর 'বঙ্গবন্ধু' চারটি শর্ত আরোপ করে বলেন যে, এই চারটি শর্ত মেনে নিলে তবেই তিনি ইয়াহিয়ার গোল টেবিলে যোগ দেবেন। শর্ত চারটি হলো : (১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিতে হবে () সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে (৩) অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে (৪) ২রা ও ৩রা মার্চ সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দান ও তদন্তের মাধ্যমে দোষী সেনাদের শাস্তি বিধান করতে হবে। শেখ মুজিব ভালোভাবেই জানতেন যে, ইয়াহিয়া এই শর্তাধীনেই তার সঙ্গে আলোচনায় রাজি হবে। এবং তা জেনেই তিনি এই শর্তারোপ করেন। অর্থাৎ 'ধরি মাছ না ছুই পানি'র মতোন যাতে 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে'

এই রকম কৌশল নিয়ে ওই শর্তারোপ করে, স্বাধীনতাকামী জনতাকেও মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত রাখলেন সশস্ত্র লাইনের হাত থেকে—আবার ইয়াহিয়ার সঙ্গে গোলটেবিলে বসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথটাও সুগম করলেন। একেই বলে ক্ষমতার অভিলাষী। একেই বলে প্রতিক্রিয়াশীলতা। এটাই হলো কায়েমী স্বার্থের হাতকে শক্তিশালী করার, জনগণের উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি বড়ো পুঁজিপতি গোষ্ঠীর অবাধ শোষণকে বহাল রাখার নির্লজ্জ দালালী। আয়ুবের গোলটেবিলেও ক্ষমতার লোভে—১৯৬৯-এর নজীর বিহীন গণ অভ্যুত্থানের বুকে ছুরি চালিয়ে এই শেখ মুজিবই শাসক শ্রেণীর নতুন ষড়যন্ত্রের ভিত্তি পাকা (দ্বিতীয়বার দেশে সামরিক আইন জারী) করার সময় ও সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

চারটি শর্তারোপ করে কিছু কিছু সস্তা গরম কথা আউড়ে গান্ধী'র অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে শেখ মুজিব জনতার প্রতি আহ্বান জানালেন। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসেরই তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন—রেসকোর্সের দশলক্ষ জঙ্গীজনতার সামনে দাঁড়িয়ে। একদিকে দিলেন আপোস আলোচনার শর্ত, অন্যদিকে বললেন—"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,...এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এবং মুজিবের মাথায় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না থাকলেও তিনি তার রিহার্সেল দিয়ে আসা বক্তৃতায় ঠিকই বলেছিলেন—"আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বত্র সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন।" এটা বলেছিলেন যাতে করে কমিউনিষ্টরা এই "সংগ্রাম কমিটিতে" প্রবেশ করতে না পারে। জনগণকে তিনি বোঝালেন "কম রক্তপাতে যে, যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে সেই হলো বিচক্ষণ সিপাহ্‌শালার।" এবং জনগণের উপরে সংগ্রামের দায়িত্ব অর্পন না করে ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্বের মতোন তিনি বললেন "আমার উপরে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিন, কি করে আন্দোলন করতে হয় আমি তা জানি।" বললেন, "পূর্ববাঙলার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা তার করায়ত্ব প্রায়।"

বামপন্থীরা এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুক্তিফ্রন্ট গঠন করার ডাক দিলে—শেখ মুজিব তাদেরকে—"অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন বানচালকারী" বলে গালাগালি করেন। এবং তিনি আন্দোলন বানচালকারীদের সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকার ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে বলেন।

চৌদ্দ

শেখ মুজিব খুব সঠিক ভাবেই কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন বানচাল করার অভিযোগ তুলেছিলেন। বরং এর উল্টো কিছু হলেই আমরা মুজিবকে অন্ততঃ ভুলভাবে চিত্রায়িত করতাম তার চারিত্রিক ও মতাদর্শের। ১৯৫৪ সনে পূর্ববাঙলার নির্বাচনে ভাসানী ফজলুল হকের নেতৃত্বে 'যুক্তফ্রণ্ট' নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হলে শেখ মুজিবও ওই মন্ত্রীসভায় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পুনরায় এককভাবে ১৯৫৬ সনে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করার প্রস্তুতি মুহূর্তে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এই শেখ মুজিবই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের খুশী করার জন্যে পূর্ববাঙলার যত্রতত্র প্রচার করেছিলেন "শেরে বাঙলা ফজলুল হকের বিরোধীতা করার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছে।" পনেরো বছর পরে সেই শেখ মুজিবই প্রচার করছিলেন।—"আমি শেরে বাঙলা ও সোহরাবর্দ্দীর স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করতে চাই।… এ হলো শেরে বাঙলার—বাঙলা।" ১৯৭১-এর মার্চ মাসের প্রথম দিকে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ মুজিবেরই '৫৬ সনের উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করলে এই রকম হয়—"আমি কমিউনিষ্টদের নির্মূল করার জন্যেই জন্ম গ্রহণ করেছি।" আমার মনে হয় শেরে বাঙলার বিরোধীতা করার কথা বলে শেখ মুজিব ভুল করেছিলেন। তার উচিত ছিলো কমিউনিজম্‌-এর বিরোধীতা করার জন্যেই তার জন্ম হয়েছে বলা তাহলে সত্যি সত্যিই তিনি তার মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারতেন তার বক্তব্যের মধ্যে। যেমন করে তিনি হাজার হাজার মানুষের রক্তচিহ্নের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ক্ষমতার জন্যে ; এবং খুবই অসহায়ের মতোন—ভূট্টো ও ইয়াহিয়ার একগুয়েমী দেখে মনের সংগোপন কথাগুলো (যা ফারল্যাণ্ড, বাইন ও ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি) খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছিলেন—Agence France Press-এর রিপোর্টারের কাছে। তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি—"Is the West Pakistan Government not aware that I am the only one able to save East Pakistan from communism ? If they take

the decision to fight I shall be pushed out of power and communists will intervence in my name. If I make too many concessions, I shall lose my authority. I am in a very difficult position.…" (প্যারিসের Le-Monde পত্রিকায় ১৯৭১ সনের ৩:শে মার্চ প্রকাশিত)।

শেখ মুজিবের এই খোলাখুলি উক্তি থেকে কি এটাই প্রমান হয় না যে, তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই ক্রীড়নক হিসেবে পূর্ববাঙলায় 'কমিউনিষ্ট চীন' বিরোধী ঘাঁটি স্থাপনের জন্যে, ক্ষমতার গদিতে বসার জন্যে হাজারো শহীদের রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে? এদিক থেকে ভুট্টোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিলো যথেষ্ট পরিমানে। কেন না ভুট্টো হচ্ছে পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের নতুন নেতা। ষাটের দশকের শুরু থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (বিশেষ করে চীন-ভারত সংঘর্ষের পরেই) ভারতীয় মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্যে 'সাহায্যে'র হাত সম্প্রসারিত করে; এর কারণ হলো পাকিস্তানে চীন বিরোধী যুদ্ধঘাঁটি স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের হাতকে শক্তিশালী করে, পাকিস্তানের উপরে সামরিক চাপ সৃষ্টি করে 'পাক-ভারত যৌথ যুদ্ধ জোট' (চীন বিরোধী) গঠন করতে পাকিস্তানকে বাধ্য করে। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নেই পাকিস্তানের মুৎসুদ্দিরা ভারতের সঙ্গে 'যুদ্ধ জোট' গঠন করতে রাজি ছিলো না, ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই পরোক্ষ প্ররোচনায় ১৯৬৫ সনে ভারত সরাসরিভাবে পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে। ফলে পাকিস্তানের মুৎসুদ্দিরা সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশেষ করে গণচীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের হাত সম্প্রসারিত করে। চীনও মার্কিনী তৎপরতার হাত থেকে পাকিস্তানকে নিরপেক্ষ করার প্রয়াসে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং ভুট্টো পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থের বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলায় 'চীন বিরোধী ঘাঁটি' স্থাপনের স্বপক্ষে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এবং শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে যে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি হবেই, এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের কাছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি, আভ্যন্তরীন বাজার বাধা পড়বে—এইসব কারনেই ভুট্টো ও ইয়াহিয়া মুজিবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করেছিলো। চেষ্টা

করছিলো মুজিবকে ক্ষমতায় আসতে না দিতে।

এদিকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাত্রলীগ 'স্বাধীন বাঙলা'র পতাকা উত্তোলোন করে জনগণকে এই পতাকা উত্তোলোন করতে বলেন। ঢাকায় 'কালোপতাকা' ও 'স্বাধীন বাঙলা'র পতাকা উত্তোলোন করা হয় প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে। একটানা চলতে থাকে উৎপাদন যন্ত্রসহ সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থায় 'বন্দ্'। ছাত্রলীগ চালাতে থাকে (ঘটনার চাইতে রটনা বেশী) অস্ত্র শিক্ষা। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলকে 'কেন্দ্র' বানিয়ে সেখানে অস্ত্র আমদানি করতে থাকে। যার সব খবরই পাকিস্তান সরকার অবহিত ছিলো। ৮ই মার্চ ছাত্রলীগের এক গৃহীত সিদ্ধান্তে শেখ মুজিবকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'স্বাধীনতা' ঘোষনা করার কথা বলা হলে শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৯ই মার্চ পলটন ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে মওলানা ভাসানী সুস্পষ্ট ভাবে 'অহিংস ও অসহযোগ' আন্দোলনের বিরোধীতা করে 'মুক্তি ফ্রণ্ট' গঠন করার আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী বলেন—"একদিন মনে করেছিলাম অহিংসার মতো মহত্ব নাই, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—হিংসাই পরম ধর্ম। তোমরা (জনতা) হিংসা করো, হিংসা করো, হিংসা করো। হিংসা করতে না শিখলে তোমরা বাঁচতে পারবে না।"

ই. পি. সি. পি. এম. এল. ঢাকা ও প্রদেশের প্রত্যেকটি সমাবেশে, রাস্তায়, বাজারে, বিভিন্ন জনসমাগমে—সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাপকভাবে (আধা গোপনে) লিফলেট বিলি করছিলো। সাংগঠনিকভাবে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে 'গণফৌজ' গঠন করার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলো। কৌশলগত কারণেই (আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত) আওয়ামী লীগের সঙ্গে সব রকমের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে—শোষক ও শাসক শ্রেণীর এজেণ্টদেরকে খতম করার আহ্বান জানালে—আওয়ামী লীগের তরফ থেকেই প্রতি আক্রমণ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ ই. পি. সি. পি. এম. এল' এর এই কাজের বিরোধীতা করে পূর্ববাঙলার গ্রামে—আয়ুব-ইয়াহিয়ার এজেণ্টদের হাতকে শক্তিশালী করলো। যদিও সর্বত্র তারা সফল হতে পারেনি। এই সময়েই 'জয় বাঙলা'র বিরুদ্ধে ঢাকা শহরে ও প্রদেশের অন্যান্য শহরে বামপন্থী ছাত্র সমাজ ও শ্রমিক শ্রেণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে 'লাল বাঙলা' শ্লোগান। বামপন্থীদের নেতৃত্বে চলতে থাকে লড়াই করার প্রস্তুতি ও জনগণকে সেই লড়াইয়ে ব্যাপকভাবে সামিল করার তৎপরতা—

অন্য দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আসর গরম করতে থাকে—কাইয়ুম পন্থী মুসলীম লীগের নেতা (পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগণে একটি অশুভ দুষ্টগ্রহ) খান আবদুল কাইয়ুম খান পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মস্কোপন্থী) সভাপতি ওয়ালী খান এবং আরো অনেক নেতৃবৃন্দ। মুজিবের সঙ্গে চলতে থাকে তাদের ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আপোস আলোচনা। এলেন জুল্‌ফিকার আলী ভুট্টো সাহেব। শেখ মুজিব দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। প্রেস ট্রাষ্টের কাগজ 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় "উষ্ণ আলিঙ্গন" ক্যাপশন দিয়ে সেই ছবি ছাপা হলো। ভুট্টো সাহেব অবস্থান করতে লাগলেন হোটেল ইণ্টার কন্টিনেণ্টালে।

মুজিব-ভুট্টোর মধ্যে 'পেয়ারা দোস্তী' হয়ে গেলো। শেখ মুজিব কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, তিনি 'স্পেশাল লঞ্চ' যোগে (প্রমোদ তরী বললে অত্যুক্তি হবে না) ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে আপোস আলোচনার আসর জমিয়ে তোলার জন্যে ঢাকার বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষা নদীর বুকে খোশ মেজাজে ভ্রমণ করেন নি? শেখ মুজিব কি সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেন নি যে—তাদের মধ্যে 'সমঝোতা হয়ে গেছে? অথচ যে ভুট্টো সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে বসে বলেছিলেন যে, "ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে—তা কসাই খানায় পরিণত হবে?" ভুট্টো সাহেবের পূর্ববাঙলার জনগণকে 'কসাই' বলা নিয়ে সেদিন শেখ মুজিবই কি প্রতিবাদ করেন নি উচ্চ কণ্ঠে। পূর্ববাঙলার জনগণ এই জঘন্য উক্তির বিরুদ্ধে সেই সময় কি প্রচণ্ড ধিক্কারে ফেটে পড়ে নি? অথচ 'বঙ্গবন্ধু' তারই গলায় গলা মিলিয়ে, প্রমোদ তরীতে ঘুরে বেড়িয়ে (যখন পূর্ববাঙলার মাটি হাজারো শহীদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে) এ কোন্ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন? ইতিহাস একদিন এই সব প্রশ্নের জবাব নেবেই।

প্রতিশোধকামী অপমানিত জনতা হোটেল ইণ্টার কন্টিনেণ্টালের গেটে ভুট্টোকে ঘেরাও করে ফেলে তার উপরে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ বেরিকেড করে ভুট্টোকে সেই উত্তেজিত জনতার রুদ্র-রোষ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। জনতা ভুট্টো বিরোধী ধ্বনি দিয়ে 'কসাই' বলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। সরগরম হয়ে ওঠে ঢাকা। ইয়াহিয়া প্রেসিডেণ্ট ভবনে মুজিবের সঙ্গে আপোস

আলোচনায় বসার কথা ঘোষণা করলে—'ছাত্রলীগ' ১১ই মার্চ শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া খান তার ৬ ই মার্চের বেতার ভাষণ প্রত্যাহার না করলে, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলে। কিন্তু শেখ মুজিব সেকথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্যে পরামর্শ কমিটি তৈরী করলেন। শেখ মুজিবের এই আপোসমুখী প্রবনতার ফলে ছাত্রলীগের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, 'ভাঙনের' মুখোমুখী দাঁড়ায়। এবং সংখ্যাধিক্য 'রব' গ্রুপের ছাত্ররা ঢাকা শহরে আপোসের পথে না গিয়ে সশস্ত্র লড়াই-এর মিছিলে সামিল বিপ্লবী ছাত্রদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র মিছিলে যোগ দিয়ে পরিস্থিতি আপোসবিরোধী করতে থাকে। ঢাকার পথে পথে ধ্বনিত হতে থাকে—"আপোসের পথ ছাড়ো—পূর্ববাঙালা স্বাধীন করো। কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধরো—পূর্ববাঙলা স্বাধীন করো।" ক্ষমতালোভী শেখ মুজিব আন্দোলনকারী সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবী জনগণকে 'উস্কানি দাতা' ও 'গণতন্ত্র বিরোধী' বলে নিন্দা করলেন। কিন্তু মুজিবের দুর্ভাগ্য; জনতা সশস্ত্র লড়াইয়ের ডাকে বামপন্থীদের নেতৃত্বে তখন অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে তাদের চেতনার স্তর। জনতা আপোসের বিরুদ্ধে ক্রমশই দুর্জয় মনোভাব গড়ে তোলে, এবং আপোস বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে চলতে থাকে। গর্জন চলতে থাকে—আপোস না সংগ্রাম?—সংগ্রাম, সংগ্রাম। সংগ্রাম, সংগ্রাম, চলবেই চলবেই। জঙ্গী জনতার সঙ্গে বামপন্থীদের নেতৃত্বে—সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হতে থাকে ঢাকা ও প্রদেশের বড়ো শহরে—। রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে পূর্ববাঙলার মাটি।

একদিকে মিলিটারীর গুলিতে যেমন বিপ্লবী জনতা শহীদ হচ্ছিলো, অন্যদিকে তেমনি 'জয় বাঙলা'র ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডারা নির্মমভাবে অত্যাচার চালাচ্ছিলো অবাঙালী জনতার উপরে। অবাঙালী ছোটো ছোটো ধনিকদের কাছ থেকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা 'উৎকোচ' গ্রহণ করছিলো পূর্ববাঙলার মফঃস্বল শহরগুলোয়। একদিকে নগদ টাকা খেয়ে—তাদের (অবাঙালীদের) জানমাল রক্ষার আশ্বাস দিয়ে পর মুহূর্তেই তাদের বিষয় সম্পত্তি সর্বস্ব লুট করিয়ে নিয়ে পথের ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত ব্যাপক নিধনযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়নি তারা। সেই চরম বীভৎস পরিণতির দিন ক্রমশই নিকটবর্তী হচ্ছিলো। আর প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডারা এই ধরনের লুটতরাজ চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার

জন্যে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে শান্তি স্থাপনের বুলি আউড়িয়েছে। 'জয় বাঙলা'র ধ্বনি দিয়ে মস্ত বড়ো বড়ো 'বিপ্লবী' সাজার কসরত দেখিয়েছে। অবাঙালীদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে, তাদের মুখের উপরে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দাতা এইসব নরপিশাচের দল যেভাবে নৃসংশ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে, তা কোনো অংশেই পাকিস্তানী মিলিটারীদের বাঙালী হত্যার চাইতে ছোটো নয়। বরং আরো বেশী নৃসংশ।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতার ঘটনাচক্রে আমি নিজেও দীর্ঘ ছয়মাস পূর্ববাঙলার এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছুটে বেরিয়েছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার মতো শত লাঞ্ছনা নিপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্যেও জনসাধারণ সময় ও সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু 'জয়বাঙলা'র ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাবাহিনীর হাতে পূর্ববাঙলার মফঃস্বল শহরের অবাঙালী জনতা আত্মরক্ষার সেই সময় ও সুযোগ একেবারেই পায়নি। মফঃস্বলের অবাঙালীদেরকে (মুসলীম অবাঙালী) সর্বহারা করে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, তাদের মেয়েদেরকে অবাধে ধর্ষণ করে, স্বগৃহে নৃসংশভাবে লোহার রড দিয়ে মাথা থেৎলে দিয়ে, চাকু দিয়ে পেট ফাসিয়ে দিয়ে, গুলি করে বুক ফুটো করে হত্যা করা হচ্ছিলো। এবং সব থেকে মর্মান্তিক হলো—মিলিটারীরা মফঃস্বল শহরগুলো পুনর্দখল করার পূর্বমুহূর্তে মুজিবের অনুসারীরা জেলখানার মধ্যে (গুলি খরচ না করে) কুপিয়ে কুপিয়ে শত শত অবাঙালী নারী ও পুরুষকে খুন করে পালিয়ে যায় শহর ছেড়ে দিয়ে। অবাঙালী শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পায়নি এই নৃসংশ হত্যাযজ্ঞ থেকে। অবাঙালী পুরুষ-নারী-বৃদ্ধ-শিশু কেউ আত্মরক্ষার সময় পায়নি। যারাও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধরে—তারাও ধরা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়েছে গুণ্ডাবাহিনীর হাতে। ঢাকার বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলেও নির্মূল করা হয়েছে অবাঙালী-দেরকে। হিটলারের ইহুদী হত্যার সঙ্গেই কেবলমাত্র 'জয় বাঙলা'-ওয়ালাদের এই অবাঙালী হত্যার নৃসংশতার তুলনা হতে পারে। অথচ আমি আশ্চর্য ও বিস্মিত হয়েছি—একমাত্র ই. পি. সি. পি. এম. এল ছাড়া প্রগতিশীল নামধারী (মওলানা ভাসানী পর্যন্ত) এই নৃসংশ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ওই সময়ে, কিম্বা তার পরবর্তী সময়ে কোনোরকম প্রতিবাদ করেনি। পূর্ববাঙলার মস্কোপন্থীরাও 'জয়বাঙলাওয়ালাদেরই' স্বার্থবাহী হিসেবে এই

মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রসার ঘটিয়েছে। পৈশাচিক উল্লাসে 'বিহারী নিধন' শ্লোগান দিয়েছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, 'জয়বাঙলা'র ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডারা যদি 'বিহারী' শ্লোগান তুলে পূর্ব বাঙলায় অবাঙালী হত্যায় লিপ্ত না হতো তাহলে 'বিহারী'রাও পরবর্তী সময়ে মিলিটারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যাপকভাবে বাঙালী নিপীড়নে অংশগ্রহণ করতো না। সব অবাঙালীরাই ইয়াহিয়া খানের সমর্থক ছিলেন। পূর্ববাঙলার প্রচুর অবাঙালী, ভাসানী-তোয়াহার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক হিসেবে বিভিন্ন গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। এবং তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী। পূর্ববাঙলার বুকে সেই পুরাতন মুসলীম লীগের শ্লোগান, তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের (হিন্দু-মুসলমান) মতোন শেখ মুজিবের 'জয় বাঙলা' শ্লোগান জন্ম দিলো সাম্প্রদায়িক বিভেদের। জনতাকে করা হলো বিভক্ত। যার মারাত্মক পরিণতি হিসেবে শুরু হয়েছিলো হিন্দু-মুসলীম জনতার মধ্যে চরম বিদ্বেষ। আওয়ামী লীগ 'জয়বাঙলা'র আড়ালে ফ্যাসিবাদকেই জাগিয়ে তুলছিলো পূর্ববাঙলায়। যদি সামন্তবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজিবাদ বিরোধী কর্মসূচীর মাধ্যমে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা' গঠন করার আওয়াজ দেয়া হতো (ই. পি. সি. পি. এম. এল'এর ডাক ছিলো) তাহলে জনগণের মধ্যে বাঙালী অবাঙালী, হিন্দু-মুসলীম এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে জনগণের বৃহত্তর ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে শোষক ও শাসকশ্রেণী তাদের হাতকে কিছুতেই শক্তিশালী করতে পারতো না। এক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টি (এম. এল) সঠিক পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করলেও উগ্রজাতীয়তাবাদের স্রোতের সামনে সেই বিপ্লবী অসাম্প্রদায়িক শ্লোগান সর্বত্র শক্তিমন্ত্র ভিত্তি স্থাপন করতে পারলো না। যেহেতু শেখ মুজিবই তখন একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। স্বয়ং শেখ মুজিবই কমিউনিষ্ট পার্টি (এম. এল)র এই শ্লোগানের বিরোধীতা করে কমরেডদের উপরে তার গুণ্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে একটা মারাত্মক পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিলেন। তবুও বলবো, কমিউনিষ্ট পার্টি (এম. এল) অনেকটাই তার সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে ও চারু মজুমদারের ভুল রণকৌশল গ্রহণ করে ওই সময় উগ্রজাতীয়তাবাদের স্রোতের মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় নি। যদিও ই. পি. সি. পি. এম. এল (বর্তমানে সি. পি. এম. এল) এখন আর চারু মজুমদারের ভুল রণকৌশল

অন্ধের মতো আকড়ে ধরে পার্টিকে অগণতান্ত্রিকতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়ার নীতিতে বিশ্বাস করে না। এখন এই পার্টি সঠিক ভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙ চিন্তাধারার আলোকে পূর্ববাঙলায় সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করার কাজে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। বর্তমানে এই পার্টি ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন থেকে সাংগঠনিক অস্তিত্বকে শক্তিশালী করার জন্যে তাদের সমস্ত বিপ্লবী কার্যক্রম আণ্ডার গ্রাউণ্ডে নিয়ে গেছে। এবং রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা পদানত 'বাঙলা দেশকে মুক্ত করার জন্যে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে পাক্রর রাজনীতিকে সাংগঠনিক ভাবেই তুলে ধরেছেন। এই পার্টির নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা 'বাঙলা দেশ' সৃষ্টির সময় থেকেই আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক করছেন। পার্টির সেক্রেটারী সুখেন্দু দস্তিদার, যিনি পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার সময় থেকে অত্যাবধি সুদীর্ঘকাল যাবৎ আণ্ডার গ্রাউণ্ডে রয়েছেন; তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের দিনে সূর্যসেনের সহকর্মী হিসেবে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছেন ও পরে ধৃত হয়ে দীর্ঘদিন 'আন্দামানে' কাটিয়েছিলেন। আরো অনেক নেতা ও পার্টির সব কর্মীরাই বর্তমানে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থেকে কাজ করছেন। কেন না শেখ মুজিবের ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাবাহিনী প্রকাশ্যভাবে এই পার্টির কোন নেতা বা কর্মীকে পেলে গুলি করে হত্যা করার অধিকার রাখে। এই প্রসঙ্গে আমি যথাস্থানে প্রকৃত ঘটনার অবতারনা করবো।

১৪ই মার্চ ১৯৭১-এর সকালে ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে জনতার সশস্ত্র লড়াই করার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা ও হাজারো শহীদের রক্ত পেরিয়ে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির লিপ্সায় আপোস আলোচনা শুরু করে। এই আলোচনায় অংশ নেয়ার পুর্বে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কুখ্যাত কমিউনিষ্ট ঘাতক ফারল্যাণ্ডের সঙ্গে শেখ মুজিবের চূড়ান্ত আলোচনা হয়। এবং ফারল্যাণ্ড এরপর শুধু পূর্ববাঙলা থেকেই বিদায় নিলো না একেবারে পাকিস্তান ত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের অবাধ বিচরণ ভূমি থাইল্যাণ্ডে গিয়ে অবস্থান করতে থাকে। শোনা যায়— ওই সময় মার্কিন সপ্তম নৌবহর থাইল্যাণ্ডের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছিলো। এ থেকেই সাজানো নাটকের পটভূমিকা ও পরবর্তী অভিনয়ের ঘটনাবলী পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। যাই হোক, শেখ মুজিব আপোস আলোচনা অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। শুধু ইয়াহিয়ার সঙ্গেই নয়,

ভুট্টোসাহেবের সঙ্গেও দফায় দফায় আলোচনা চলতে থাকে শেখ মুজিবের। এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুজিবের উপদেষ্টা কমিটি ও ভুট্টো সাহেবের উপদেষ্টা কমিটির মধ্যেও চলতে থাকে রুদ্ধদ্বার কক্ষ বৈঠক। মাঝে মাঝে সবকিছু গোপন রেখে—শেখ মুজিব সাংবাদিকদের কাছে বলছিলেন—"ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার আলোচনা সন্তোষজনক পরিবেশে এগিয়ে চলেছে।" ব্যস্ ওই পর্যন্তই; আর কোনো কথাবার্তা শেখ মুজিবের মুখ থেকে তখন বেরোয় নি। তিনি দেশবাসীকে ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করার উপদেশ খয়রাৎ করে গোলটেবিলের গোলমাল মেটানোয় মশগুল হয়ে রইলেন। আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী তাজুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের কাছে বলেন, "এই নাজুক পরিস্থিতিতে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু গোপন রাখাই মঙ্গলজনক হবে।" এই ধরণের ভাওতাবাজী কথাবার্তায়—ধৈর্যহীন জনতার মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে হতাশার। প্রশ্ন জাগে বিভিন্ন মহলে—শেখ মুজিব পুর্ববাঙলার অধিকারের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ভবনে এতদিন ধরে কিসের আলোচনা করছেন? ২৫শে মার্চ কি সত্যিই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে?

মুজিব-ইয়াহিয়া, মুজিব-ভুট্টো, চলতে লাগলো দফায় দফায় আলোচনা। আর পুর্ববাঙলায় চলতে লাগলো মিলিটারী-জনতার সংঘর্ষ; মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ হারাতে লাগলো অসংখ্য মানুষ; আর 'জয় বাঙলা'ওয়ালাদের হাতে খুন হতে লাগলো 'অবাঙালী' নারী-শিশু-পুরুষ; আর তাদের সম্পত্তির অবাধ লুটতরাজ। কিন্তু এসব কোনো কিছুই মুজিবকে টলাতে পারলো না। তিনি আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

পনেরো

১৯৭০ সনের ১২ই নভেম্বর পুর্ববাঙলার সামুদ্রিক অঞ্চল সমুহের উপর দিয়ে মহাকালের যে প্রাকৃতিক তাণ্ডব বয়ে গিয়েছিলো—সেই সব উপদ্রুত অঞ্চলের সর্বহারা ছিন্নমুল মানুষদের তখনো পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিশ্বের বহু দেশ এই ছিন্নমুল মানুষদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিলো। তার মধ্যে গণচীনের সাহায্যের পরিমান হলো সর্বাধিক। এছাড়া আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, পুর্বজার্মানী', পশ্চিম জার্মানী, ভারত সহ বহু দেশ পুর্বাবাঙলার ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে

বিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্যে সাহায্য-সামগ্রি যে সব পাঠাতে শুরু করেছিলো—সেইসব সাহায্য-সামগ্রিও (যা পূর্ববাঙলায় পৌছেছিলো) যথাযথ ভাবে উপক্রুত অঞ্চলে বিলি-বণ্টন হচ্ছিলো না। আয়ুবের কালোদশকের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী স্থানীয় লোকজন এই সব সাহায্য সামগ্রি আত্মসাৎ করছিলো—বিধ্বস্ত মানবতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। কোথাও কোথাও ছিন্নমূল জনতার হাতে আয়ুবের চেয়াম্যান-মেম্বার ও আওয়ামী লীগের তথাকথিত সংগ্রাম কমিটির হোতারা মার-পিট্টি খাচ্ছিলো। নানা ভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছিলো। এই 'রিলিফ' দেয়াকে কেন্দ্র করেও উপক্রুত অঞ্চলে শুরু হয় তীব্র উত্তেজনা ও জনসভা-বিক্ষোভ মিছিল, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদেরকে 'ঘেরাও' করার আন্দোলন। বরিশালে অনুষ্ঠিত এক ভূখা মিছিলের উপরে আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা আক্রমণ করে—কমিউনিষ্টদের "উস্কানী" বলে ন্যক্কারজনক ঘটনার সৃষ্টি করেছিলো ওই সময়। এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানে যেসব সাহায্য সামগ্রি এসে পৌছেছিলো বিদেশ থেকে, সেই সব সাহায্য-সামগ্রি বিমানে ও বেশীরভাগই জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে আসা হচ্ছিলো; কিন্তু মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া ঢাকায় আলোচনা করার সময় থেকে জাহাজে করে বাত্যা বিধ্বস্ত জনপদের জন্যে সাহায্য-সামগ্রি আসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এবং সাহায্যের বদলে ওই সব জাহাজ বোঝাই করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা শুরু হয় পূর্ববাঙলার মাটিতে। শুধু সৈন্যই নয়, তার সঙ্গে যাবতীয় (ট্যাঙ্ক ও দূরপাল্লার ভারি কামান ও মর্টার সহ) সামরিক সাজ-সরঞ্জামও আসতে থাকে। এ থেকে পূর্ববাঙলার জনগণ যখন পরিস্কারভাবেই ধারনা করতে থাকে যে, ইয়াহিয়ার একদিকে 'ঐক্যমতে' পৌছার আপোস আলোচনা, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রেজিমেণ্টের সৈন্য ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম আমদানী; এর পেছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে; বিশেষ করে বামপন্থীরা সুস্পষ্টভাবে এই সৈন্য আমদানী'কে পূর্ববাঙলার বিরুদ্ধে এক 'মারাত্মক চক্রান্ত' বলে অভিহিত করে হাতিয়ার তুলে নেবার ডাক দেন ও জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা ও প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়; সেই সময়ও শেখ মুজিব—'শান্তিপূর্ণ মীমাংসার' পথে হালুয়া-রুটি নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে ব্যস্ত।

২৩শে মার্চ সুদীর্ঘ দেড় যুগ কাল 'পাকিস্তান প্রজাতান্ত্রিক দিবস' হিসেবে সারা দেশে পালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু ৭১'এর ২৩শে মার্চ

ছাত্রলীগ সংগ্রাম কমিটি—পূর্ববাঙলায় 'প্রতিরোধ দিবস' ও "স্বাধীন বাঙলাদেশ দিবস" হিসেবে পালন করার ডাক দিলে সমগ্র প্রদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ তা পালন করে। এবং ওইদিন পূর্ববাঙলার সর্বত্র 'স্বাধীন বাঙলা দেশ'-এর পতাকা উত্তোলন করা হয়—পাকিস্তানের পতাকায় আনুষ্ঠানিক ভাবে অগ্নি-সংযোগের মাধ্যমে। ঢাকার বিভিন্ন সংবাদপত্র ২৩শে মার্চ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে 'স্বাধীন বাঙলা দেশ'-এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। বাঙালী মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি হামিদুল হক চৌধুরীর কাগজ পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় দেখা যায়—আমেরিকান ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, বাটা, গ্ল্যাক্সো, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, প্রভৃতি বাঙালী ধনিক গোষ্ঠী, আমেরিকা ও ব্রিটেনের কোম্পানীগুলি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে ২৩শে মার্চে বিজ্ঞাপন দিয়ে 'স্বাধীন বাঙলা দেশ'-এর ডাককে সমর্থন করে। আমেরিকান ও ব্রিটেনের কোম্পানীগুলোর বিজ্ঞাপন দেখে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তারা শেখ মুজিবের পেছনে দাঁড়িয়ে পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসকে বহুকাল আগে থেকেই মদত দিয়ে আসছিলো। জনতার সক্রিয় সশস্ত্র লড়াইয়ে সমস্ত রঙ বেরঙের শোষণযন্ত্র বিরোধী অর্জিত 'স্বাধীনতা' এক জিনিস, আর সাম্রাজ্যবাদের, সম্প্রসারণবাদের ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক উগ্রজাতীয়তাবাদের ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে 'স্বাধীনতা নামক প্রগতিবিরোধী ঘাঁটি স্থাপনের 'স্বাধীনতা' হলো পরাধীনতার চূড়ান্ত পরিণতি। জনগণ যে স্বাধীনতার জন্যে শেখ মুজিবের পেছনে কাতারবন্দী হয়েছিলো—সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিলো—সমস্ত শোষণ-পীড়ন বিরোধী সুখী-সমৃদ্ধিশালী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খা। কিন্তু যার নেতৃত্বে জনগণ সেই স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই করতে সমবেত হয়েছিলো—সেই নেতৃত্ব হলো—শোষণ অবসান করার ধাপ্পা মেরে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণ-বাদীদের শোষণ ও পীড়নকে সুসংবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে জনগণের কোনো দোষ নেই। মনে রাখতে হবে "জনগণ যা চায়, তা সঠিক ভাবেই চায়, কিন্তু কোন্ পথে সেই চাওয়া পূরণ হবে, সেই পথ তারা জানে না। কমিউনিষ্টরা হলো শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী ; একমাত্র তাঁরাই জনগণকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে পারে।" কিন্তু পূর্ববাঙলায় কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) জনতাকে পরিপূর্ণভাবে সেই সঠিক পথে পরিচালিত করার মতো সাংগঠনিক অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তার প্রস্তুতি

ছিলো না। প্রস্তুতি থাকলে পূর্ববাঙলার ইতিহাস (ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের সেনাবাহিনীকেও ঠেকানো সম্ভব হতো, প্রতিহত করা সম্ভব হতো—ফ্যাসিবাদ ও পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর পৈশাচিক হামলাকে) অন্যভাবে লেখা হতে পারতো।

২৩শে মার্চ সমগ্র পূর্ববাঙলায় 'প্রতিরোধ দিবস' 'স্বাধীন বাঙলাদেশ দিবস' 'নতুন পতাকা' উত্তোলোন করার মাধ্যমে পালিত হলেও; প্রদেশ ব্যাপী জনগণের মধ্যে তুমুল জঙ্গী মনোভাব উত্তাল থাকা সত্বেও 'বঙ্গবন্ধু' আবারো নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করলেন "আমি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চাই।" এবং সেই পুরোনো কথাটারও সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করলেন—"সেই সব চেয়ে ভালো সিপাহসালার, যে কম রক্তপাতে জয়লাভ করতে পারে।" যে নেতৃত্ব তার দেশের শত শত মানুষের রক্তপাতের বিনিময়ে হাতিয়ার তুলে ধরার আহ্বান জানায় না, যে নেতৃত্ব সমগ্র জাতি তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ থাকা সত্বেও আপোসের চেয়ারে বসে হালুয়া রুটির ভাগাভাগি করার মতোন ঘৃণ্য প্রবৃত্তি পোষণ করে; সেই নেতৃত্ব কি করে নিজেকে সিপাহসালার বলে আত্মগড়িমা জাহির করতে পারে? শেখ মুজিব সিপাহসালার বটেই; তবে ক্রান্তিকারী সিপাহসালার তিনি নন; আপোস করার দক্ষ সিপাহসালার তিনি। কি করে বার বার জনগণের লড়াইকে শোষক ও শাসক শ্রেণীর পদমূলে অবনত করা যায়; তিনি তার চমৎকার ক্ষমতা ও দক্ষতা খুব ভালোভাবেই রাখেন।

শেখ মুজিব কি জানতেন না যে—তার সঙ্গে ইয়াহিয়া খান আলোচনা টেবিলে বসে যখন খোশমেজাজে কথা বলছে; সেই সময় সামরিক বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে ঢাকা শহরের বাঙালী পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র জমা নেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়? বাঙালী পুলিশবাহিনীকে অস্ত্র জমা দিতে বললে পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্ট অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করেন? তিনি কি খবর রাখেন না যে, জয়দেবপুরে অবস্থিত পূর্ববাঙলার অস্ত্র কারখানাটি সামরিক বাহিনীর সেনারা দখল করতে এলে বামপন্থীদের নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্র জনতা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তুমুল সংঘর্ষ হয় উভয়পক্ষের মধ্যে? পরে বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বিদ্রোহী বাঙালী সেনারা জনতার সঙ্গে সামিল হয়ে। প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে অস্ত্র কারখানাটি নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হয়? তিনি কি জানেন না যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ষাট হাজার সৈন্য

আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণের জন্যে অপেক্ষা করছে দুর্জয় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনতার দুরন্ত 'প্রতিরোধ প্রাচীরে' বাধাপ্রাপ্ত হয়ে? তিনি কি জানতেন না যে এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে পূর্ববাঙলার 'স্বাধীনতাকামী' জনগণকে কবরে পাঠানোর জন্যে? তিনি কি জানতেন না যে, চট্টগ্রামের বন্দর এলাকা দুর্জয় শ্রমিক জনতার রক্তে ঢল নেমেছে? তিনি কি জানতেন না যে, তাকেও গ্রেফতার করা হবে? তিনি কি জানতেন না যে, তিনি সি. আই. এ 'র‍্যাড' ও কে. জি. বি-র সাজানো নাটকের নায়ক? তিনি কি জানতেন না যে, সেই নাটকের নাম 'স্বাধীন বাঙলা' এবং ভুট্টো, ইয়াহিয়া, সেই নাটকের প্রতিনায়ক? আর আমেরিকা, রুশিয়া ও ভারত এই ঘটমান নাটকের প্রম্প্‌টার?

শেখ মুজিব অনেক কিছুই জানতেন, (যা তার দলের গোয়েন্দারাও জানতো না) এবং জানতেন বলেই তিনি খুন না হয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিন্তু তার 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার' অন্যতম সহনায়ক কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন তো গ্রেফতার হলেন না? তাকে পচিশে মার্চ রাত্রিতেই সর্বপ্রথম ঢাকা শহরে তার এলিফ্যাণ্ট রোডের বাড়িতে নৃসংশভাবে খুন করেছিলো পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা। পঁচিশে মার্চ রাত্রিতে তিনি কি খুন হয়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন যে, তিনি সি. আই. এ-এর কিম্বা ভারতীয় 'র‍্যাড'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নন? তাহলে তো এই সাজানো নাটকে সি. আই. এ-এর ইনফ্লুয়েন্সে নিশ্চিত ভাবেই কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের মতন একজন সুদক্ষ সামরিক প্রজ্ঞাকে নিশ্চয়ই জীবন দিতে হতো না। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন শেখ মুজিবকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করেছিলেন আমার কাছে। শেখ মুজিবের সঙ্গে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো; যিনি শেখ মুজিবের আইন উপদেষ্টা ছিলেন, সেই ব্যারিষ্টার কামাল হোসেনের ইতিহাস কি? কেন তাকেও শেখ মুজিবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো অক্ষত দেহে? শেখ মুজিব কি জানেন না ব্যারিষ্টার কামাল হোসেনের পরিচয়? শেখ মুজিব সে পরিচয় ব্যক্ত না করলেও— ইতিহাস সে পরিচয় নিশ্চিত ভাবেই উদ্‌ঘাটিত করে। যে লোকটি ব্যারিষ্টারী পাশ করে, বামপন্থীর ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে পূর্ববাঙলায় এসে ভাসানী নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেছিলো, এবং 'খুবই সংগ্রামী' ভূমিকা নিয়ে ন্যাপের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে, বক্তৃতা দিয়ে প্রগতি

শিবিরে পরিচিত হয়েছিলো এবং ক্ষাপে দাঁড়াতে পেরে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী'র ভেতরকার বহু খবর জানবার মওকা পেয়েছিলো ;...পরে তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার আশঙ্কায় সময় থাকতে নিজেই আওয়ামী লীগে যোগদান করে শেখ মুজিবের আইন উপদেষ্টা হয়েছিলো ; সেই কামাল হোসেন হচ্ছে পূর্ববাঙলায় মাকিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ-র একজন বিশ্বস্ত এজেন্ট। যে গ্রেফতার হয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে বসবাস করার 'মর্যাদা' পেয়েছিলো। ব্যারিষ্টার কামাল হোসেন সি. আই. এ-র একজন খুবই উঁচু পদের এজেন্ট হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ববাঙলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের নকশা তৈরীতে সাহায্য করেছিলো।

অনেকেই আলোচনায় কারণ দেখিয়ে বলেছেন যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে আপোস আলোচনা চালাবার নাম করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম আমদানী করার সময় নিয়েছিলো। না, সময় শুধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই নেয় নি 'আপোস' নাটকে অভিনয় করে। 'বঙ্গবন্ধু' নিজেই এই সময় দিয়েছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই 'পুতুল নাচের খেলা'র বৈশিষ্ট হলো তার সেবাদাসদের পারস্পরিক স্বার্থের ঝগড়াকে তীব্র করে, একের অগোচরে অপরকে পথের নির্দেশ দেয় কামড়াকামড়ি করার। ফলে উভয়পক্ষই মনে করে যে, মার্কিনী সমর্থন ও সহযোগিতা তাদেরই পক্ষে নিয়োজিত রয়েছে। পূর্ববাঙলার ক্ষেত্রে এই কৌশল নিয়েই মাকিন সাম্রাজ্যবাদ তার ষড়যন্ত্রের জাল ক্রমশই বিস্তীর্ণ করেছে। এবং সে সফলকাম হয়েছে। 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'র নেপথ্য ঘটনার মূল পাণ্ডা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, একথা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আয়ুবখানেরও অজানা ছিলো না ; কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কোনো ক্ষমতাই ছিলো না যে ; মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে আসামীর কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করায়। এ জন্যেই ওই ষড়যন্ত্রের পার্শ্ব সহচর ভারতকেই দায়ী করে এই মামলা শুরু করেছিলো প্রেসিডেন্ট আয়ুব। তাই ভারতও ওই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলো ; পুরোনো নায়ক শেখ মুজিবের হাত দিয়েই সেই মোক্ষম সুযোগ এসে গেলো ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের কব্জার মধ্যে। যাই হোক—সমস্ত ঘটনাটাই ষড়যন্ত্র-কারীদের অনুকূলে এসে গেল। ফলে পূর্ববাঙলার নিরস্ত্র অপ্রস্তুত জনগণের উপরে নেমে এলো চরম দুর্যোগের বিভীষিকাময় কালো রাত্রি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফারল্যাণ্ড, মুজিবের সঙ্গে সর্বশেষ গোপন রুদ্ধদ্বার কক্ষ

বৈঠক করে থাইল্যাণ্ডে চলে যাওয়ার আগে থেকেই ছাত্রলীগের 'রব গ্রুপ'-এর ছেলেরা সশস্ত্র হয়ে ওঠে খুবই সামান্য সময়ের মধ্যে। যদিও ওই সামান্য অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানের সুশিক্ষিত আধুনিক মারনাস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার অর্থ হলো—'ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সিঞ্চন'-এর মতো প্রহসনাত্মক; তবুও এই অস্ত্র দেয়ার অর্থ ছিলো—'ছাত্রলীগ'কে উত্তেজিত করে তোলা। যাতে পূর্ববাঙলার 'বিচ্ছিন্নতা'র আন্দোলন অব্যর্থ হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগের ছেলেদের (রব গ্রুপ) মুখে সেই সময় খুবই উত্তেজনামূলক শ্লোগান শোনা গেছে। অনেকেই দম্ভ করে বলেছে যে, "শেখ সাহেব বিশ্বাসঘাতকতা করলেও—আমরা 'স্বাধীনতা'র জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছি। যেকোনোও ভাবে আমরা পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করবোই পাকিস্তানী উপনিবেশের হাত থেকে।"

রব গ্রুপ-এর এই ধরনের উক্তির সত্যতা সপ্রমানিত। এরাই বারংবার শেখ মুজিবের উপরে 'আপোস' এর পথ ছেড়ে দিয়ে 'স্বাধীনতা' ঘোষনার জন্যে প্রচণ্ডভাবে চাপ দিয়ে এসেছে। যদিও নির্বাচনী প্রচারনার সময় থেকে কমিউনিষ্টদেরকে প্রতিহত করার জন্যে শেখ মুজিব নিজেই কমিউনিষ্টদের 'সমাজতন্ত্র' কায়েম করার শ্লোগান দিতে শুরু করেছিলেন, (মুসোলিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করে) ছাত্রলীগের 'রবগ্রুব' তার থেকেও কয়েক ডিগ্রী উপরে গিয়ে 'শ্রেণী সংগ্রাম' 'সমাজতন্ত্র' ও 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধরো—পূর্ববাঙলা স্বাধীন করো' কমিউনিষ্ট (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) পার্টির শ্লোগানকেই নিজেদের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে প্রচার করতে শুরু করেছিলো। 'রবগ্রুপের' একক অস্তিত্ব তখন ছাত্রলীগের মধ্যে শতকরা আশিভাগ এবং প্রকাশ্যে এরাও শেখ মুজিবেরই পথাবলম্বী; এবং যেহেতু ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তির উপরেই পূর্ববাঙলায় বড়ো বড়ো গণসংগ্রামের উত্তাল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে; সেইহেতু ষড়যন্ত্র-কারীরা এই গ্রুপের অস্তিত্বকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো, যা শেখ মুজিবের পক্ষে 'দুর্ভাবনা'র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শেখ মুজিব নিজেই এক সময় আবদুর রবকে তার ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে তিরস্কার করে বের করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আবদুর রব শেখ মুজিবকে 'ছেড়ে যাওয়া'র মতো মারাত্মক ভুল করেনি। ষড়যন্ত্রকারীরা শেখ মুজিবের চরিত্র খুব ভালো ভাবেই জানতো। মাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে গরম বক্তৃতা দিতে পারলেও প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব হলেন ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তি। যার পক্ষে কোনো বড়ো রকমের ঝুঁকি

গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সে ঝুঁকি যদি সশস্ত্র লড়াই করার মতোন রক্তাক্ত ঝুঁকি হয়। তিনি খুব ভালোভাবে জেল খাটতে পারেন; কিন্তু লড়াই কিম্বা আন্দোলন করার চাইতে 'আপোস'-এর পথকেই বেশী পছন্দ করেন। কারণ তাতে ঝুঁকির কোনো বালাই নেই। তার এই চারিত্রিক দুর্বলতার জন্যেই (আয়ুব খান যে ঘটনার পটভূমিকা নিয়ে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করেছিলো) একবার পূর্ববাঙলাকে 'বিচ্ছিন্ন করার' বাঙালী সামরিক সৈন্যদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিলো। ওই পরিকল্পনার সর্বাধিনায়ক কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এই জন্যেই শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন। শেখ মুজিবের দুর্বল ও ভীরু চারিত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্যেই ওই পরিকল্পনার গোপন দলিল ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। এ ঘটনার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

সুতরাং শেখ মুজিবের উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর করলেও খুব একটা ভরসা ছিলো না তাকে দিয়ে। যে কোনো সময় প্রচণ্ড 'চাপ' ও ভীতির মুখে শেখ মুজিব তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারেন (অতীতের অভিজ্ঞতার আলো থেকে) অথচ পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে কমিউনিষ্ট ও গণচীন বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করতে হলে শেখ মুজিবের মতো 'জনপ্রিয়' ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব—এই কারণেও তাকে বাধ্য করার জন্যেই (প্রকৃতপক্ষে 'ছাত্রলীগ'ই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অস্তিত্ব) ছাত্রলীগের মধ্যে 'ফ্যাকশন' তৈরী করে, শেখ মুজিবকে অনেকটা দুর্বল করে রেখে (কারণ মুজিবের ভয় ছিলো, ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে গেলে—ওই সময় আওয়ামী লীগ প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তো) ষড়যন্ত্রের প্রত্যেক পদক্ষেপে তাকে যথাযথ নির্দেশে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর ছাত্রলীগ সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান তুলেছিলো কেন? শ্লোগান তুলেছিলো জনতার উপর থেকে বামপন্থীদের প্রভাবকে স্তিমিত করে দিয়ে, জনগণকে নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা এবং তাদের প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার জন্যে সেই গণসমর্থনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'রবগ্রুপের' অনেক সাধারণ কর্মী প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী সংগ্রামের ডাককে সঠিক মনে করেই আবদুর রব-এর পেছনে সারিবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭০ সনের প্রথম দিকে মওলানা ভাসানী ঢাকার এক জনসভায় একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছিলেন—"আমেরিকা পূর্বপাকিস্তানে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিষ্ট হত্যা যজ্ঞের মতোন একটা পরিস্থিত সৃষ্টি করার জন্যে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে 'কমিউনিষ্ট পার্টি'

গঠন করার চেষ্টা করছে উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধীচক্রের দ্বারা। তারা তাদের তৈরী তথাকথিত কমিউনিষ্টদের দিয়ে সাচ্চা কমিউনিষ্টদেরকে খুন করার জন্যে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার ভান করে, জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হবে যে, কমিউনিষ্টরাই কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়ছে। জনগণও এতে অবশ্যই বিভ্রান্ত হবে।" মওলানা ভাসানীর এই উক্তিতে রাজনৈতিক শিবির সমূহে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, বিশেষ করে বামপন্থী শিবিরের মধ্যে। মওলানা সাহেবের এই তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে, আমেরিকার তৈরী কমিউনিষ্ট কারা; এবং কোন্ সংগঠন থেকে তাদের সেই 'কমিউনিষ্ট পার্টি' গঠন করার পরিকল্পনা।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে 'রবগ্রুপ' সমাজতন্ত্র ও শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান দিয়ে ওই সময় ছাত্রলীগের অপর অংশ (নূরে আলম সিদ্দীকি ও তোফায়েল সমর্থক অংশ) ও আওয়ামী লীগের সমগ্র মিলিত অংশের চাইতেও অনেক বেশী শক্তিশালী অস্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলো। এই ব্যাপক অংশকে নিজের শক্তি হিসেবে ধরে রাখার জন্যেই কৌশলগত কারণে শেখ মুজিবকে আপোস-রফা করার জন্যে হিম্‌শিম্ খেতে হয়েছে। নির্বাচনের পরপরই ঢাকার রমনা গ্রীনে মুজিবের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে—ছাত্রলীগের দুই অংশের মধ্যে পরস্পর বিরোধী শ্লোগান নিয়ে তুমুল মারামারি শুরু হলে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম (যিনি ভারতে বসে 'বাঙলা দেশ' সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এই মারামারি ঠেকানোর জন্যে 'রবগ্রুপের' ছেলেদের উদ্দেশ্যে খেদ প্রকাশ করে বলেন যে; "দুঃখের বিষয়, আমরা ভিন্ন দলের যে শ্লোগানের বিরোধীতা করি, আজ সেই দলের শ্লোগান আমাদের নিজেদের দল থেকেই দেয়া হচ্ছে।" এই উক্তির বিরুদ্ধে 'রব গ্রুপের' ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলামের দিকে রুখে যায়, নানা বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি দিয়ে তাকে বসে পড়তে বাধ্য করে। পরে শেখ মুজিবের সক্রিয় হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো—ওই সময় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের ভেতরে 'রব গ্রুপের' শক্তি কতটা ছিলো তারই বাস্তব দৃষ্টান্ত দেয়া। এছাড়াও 'রবগ্রুপের' সশস্ত্র লড়াই করার শ্লোগানে পূর্ববাঙলার 'বিপ্লবী' বহু নেতা ও কর্মী (আবদুল-মতিন-আলাউদ্দীন, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার ও তাদের সমর্থকরা) পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে তাদেরকে বিপ্লবী ও প্রগতিশীল বলে আখ্যায়িত করেছিলো। যদিও 'রবগ্রুপ' পূর্ববাঙলার সর্বত্র সাচ্চা বিপ্লবীদের ওপরে হামলা করা থেকে

বিরত ছিলো না। তবুও যেহেতু তারা 'সমাজতন্ত্র' ও সশস্ত্র লড়াইয়ের স্লোগান তুলেছিলো সেইহেতু তারা বিপ্লবী ও প্রগতিশীল। বর্তমান 'বাঙলাদেশ'-এ 'রবগ্রুব' আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'জাতীয় সমাজ-তান্ত্রিক দল' গঠন করেছে।

যাই হোক ২৩শে মার্চে শেখ মুজিবের 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসা'র ঘোষনা ও ২৪শে মার্চে আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'ইত্তেফাক' পত্রিকার "বর্তমানে দেশের অশান্ত পরিস্থিতি ও তীব্র রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসন করার পথ অনেকখানি প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। খুব শীঘ্রই এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে" ও পঁচিশে মার্চ Agence France press-এর রিপোর্টার ব্রায়ান মে'র কাছে—"আমিই একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজম্-এর হাত থেকে বাঁচাতে পারি, এটা কেন পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার বুঝতে পারছে না; এবং যদি তারা আমার সঙ্গে (মতবিরোধ) লড়াই চালিয়ে যায়, তাহলে আমি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বো, এবং কমিউনিষ্টরা আমার নাম করেই আন্দোলন চালিয়ে যাবে; এ ব্যাপারে আমি যদি অতিরিক্ত কনসেশন দিই তাহলে আমি নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলবো; আমি কি করবো, খুবই মুশ্‌কিলে পড়ে গেছি"—শেখ মুজিবের এই কমিউনিষ্ট বিরোধী জঘন্য উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাস হিসেবে—হয় আপোসে, না হয় লড়াই করে পূর্ববাঙলাকে 'দ্বিতীয় ভিয়েতনাম' তৈরী করার জন্যে হয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া না হয় 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে যাওয়া। আগেই উল্লেখ করেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা কিছুতেই পূর্ববাঙলার কাঁচা মালের বাজার ও তাদের স্বীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাজার হাত ছাড়া করতে রাজি ছিলো না। শেখ মুজিব ক্ষমতায় এলে পূর্ববাঙলা 'বিচ্ছিন্ন' না হলেও সেখানে তাদের প্রভাব কিছুতেই অক্ষুণ্ন থাকবে না। ভারতীয় মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদেরকে অধিকতর মার্কিনী সাহায্য দানের ফলে একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়; সেই দ্বন্দ্বের সূত্র ধরেই ভারতীয় মুৎসুদ্দিদের উপরে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা। এবং বাধ্য হয়েই তারা গণচীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। গণচীনও এই সুযোগকে স্বাগত জানায় ও পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের নিজস্ব

(সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত) পুঁজি গঠনে সাহায্য করতে থাকে। মুজিব ক্ষমতায় এলে একদিকে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির ফলে পূর্ববাঙলার বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং মুজিবের গণচীন বিরোধী ভূমিকার দরুণ গণচীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতির ফলে তাদের স্বাধীন পুঁজি বিকাশে বিঘ্ন ঘটা ও পাকিস্তানের উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের মারাত্মক প্রভাবের দরুণ তাদের কোন্‌ঠাসা হয়ে থাকা; ইত্যাদি কারনেই সাম্রাজ্যবাদেরই পশ্চিম পাকিস্তানী সেবাদাস মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের নেতা ভূট্টো ও ইয়াহিয়া খান ও অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা মুজিবের সঙ্গে কামড়াকামড়ি শুরু করে, এবং শেষ পর্যন্ত কোনোরকম আপোস আলোচনায় ঐক্যমতে না পৌঁছে—মুজিবকে ঠেকানোর জন্যে ২৫শে মার্চ রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের নাটকের যবনিকা উত্তোলোন করে।

২১শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চের মধ্যে কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ইয়াহিয়া খান ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট সফর করে। সেখানে তার অবস্থানের সঠিক কোনো খবর বাইরের মহলে পৌঁছেনি। কিন্তু সেখানেই ইয়াহিয়া খান সুপরিকল্পিত নকশা অনুসারে—কি করে অক্রমণ শুরু করা হবে তাই নিয়ে উচ্চপদস্থ সামরিকবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা করে। ইতিপূর্বে গভর্ণর আহ্‌সানকে অপসারিত করে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় পাক-আর্মির কুখ্যাত কসাই লেঃ জেনারেল টিকা খানকে। যে টিকা খান ১৯৫৮ সালে আয়ুবের সামরিক শাসন জারীর পরে বেলুচিস্তানের ঈদের জামাতের উপরে বোমা বর্ষন করার জঘন্য কাজে সহযোগিতা করেছিল। 'মুসলীম বিশ্বে' এক জর্ডন ছাড়া এই ধরণের পৈশাচিক কাজের আর কোনো নজীর নেই। ১৯৭১ সনের পঁচিশে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভূট্টো তাদের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিহত করার নামে, পূর্ববাঙলার জনগণের উপরে এক সর্বাত্মক আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গেল। আক্রমণ চালানো হলো পূর্ববাঙলার ব্যাপক জনগণের উপরে। ঢাকা শহর আচম্‌কা মেশিনগান ও মর্টারের গোলার আঘাতে কেঁপে উঠলো। আক্রান্ত হলো ই. পি. আর. সদর দফতর পিলখানায়। আক্রান্ত হলো রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর। শুরু হলো সাজানো নাটকের সশস্ত্র অনুষ্ঠান। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া-ভুট্টো এই নাটকের

যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে গেল পঁচিশে মার্চ রাত্রিতে। এই পঁচিশে মার্চেই ১৯৬৯ সনে রাত্রির অন্ধকারে ইয়াহিয়া খান আয়ুবকে অপসারিত করে পাকিস্তানের কর্ণধার হিসেবে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষিপ্ত কুকুরের দল মারনাস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র বাঙালী জনগণের উপরে। চালাতে লাগলো ব্যাপক গণহত্যা, লুট-তরাজ, নারীধর্ষন, অগ্নিসংযোগ সব রকমের পৈশাচিকতা। মুজিবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। বিশ্বাসঘাতক শেখ মুজিব নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী লীগের এম. এল. এ. ও এম. পি.-এর দল ও নেতারা নিরাপদে এসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

ষোলো

বিশ্বাসঘাতক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, বিশ্বাসঘাতক জুলফিকার আলী ভুট্টো। কিন্তু শুধু কি পূর্ববাঙলার এই হত্যা যজ্ঞের জন্যে ওরাই দায়ী? ওরা বিশ্বাসঘাতক আর শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ দেশপ্রেমিক? না, তা নয়। শেখ মুজিব এই সাজানো নাটকের যবনিকা উত্তোলোনের আগেই সব ঘটনার ক্রমানুপাতিক দৃশ্য সংঘটনের খবর জানতেন। তিনি গ্রেফতার হওয়ার আগে তার ধানমণ্ডির বাসভবনে বসে একে একে আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও সাহায্য গ্রহণের যাবতীয় পরামর্শ দিয়ে বিদায় দেন। কেউ কেউ অশ্রু পর্যন্ত ফেলেন। শেখ মুজিব গ্রেফতার বরণ করছেন—এই কথা শুনে পাতি নেতারা অশ্রুপাত করেন। এবং নিরাপদে পূর্ববাঙলার ব্যাঙ্কগুলো লুট করে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভারতে চলে আসেন গাড়ি হাঁকিয়ে। ঢাকার নেতারা প্রায়ই পরিবার-পরিজন নিয়েই সীমান্তের ওপারে চলে যান। আর পূর্ববাঙলার নিরস্ত্র জনতাকে 'গান্ধীবাদী বদমাইসি' আন্দোলনে ঠেলে দিয়ে—তাদেরকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় কামান-মর্টার ও মেশিনগানের মুখে ছেড়ে রেখে ভারতের গণহত্যাকারী ইন্দিরা সরকারের ছত্র-ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে, বড়ো বড়ো দেশপ্রেমিক নেতা সেজে বক্তৃতা ঝারতে শুরু করে দেয়। আর শেখ মুজিব? আগেই বলেছি, তিনি ভালো জেল খাটতে পারেন। আর লড়াই করার পরিবর্তে 'আপোস' করতে

পারেন খুবই ভালোভাবে। কিন্তু লড়াই করা তার চরিত্রের চরমতম বিরোধী। তিনি অনুগত নেতাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বিদায় দিলেন, তারা সবাই নিরাপদে ভারতে চলে গেলো, অথচ তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেলেন না কেন? কেন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করলেন? তিনিও তো নিরাপদে ভারতের মাটিতে সসম্মানে আশ্রয় নিতে পারতেন। তিনি তা করলেন না কেন? কোন্ উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর আওয়ামী লীগ কিম্বা শেখ মুজিব না দিলেও পরবর্তী ঘটনা সমূহের দিকে তাকালেই আমাদের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই ঘটনার সবটাই সাজানো ছিলো; আমার এই বক্তব্য নেহাত উদ্দেশ্য প্রনোদিত যে নয় তার প্রথম কথা হলো শেখ মুজিবের নিরাপদে আত্ম-আশ্রয়ের সুযোগ ও ব্যবস্থাবলম্বনের যথেষ্ট সময় থাকা সত্বেও তার স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করা। এমন কি শেখ মুজিবের বড়ো ছেলে শেখ কামাল পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো কিন্তু শেখ মুজিব পূর্ব-বাঙলায় আত্মগোপন করে থাকার চাইতে, কিম্বা ভারতে আশ্রয় নেয়ার চাইতে ইয়াহিয়ার কাছে আত্মসমর্পনই অধিকতর শ্রেয় মনে করেছিলেন।

আমেরিকা, ভারত, বৃটেন ও সোভিয়েত রুশিয়ার পরিকল্পনা ছিলো যে, আপোসের মাধ্যমে ক্ষমতায় না যেতে পারলে—শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ব-বাঙলাকে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মারফত বিচ্ছিন্ন করা। 'আপোস' ব্যর্থ হলে পাকিস্তান সরকার যে বাধ্য হয়েই পূর্ববাঙলার সমস্ত প্রশাসনিক ও উৎপাদনে অচলাবস্থার পরিস্থিতিকে পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে দোষী করে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এটাও কারো অজানা থাকার কথা নয়। ২৪শে মার্চ বিকেলেই এটা অনেকটা ধারণা করা গিয়েছিলো। পঁচিশে মার্চ বিকেলে সেই ধারণা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। শেখ মুজিব খুব ভালোভাবেই 'কি ঘটতে চলেছে' তা জানতেন। আর সেই জন্যেই তিনি তার দলীয় অন্যান্য নেতাদেরকে 'কি করতে হবে' তা ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ভারত সরকারই সেই সব করে দেবে। আর এই ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি। কেন না তাতে ভারতের পক্ষে প্রচার চালানো ও পূর্ব বাঙলা, ভারত সহ সমগ্র বিশ্বে জনমত গঠন করার জন্যে—শেখ মুজিবের মুক্তি জানানো সম্ভব হবে। সারা বিশ্ব এই প্রচারনায় সহজেই

আকৃষ্ট হতে বাধ্য এই জন্যে যে, শেখ মুজিব হচ্ছেন নির্বাচিত একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। পাকিস্তান সরকার খুবই অন্যায় ভাবে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। এবং শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পূর্ববাঙলার উপরে চালিয়েছে ব্যাপক গণহত্যা ও নির্যাতন। এই সব প্রচারনা স্বাভাবিক কারণেই পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে যে সহায়ক হবে, তাতে কোনোরকম সন্দেহ ছিলো না। বরং শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে, শেখ মুজিবের নাম করেই পূর্ববাঙলা 'স্বাধীন' করার পক্ষে সাহায্য ও সহযোগিতা আদায় করা বেশী সহজ হবে, এবং মুজিব কোথায় আছেন, তাকে কি ভাবে রাখা হয়েছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে (যদিও মুজিবকে জীবিত রাখার সমস্ত পরিকল্পনাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ করে রেখেছিলো) এই সব প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতির উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মারফত পাকিস্তানের উপরে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়ে—পাকিস্তানকে কোনঠাসা করা যে ষড়যন্ত্রকারীদের অনুকূলে তাদেরই স্বার্থোদ্ধারের পথকে সুগম করবে তা জেনেই মুজিব স্বেচ্ছায় ইয়াহিয়া খানের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। আর পূর্ববাঙলার সাড়ে সাতকোটি মানুষকে এই আন্তর্জাতিক 'কমিউনিজম' বিরোধী ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে কামানের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো।

২৬শে মার্চ থেকেই পাকিস্তানের সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চলতে থাকে—। ঢাকার পথে পথে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা, পিলখানায় আচম্‌কা আক্রান্ত হয়ে সামরিক বেরিকেড ভেঙে বেরিয়ে আসা ই. পি. আর. রাজারবাগের অবশিষ্ট পুলিশ, ও আনসার বাহিনীর লোকেরা সামান্য রাইফেল ও মেশিনগান নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সুসজ্জিত আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে চালাতে থাকে লড়াই। ২৫শে মার্চ রাত্রিতে ও পরে কারফিউ জারী করে অন্ততঃ পক্ষে পঁচিশ হাজার নাগরিককে ঢাকা শহরে হত্যা করে হামলাদার বাহিনী। ২৭শে মার্চ পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগ অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করার ডাক দেয়। মফঃস্বল শহরগুলোয় চলতে থাকে বেপরোয়া বিহারী নিধন যজ্ঞ। তখনো কেবল ঢাকা-চট্টগ্রামে হানাদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখী সংঘর্ষ চলছে। ২৬শে মার্চ বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বামপন্থীদের সক্রিয় নেতৃত্বে—চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে হানাদার বাহিনীর আক্রমণ

প্রতিহত করে পালিয়ে আসা অন্যান্য বাঙালী অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করে নেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ববাঙলার 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করেন। এতে আওয়ামী লীগের কোনো নেতৃত্ব ছিলো না। আওয়ামী লীগ মফঃস্বল শহরাঞ্চলে ওই সময় বেপরোয়াভাবে 'বিহারী' নিধন চালাতে থাকে। 'বিহারী' মেয়েদেরকে জোর করে ধর্ষণ করে—পরে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। শিশুদেরকে বেয়োনেট দিয়ে গেঁথে খুন করে। তাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। এতে বাধা দেয়ার কেউ ছিলো না। সমগ্র দেশে চলছে তুমুল উত্তেজনা। পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী তীব্র বিক্ষোভ। সুতরাং 'জয়বাঙলা'র ফ্যাসিবাদী গুণ্ডারা নির্বিচারে 'বিহারী' নিধন চালাতে সক্ষম হয়। সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বল শহরের ব্যাঙ্কগুলোয় আওয়ামী লীগ শুরু করে ব্যাপক লুটতরাজ। কোটি কোটি টাকা লুট করে তারা রাতারাতি ধনকুবের হয়ে ওঠে অথচ ওই সব ব্যাঙ্ক সমূহে বাঙালী জনসাধারণেরই গচ্ছিত অর্থ-কড়ি, সোনা-রূপা ছিলো। আওয়ামী লীগ সেদিকে দৃক্‌পাত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফ্যাসিষ্টরা কখনোই জনস্বার্থের দিকে তাকায় না। 'জনস্বার্থের' শ্লোগান দিয়ে 'জনস্বার্থ' খতম করার পথকেই তারা সুগম করে। 'জয়বাঙলা'ওয়ালারাও সেই সুযোগই গ্রহণ করেছে।

২৬শে মার্চ সকাল থেকেই বিস্ময়করভাবে ভারতীয় বেতার পূর্ববাঙলার ঘটনাবলী নিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করে দেয়। প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর কোলকাতা বেতার থেকে প্রচার করা হতে থাকে "পূর্ববাঙলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈন্যরা ও ই. পি. আর পুলিশবাহিনী মিলিত ডাকে ঢাকার পথে পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে।" এক কথায় বলা যায় যে, ভারতীয় বেতার-যন্ত্রকে কখনো কখনো শেখ মুজিবের নিজস্ব বেতারযন্ত্র বলে মনে হয়েছে। শেখ মুজিবকে ভারতীয় বেতারযন্ত্রই সমগ্র বিশ্বে অকল্পনীয় ভাবে পরিচিত করেছে তাদের আকাশ কুসুম প্রচারের ধারা দিয়ে। এবং ইন্দিরা সরকার পূর্ববাঙলায় ব্যাপক বাঙালী হত্যার দুঃখে অশ্রুপাত করে সহানুভূতি জানাতেও একমুহূর্ত দেরী করেনি। যে ইন্দিরা সরকার তার নিজের হাতকে রক্তাক্ত করেছে পশ্চিমবাঙলায় হাজার হাজার সি. পি. এম. ও সি. পি. আই. এম. এল.-এর নেতা ও কর্মীকে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডা বাহিনী, পুলিশ ও সি. আর. পি দিয়ে খুন করিয়ে যে ইন্দিরা সরকারের পোষা গুণ্ডার দল ও পুলিশ বাহিনী পশ্চিম

বাঙলায় শত শত নারীত্বের শুভ্রতাকে পৈশাচিক ভাবে কলুষিত করেছে, লাঞ্ছিত করেছে, ডজন ডজন বস্তিতে অগ্নিসংযোগ করে বামপন্থীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার তাণ্ডব চালিয়েছে; যে ইন্দিরা সরকারের প্রশাসন দেশে শত শত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যে ইন্দিরা সরকার এখনো পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলখানায় মিথ্যে অভিযোগ উত্থাপন করে বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদেরকে হত্যা করছে; সেই ইন্দিরা সরকার পূর্ববাঙলার বাঙালীদের দরদে চোখের অশ্রু সম্বরণ করতে না পেরে—তাদের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করতে কালবিলম্ব না করার পেছনে যে গভীর ষড়যন্ত্র নিহিত ছিলো, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সাজানো নাটকের পট পরিবর্তনের পালায়—ভারতও তৈরী হয়েছিলো তার ভূমিকা পালন করার জন্যে। এ জন্যেই ২৬শে মার্চ সকাল থেকে ভারতীয় বেতার যন্ত্র খুবই তৎপর হয়ে ওঠে শেখ মুজিবের মহিমা প্রচার করতে। তৎপর হয়ে উঠলো লণ্ডনের বি. বি. সি ও আমেরিকার 'ভোয়া' (voice of America) কিন্তু ভারতের তুলনায় আমেরিকা ও বৃটেনের বেতার-যন্ত্রের প্রচারনা ম্লান বলতে হবে।

এপ্রিল মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত পূর্ববাঙলার মফঃস্বল শহরাঞ্চলে আওয়ামী লীগ নেতা ও কেডারদের আস্ফালোন দেখা গেছে; কিন্তু তার পরে একে একে সবাই পাড়ি দিয়েছে ভারতে। কোলকাতার থিয়েটার রোড হয়েছে 'মুজিব নগর'। আর প্রাসাদ হয়েছে—তাজুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ক্যাপটেন মনসুর আলী, মোসতাক আহমেদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখদের 'অরণ্যবাস।' কৃষ্ণনগর হয়েছে মুজিব নগরের 'আম্রকানন'। গ্যালন গ্যালন মদে মাতাল হয়ে মোসতাক আহমেদ, কামরুজ্জামান সাহেবরা 'বাঙলা দেশ' সরকারের মন্ত্রী সেজে সত্যিই দীর্ঘ নয়মাস কি লড়াইটাই না করেছেন পূর্ববাঙলার জলে জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায়!

বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী লীগ, ষড়যন্ত্রকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের পদলেহী আওয়ামী লীগ, এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখের পরে, ডিসেম্বরের ষোলো তারিখের আগে কখনোও কি বিধ্বস্ত পূর্ববাঙলার মাটিতে পা দিয়েছিলো? এ প্রশ্নের সোজা একটাই উত্তর, তা হলো—না! অথচ পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণে সাড়ে সাত কোটি ছিন্নমূল মানুষ কেবল আশ্রয় খুঁজে, খাদ্যের অন্বেষণে, জলে, জঙ্গলে, গ্রামে-গ্রামান্তরে

কি ভাবে নয়টা মাস যে কালাতিপাত করেছে তার নিখাদ চিত্র পুঁথিতে লিপি-বদ্ধ করা অসম্ভব। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া সেই বিভীষিকাময় নয় মাসের নারকীয় ধ্বংস যজ্ঞের ঘটনাবলী উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণের 'মুক্তিদাতা' আওয়ামী লীগের নেতা ও হোতারা তখন কোথায় ছিলো? পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে 'নেতারা কোথায়?' এই প্রশ্নটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের বিক্ষোভ ক্রমশই দানা বেধে আক্রোশে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে বামপন্থীদেরকে পাশে পেয়ে জনতা তাদের প্রতি বিশ্বাসের হাত প্রসারিত করেছে, বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন গণ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে হানাদার বাহিনীর উপরে আঘাত চালিয়েছে। নোয়াখালিতে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে—কৃষক ও শ্রমিক জনতার গণফৌজ একের পর এক চালিয়ে গেছে বীরত্বপূর্ণ লড়াই। গঠিত হয়েছে গণআদালত। গণআদালতে বিচার হয়েছে দেশদ্রোহীদের। একই সঙ্গে খতম করা হয়েছে পাকিস্তান আর্মির সংবাদ সরবরাহকারীদেরকে ও শ্রেণী শত্রুদেরকে। হাজার হাজার বিঘা জমি—জোতদার, মহাজন ও ইজারাদারদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তা বিলি করা হয়েছে ভূমিহীন সর্বহারা ক্ষেতমজুরদের মধ্যে। এই সব কারণেই নোয়াখালি অঞ্চলে হাজার হাজার সর্বহারা কৃষকেরা ই.পি.সি.পি.এম. এল-এর গণবাহিনীতে এসে যোগ দিয়ে বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেছে। চালিয়ে গেছে ক্রমাগত শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রান্তিকারী লড়াই। ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর নেতৃত্বে এই লড়াই চলেছে নোয়াখালি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোহর ও রাজশাহীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। তার মধ্যে নোয়াখালি, পাবনা, খুলনা ও যশোহর-এর লড়াই সব চাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য।

ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর নেতারা কেউই ভারতে এসে সুখাশ্রয়ে বসে থেকে পূর্ববাঙলায় বিপ্লব করার কথা আওড়ায় নি। কেউ কেউ প্রয়োজনের সময় এলেও, সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে গেছেন পূর্ববাঙলায়, নিজের নিজের এলাকায়। চালিয়েছেন বীরত্বপূর্ণ লড়াই। যোগাযোগ রেখেছেন আক্রান্ত জনগণের সঙ্গে। আশ্বস্ত করেছেন জনসাধারণকে, বিপদে তাঁদের পাশে থাকার কথা বলে। সামান্য ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র ও দেশী হাতিয়ার নিয়ে জনগণের গণবাহিনী খুবই দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে—জনগণের কাছে অভিনন্দিত হতে থাকলে—সম্প্রসারণবাদী ভারতীয় চক্র ও সোভিয়েত

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, পূর্ববাঙলায় বেশী দিন লড়াই চলতে থাকলে, এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব চলে যাবে শেখ মুজিবের বদলে মোহাম্মদ তোয়াহার হাতে। এবং তা হলে তাদের আশার গুড়ে বালি পড়বে। বিশেষ করে ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রের জন্যে সেই পরিস্থিতি হবে খুবই বিপজ্জনক। কারন 'গণচীন'কে প্রতিহত করার জন্যে আন্তর্জাতিক এই ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতাই হবে একদিকে লাল বাঙলা ও অপরদিকে লাল চীনের মাঝে তাদের ঘেরাও হয়ে যাওয়া। সুতরাং সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, বৃটেন ও আমেরিকা প্রাথমিক পর্যায়ে চেষ্টা করল—শেখ মুজিবের মুক্তির মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক মীমাংসা করে—তাড়াতাড়ি শান্তি স্থাপন করে কমিউনিষ্টদেরকে প্রতিহত করতে।

পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগের নেতারা লড়াইয়ের ডাক দিয়ে ভারতে এসে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার সময়ও ভারত সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। ভারত সরকারও প্রথম পর্যায়ে পূর্ববাঙলায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এককভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে দেখে মনে করেছিল, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে লড়াই চালানো অসম্ভব। বরং এই লড়াই চলতে থাকলে পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলবে। কেননা চরম দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী আওয়ামী লীগ লড়াই করার সংগঠন নয়। আপোস করার সংগঠন। সুতরাং কমিউনিষ্টদেরকে ঠেকাতে হলে—তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক মীমাংসা করাই সব থেকে বুদ্ধির কাজ হবে। এ জন্যেই ইন্দিরা গান্ধী বার বার রাজনৈতিক মীমাংসার কথা বলেছে। এবং আওয়ামী লীগের নেতারাও ধরে নিয়েছিল যে, একটা রাজনৈতিক মীমাংসা খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যাচ্ছে; এবং মীমাংসা হলে—যতটুকুই হোক তারা ক্ষমতার কিছুটা অংশ পাবেই। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা পূর্ববাঙলায় জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা বলে—নিজেদের উদ্যোগে এই লড়াইকে অব্যাহত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে, এই লড়াইতে কৃষক শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে—ব্যাপক মেহনতি জনগণের অংশ গ্রহণ করার ভেতর দিয়ে একে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে শেষ লড়াই অবধি এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হলে—অবশেষে ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রকে বাধ্য হতে হয় নতুন কৌশল অবলম্বন করতে। নতুন কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও তার

পদলেহী ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রের বাঁচার আর কোনো পথই ছিলো না।

ভারতের মাটিতে বসে পরামর্শ হলো 'বাঙলাদেশ সরকার' গঠন করার। ভারত সরকারই নিজস্ব উদ্যোগে কাদের নিয়ে এই সরকার গঠন করা হবে তা ঠিক করে দেয়। সেই পরামর্শ অনুসারেই গঠন করা হল 'বাঙলাদেশ সরকার'। শুরু হলো নতুন করে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রের স্বার্থের নতুন খেলা। আর এই খেলার অন্তরালে চলে যেতে হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। ভারত ও সোভিয়েত রুশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হলো সামরিক চুক্তি। যদিও এই চুক্তিকে ইন্দিরা গান্ধী সামরিক চুক্তি নয় বলে লোকসভা ও বাইরে প্রচার করতে লাগলেন; আসলে তার এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বামপন্থী শিবিরকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু ভারত ও রুশের মধ্যে ঐ চুক্তি পুরোপুরি ভাবেই ভারতের পক্ষে দাসত্বমূলক ছিল। সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে তথাকথিত ব্রিটিশ সিংহের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ প্রত্যক্ষ উপনিবেশগুলির ক্রমাগত জাতীয় মুক্তিলাভের ফলে 'দাঁত ভাঙা সিংহ' উপনিবেশহীন হয়ে দুর্বল ও পঙ্গু হওয়ার পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের চেহারা নিয়ে—এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নতিশীল দেশসমূহকে তার অপ্রত্যক্ষ শোষণের লীলাভূমিতে পরিণত করে। এদিকে লেনিনের দেশ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রুশিয়ায়—স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে—বিশ্বাসঘাতক ক্রুশ্চভ, কোসিগিন, ব্রেজনেভ ও পদগর্ণি চক্র নতুন করে উদ্ভব ঘটায় পুঁজিবাদের। আর সেই পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্যে—প্রয়োজন হয়ে পড়ে উপনিবেশের। যেখানে সে তার পুঁজিকে লগ্নী করতে পারবে। ভারত হচ্ছে তার লগ্নী পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র। যেহেতু বিশ্বে নতুন করে আর কোনো দেশকে অস্ত্রের বলে দখল করে—সেখানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণ চালানো একেবারেই সম্ভব নয়, সেইহেতু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের পথ ধরেই সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ—বিশ্বের দেশে দেশে তার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের ফাঁদ পাততে শুরু করে ষাটের দশক থেকেই। যদিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণের মধ্যে চারিত্রিক কোনো ফারাক নেই, তবুও সোভিয়েত রুশিয়ার একটা সাইন বোর্ড রয়েছে—তা হল 'সমাজতন্ত্রে'র; এই সাইন বোর্ড নিয়েই সে তার শোষণের চরম বিকাশ সাধন করতে পারছিল অনায়াসে।

যেহেতু 'উপনিবেশ' ছাড়া পুঁজিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী বিকাশ ঘটাতে পারে না; সেই হেতুই, সাম্রাজ্যবাদ—বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বের দেশে দেশে 'নয়া উপনিবেশ' সৃষ্টির পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নিয়ে শুরু হয় তীব্র দ্বন্দ্ব।

দ্ব্যর্থহীন ভাবেই একথা বলা যায় যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বর্তমানের যে দ্বন্দ্ব; তা মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব নয়। এই দ্বন্দ্ব হচ্ছে 'নয়া ঔপনিবেশিক' শোষণের লীলাভূমি সৃষ্টি করার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই 'পূর্ববাঙলা'কে কেন্দ্র করে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য চাওয়ায় ও লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করায় এবং পূর্ব-বাঙলা ভারত দ্বারা তিনদিক থেকে সামরিকভাবে 'ঘেরাও' হয়ে থাকায়, সব কিছুই ভারতের অনুকূলে এসে যায়; বিশেষ করে পূর্ববাঙলার মস্কোপন্থীরাও আওয়ামী লীগের লেজুরবৃত্তি করায় সোভিয়েত রুশিয়া খুব সহজভাবেই ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রের মাধ্যমে 'পূর্ববাঙলা'র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও 'বাঙলাদেশ'-এর 'স্বাধীনতা' আন্দোলনে সমর্থন দান করে সেখানে জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করে গণচীন বিরোধী প্রচার ও 'নয়াউপনিবেশ' সৃষ্টির পথকে সুগম করে তুলতে পারে খুবই দ্রুততার সঙ্গে। পূর্ববাঙলার ব্যাপারে ভারত যা কিছুই করেছে; তার সবটাই সে করেছে মস্কোর পরামর্শে। ভারত-সোভিয়েত শান্তি চুক্তির আড়ালে—'ভারত-সোভিয়েত সামরিক চুক্তি' হলো 'গণচীন বিরোধী' ষড়যন্ত্র ও পূর্ববাঙলাকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসার যৌথ প্রচেষ্টা চালানোর ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম্‌ গঠন করার ষড়যন্ত্র। অবশ্য এই ষড়যন্ত্রে তারা সকলকাম হয়েছে পুরোপুরি ভাবেই। এই সফলতা যদিও সাময়িক, তবুও পূর্ববাঙলাকে শ্মশান করার পক্ষে এই সাময়িক সাফল্যই যথেষ্ট বলতে হবে।

সতেরো

পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী'র নেতৃত্বে পূর্ব-বাঙলার বিভিন্ন জেলায় যখন চলছিলো বীরত্বপূর্ণ লড়াই, চলছিলো যৌথ কৃষি-খামার গঠনের কাজ বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে, যখন কৃষকের হাত থেকে জমি দেয়ার

জন্যে চলছিলো জোতদার-মহাজন-ইজারাদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেয়ার লড়াই, চলছিলো পশ্চিম-পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর স্থানীয় এজেন্টদের খতম অভিযান; চলছিলো হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সাফল্যজনক গেরিলা লড়াই, এবং গণ-আদালতে অপরাধীদের শাস্তি বিধান, ও শোষণহীন সুখী-সমৃদ্ধিশালী জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের বীরত্বপূর্ণ লড়াই—ঠিক সেই সময়েই ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের বাছাই করা লোকেরা পূর্ববাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঢুকে—পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই না চালিয়ে—মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের উপরে শুরু করে আক্রমণ। আক্রমণকারীরা ছিলো ভারতের কাছ থেকে পাওয়া আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। এবং তাদেরকে ভারতের সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন সামরিক শিবিরে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ও সেনাবাহিনীর লোকেরা যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়ে পূর্ববাঙলার অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলো গোপনে গোপনে। তাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছিলো মার্কসবাদী লেনিনবাদীদেরকে আক্রমণ করে—তাদেরকে শুধু নিরস্ত্র করাই নয়, একেবারে খতম করার জন্যে।

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে যে, ভারত সরকারের ট্রেনিং দেয়া তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর লোকেরা—পূর্ববাঙলায় প্রবেশ করে; মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা যে সমস্ত শ্রেণী শত্রু—জোতদার-মহাজন-ইজারাদার ও তহশীলদাররা গণবিরোধীতার জন্যে গণআদালতের সম্মুখীন হচ্ছিলো, ও যাদের যুগ-যুগ শোষণের হাতিয়ার হাজার হাজার বিঘা উদ্বৃত্ত জমি ছিনিয়ে নিয়ে গরীব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছিলো—সেই শোষকশ্রেণীরই স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে, তাদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে 'মুক্তিবাহিনী'র লোকেরা আক্রমণ চালিয়েছে কৃষক গেরিলাদের উপরে। আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে বিশ্বাস-ঘাতকেরা অকস্মাৎ হানা দিয়ে হত্যা করেছে শত শত কৃষক গেরিলা যোদ্ধাকে। এইভাবে 'মুক্তিবাহিনী' বিভিন্ন জেলায় আক্রমণ শুরু করলে—অবশেষে আক্রান্ত হয়ে ই. পি. সি. পি. এম. এলও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাল্টা আক্রমণ চালাবার। অবশ্য সবক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণ চালানোর কথা বলা হয় নি। যেখানে যেখানে আওয়ামী লীগের মুক্তিবাহিনী 'পারস্পরিক আক্রমণ নয় চুক্তি' মেনে চলবে সেইসব ক্ষেত্রে গণবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়, কেবল মাত্র পাক-হানাদার বাহিনী ও তার স্থানীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে 'মুক্তিবাহিনী' গণবাহিনীর উপরে তস্করের মতো আক্রমণ

চালাবে, ও পার্টির অমূল্য প্রাণ গেরিলাদেরকে হত্যা করবে ; কোনোরকম সাময়িক 'আক্রমণ নয়' মেনে চলবে না, সেইসব ক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয় পার্টি ও তার গণবাহিনী। নোয়াখালিতে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে গণবাহিনী বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলে মুক্তিবাহিনী বারবার জোতদার, মহাজন, ইজারাদার ও তহশীলদারদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে গণবাহিনীর উপরে আক্রমণ করতে থাকে। ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে গণবাহিনীর কৃষক গেরিলাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে থাকলে—মোহাম্মদ তোয়াহা নির্দেশ দেন বাধ্য হয়েই পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে। একদিকে জোতদার, মহাজন, ইজারাদার, তহশীলদার ও তাদের স্থানীয় এজেন্ট টাউট-দালালদের গণবাহিনীর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র ; অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালানো ও তাদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা ; তার উপরে ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রের হাতে গড়া ক্রীড়নক 'মুক্তিবাহিনী'র 'আচমকা আক্রমণ—এই এতগুলো আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে এগিয়ে যেতে হচ্ছিলো গণবাহিনীকে। কি করে এই সব ছোটো-বড়ো শত্রুর আক্রমণের ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়ে গণবাহিনীকে যে টিকে থাকতে হয়েছে ; একমাত্র গণচীনের বিপ্লব চলাকালীন, একদিকে চিয়াং-কাইশেকের কুয়োমিনটাং-এর সেনাবাহিনীর, ও তাদের এজেন্টদের দ্বারা, ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত মাও সে তুঙ-এর ও গণফৌজের লড়াই করে টিকে থাকার যে বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস পূর্ববাঙলায়ও তেমনি করেই বিপ্লবী শক্তিকে লড়াই করে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে।

কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে জাপ বিরোধী যুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেছিলো। কখনো কখনো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পোষা দালাল চিয়াং কাইশেক ওই যুক্তফ্রণ্টের অভ্যন্তরেই 'সুযোগে' পেয়ে ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট হত্যা চালিয়েছে ; এবং জাপ ফ্যাসিবাদীদের কাছে গোপনে খবর পাঠিয়ে কমিউনিষ্ট ঘাঁটিগুলোর অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে। ফলে জাপানী সেনাবাহিনীর দ্বারা মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছে কমিউনিষ্ট বাহিনীকে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির সম্মুখীন হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে টিকে থাকতে হয়েছে তাদেরকে। ঠিক পূর্ববাঙলার ভেতরেও ভারতের তৈরী 'মুক্তিবাহিনী' কমিউনিষ্ট গেরিলাদের শিবির ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে

মুসলীম লীগের পতাকাবাহী জোতদার, মহাজন ইজারাদার, তহশীলদারদের এজেন্ট দ্বারা খুবই গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। ফলে কোথাও কোথাও খুবই মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখে পড়তে হয়েছে গণবাহিনীকে। কোথাও কোথাও গেরিলা আক্রমণের সুবিধাজনক অবস্থান নেয়ার জন্যে সাফল্যজনক পশ্চাদ্‌পসারণ করা সম্ভব হলেও (অর্থাৎ শত্রু যেখানে শক্তিশালী সেখানে আক্রমণ করার নীতি গ্রহণ না করা) বহুক্ষেত্রেই গণবাহিনীর গেরিলারা ঘেরাও হয়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। এবং ওই সব এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা গেরিলাদের আশ্রয় ও তাদেরকে সহযোগিতা দানের অভিযোগে ব্যাপক লুট তরাজ চালিয়েছে; হত্যা করেছে জোয়ান ছেলেদেরকে গুলি করে; জ্বালিয়ে দিয়েছে শত শত ঘর বাড়ি। আর পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করেছে নারীত্বের চরম অবমাননা করে। এই হলো ভারতের তৈরী 'মুক্তিবাহিনী'র মুক্তিযুদ্ধের নমুনা। অবশ্য তারা কিছু কিছু ব্রীজ ও কোথাও কোথাও পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এটা ছিলো তাদের গৌণ ভূমিকা। তাদের মুখ্য ভূমিকা ছিলো কমিউনিষ্ট হত্যা ও তাদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করার জন্যে আক্রমণ পরিচালনা করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ চক্র জানতো যে, এই তথাকথিত 'মুক্তিবাহিনী' কখনোই পূর্ববাঙলায় সুশিক্ষিত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে না। পূর্ববাঙলাকে দখল করতে হলে পাকিস্তানের সঙ্গে সামগ্রিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবেই। এই সামগ্রিক যুদ্ধের পরিকল্পনা অনেক আগেই ভারত সরকার গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। এ জন্যেই পূর্ববাঙলার ভেতরে উত্তেজনা জিইয়ে রাখার জন্যে ভারত সরকার তার 'বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স'-এর বাঙালী সৈন্যদেরকে লুঙ্গি ও সার্ট পরিয়ে আওয়ামী লীগের ট্রেনিং দেয়া লোকজনের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পূর্ববাঙলার ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে—কোথাও কোথাও ব্রীজ ধ্বংস; ও সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর উপরে আক্রমণ চালিয়ে তৎপরতার সঙ্গে গা ঢাকা দিচ্ছিলো। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো; যতদিন না পর্যন্ত আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সর্বাত্মক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হতে পারছে; ততদিনে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রেখে,

যাতে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা জনগণের উপরে তাঁদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে ; এবং কমিউনিষ্টরা যাতে বড়ো রকমের ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপনে সক্ষম না হতে পারে তারই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যতটা সম্ভব কমিউনিষ্টদের তৎপরতা দমন করা ; তাঁদেরকে হত্যা করা ; হত্যা করা সম্ভব না হলে তাঁদের কাছ থেকে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া ; তাঁদের ঘাঁটি এলাকা বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করা ; জনগণের কাছে তাঁদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুচর বলে চিহ্নিত করা ; এই সব পরিকল্পনা নিয়েই পূর্ববাঙলার অভ্যন্তরে ভারতের তৈরী 'মুক্তিবাহিনী' তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলো একের পর এক। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই সুপরিকল্পিত আক্রমণের ধারা অব্যাহত ভাবে চলতে থাকলেও—প্রায়শই কমিউনিষ্টরা নিজেদেরকে ধৈর্যের সঙ্গে 'মুক্তিবাহিনী'র সঙ্গে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত রেখে তাঁদের বিপ্লবী সংগঠনকে আরো বেশী শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আত্মনিয়োগ করেছে একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে (কৃষকদের মধ্যে) সংগঠন গড়ে তুলতে ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাহিনীর কাছ থেকে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র দখল করে নিতে। এবং মুক্তাঞ্চলের পরিধি বিস্তৃত করতে।

ই. পি. সি. পি. এম. এল. ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী গ্রুপগুলো এমন কি পশ্চিম বাঙলার বহু বামপন্থী শিবিরের মধ্যেও এরকম একটা ভ্রান্ত ধারনা ছিলো যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে 'যুক্তফ্রণ্ট' গঠন করে পূর্ববাঙলায় কমিউনিষ্টদের উচিত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ; এবং এই 'যুক্তফ্রণ্ট'কে কৌশলগত দিক থেকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে লড়াই চালিয়ে গিয়ে নিজেদের হাতে লড়াইয়ের সামগ্রিক নেতৃত্ব নিয়ে নেয়া। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হলো ; বিপ্লবীরা যেমন ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ; তেমনি প্রতিক্রিয়াশীলরাও ইতিহাসের পাঠ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে নতুন ভাবে বিরোধী শিবিরকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করার কৌশল গ্রহণ করে। প্রতিক্রিয়াশীলরাও ইতিহাসে প্রগতিশিবিরের হাতে বিধ্বস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের পথকে যথাসম্ভব পরিহার করে নয়া পথে অগ্রসর হয়। গণচীনের অভ্যন্তরে কুয়োমিনটাঙ বাধ্য হয়েই (আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুসারে) কমিউনিষ্টদের সঙ্গে 'যুক্তফ্রণ্টে' এসেছিলো। এটা কমিউনিষ্টদের জন্যে ছিলো আশীর্বাদ স্বরূপ। কেননা এতে কমিউনিষ্টরা প্রচুর আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করতে পেরেছিলো। যার ফলে পরবর্তী পর্যায়ে কুয়োমিনটাঙ-এরই বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টরা ওই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে

সক্ষম হয়েছিলো। প্রতিক্রিয়াশীলরা খুব ভালভাবেই জানে যে, কমিউনিষ্টরা একবার অস্ত্রের অধিকারী হলে সেই অস্ত্র প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে একদিন। যেমন চীনের কুয়োমিনটাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলো মাও সে তুঙের বাহিনী। পূর্ববাঙলার ক্ষেত্রেও সেই একই ভয় ছিলো আওয়ামী লীগ ও তাদের নেপথ্য মুরুব্বি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের সম্প্রসারণবাদ প্রভৃতিদের। তাই প্রথম থেকেই পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগ মফঃস্বল শহরের সমস্ত অস্ত্রাগার থেকে স্থানীয় প্রশাসকদের মারফৎ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হলেও সেই অস্ত্র বামপন্থী শিবিরের কাউকেই দেয়নি। সি.এস.পি. অফিসাররা (পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস) তাদের ট্রেনিং অনুসারেই তারা ঘোরতর কমিউনিষ্ট বিরোধী। তারা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হাতে অস্ত্র দিয়ে, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে যখন পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো—ওই সময় বামপন্থী নেতৃত্বাধীন মিল-ফ্যাক্টরীর শ্রমিক এবং ছাত্রদেরকে সেই ট্রেনিং-এ পর্যন্ত যোগ দিতে দেয়নি। কারণ তারা অস্ত্র দেয়া তো দূরের কথা; ট্রেনিং দিতে পর্যন্ত আতঙ্কিত ছিলো যে; ওই সব বিপ্লবী শ্রমিক ও ছাত্রেরা হয়তো অস্ত্র চালনা শিক্ষা নিয়ে—আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে দেবে জোর করে। চেয়ারম্যান মাও-এর সেই ঐতিহাসিক "সব প্রতিক্রিয়াশীলরাই আসলে কাগুজে বাঘ" তত্ত্ব এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। অর্থাৎ ওই সময় পূর্ববাঙলার সমস্ত শহরাঞ্চল ও গ্রামের থানা এবং পুলিশ ক্যাম্প থেকে হাজার হাজার রাইফেল-বন্দুক-পিস্তল, রিভলভার, মর্টার, কামান, গ্রেনেড, হাতবোমা ও অসংখ্য গোলাবারুদ পাওয়া সত্ত্বেও নিরস্ত্র কমিউনিষ্ট ও তাঁদের সমর্থকদেরকে কেবলমাত্র ট্রেনিং দিতে পর্যন্ত ভয় পেয়েছে। পঁচিশে মার্চ শেখ মুজিবের কমিউনিজম্ ঠেকানোর যে বক্তব্য এ. ফ. পি.-র সাংবাদিক ব্রায়ান মের কাছে—এ থেকেই অনুমেয় যে, আওয়ামী লীগের ক্ষমতা দখল করার প্রচেষ্টা ছিলো কোন্ ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে।

সুতরাং যে আওয়ামী লীগ কমিউনিজম্‌কে খতম করার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, সেই আওয়ামী লীগ কোনো কারণে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে তাদেরই ফাঁদে পড়ার পথকে বেছে নেবে? যেসব তত্ত্ববাগীশরা ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছে যে, মোহাম্মদ তোয়াহা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না; মোহাম্মদ তোয়াহা পূর্ববাঙলার

আক্রান্ত জনগণের পক্ষে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে না; তারা আজো পর্যন্ত মিথ্যে তথ্যকেই আকড়ে ধরে রয়েছেন। সমগ্র বিশ্বই জানে যে, 'বাঙলা দেশ' গঠন হওয়ার পরে শেখ মুজিবের হাত দিয়ে মোহাম্মদ তোয়াহা সম্পাদিত (১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত বদরুদ্দীন উমর ছিলেন সম্পাদক) 'গণশক্তি' পত্রিকার কণ্ঠরোধ করার ইতিহাস। 'গণশক্তি' ই. পি. সি. পি. এম. এল. ও গণচীনের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত সমস্ত রকমের কুৎসার জবাব ও প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করার উদ্যোগ নেয়ার জন্যেই শেখ মুজিবের হাতে কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে। যাই হোক কোনো ক্রমেই উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধী চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর 'যুক্তফ্রণ্ট' গঠন করা সম্ভব ছিলো না। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে কৌশলগত কারনেই বেশ কিছু সংখ্যক অপরিচিত কমিউনিষ্টরা আওয়ামী লীগের 'মুক্তিবাহিনী'তে প্রবেশ করেছিলো; অস্ত্র-শস্ত্রও পেয়েছিলো; কিন্তু পরে এই ঘটনার কথা প্রকাশ হয়ে গেলে—ভারতের সীমান্ত শিবিরে পলাতক পূর্ববাঙলার স্থানীয় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের অনুমোদন ও 'আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটির'র নেতা ও কর্মীদের এই নিজস্ব (এরা কমিউনিষ্ট নয়) অনুমোদন সাপেক্ষে 'মুক্তিবাহিনী'তে লোক নেয়া হয়েছে। এমনকি এরকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে, ভারতের সীমান্ত এলাকায় 'নকশাল' নাম দিয়ে—শত শত বিপ্লবীকে ভারতের কারাগারে আটক এবং শত শত বিপ্লবীকে গুম্ করে খুন করেছে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। আজ পর্যন্তও যাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আঠারো

গণচীনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের পরিণতিই হলো 'বাঙলাদেশ'। সুতরাং সেই গণচীনের বিরুদ্ধে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা যে চরমভাবে কুৎসা প্রচার করবে তাতে বিস্ময় প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। বরং এর উলটো কিছু হলেই বিস্ময় প্রকাশ করা যেতো। প্রতিক্রিয়াশীলরা যা বলে তার উল্টোটিই হলো বাস্তব ঘটনা।

মহান লেনিন বলেন "শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাই হচ্ছে সুস্থ জাতীয়তাবাদ বিকাশের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।"

এই প্রসঙ্গে মহান স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি' প্রসঙ্গে কি বলেছেন— "নিপীড়িত ও পরাধীন দেশের জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেকে দৃঢ়ভাবে ও সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সর্বহারা শ্রেণী প্রতিটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সব সময় সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারেই সমর্থন করবে। এর অর্থ এই যে, সেই সব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকেই সমর্থন জানাতে হবে, যা সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করে না, বা জিইয়ে রাখে না, বরং তাকে দুর্বল করে ও উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। এমনও ঘটে যে, কোনো কোনো নির্যাতিত জাতির মুক্তি আন্দোলন সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এরকম অবস্থায় একে সমর্থনের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। জাতিসমূহের অধিকারের প্রশ্নটা বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ কোনো প্রশ্ন নয়; এটা সর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ সমস্যারই একটি অংশ বিশেষ। সমগ্রের কাছে গৌণ। সমগ্রের দৃষ্টিভঙ্গীতেই একে বিচার করতে হবে।"…"লেনিন সঠিক ভাবেই বলেছিলেন যে, নির্যাতিত দেশের জাতীয় আন্দোলনকে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা উচিত নয়, একে প্রকৃত ফলাফল দিয়ে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়…দুনিয়া জোড়া লড়াইয়ের মোট জমা খরচের দিক দিয়েই বিচার করতে হবে।" এদিকে থেকে বিচার করতে গেলে পূর্ববাঙলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ সেবাদাস ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের স্বার্থবাহী পুতুল—সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বিরোধী উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিকদল আওয়ামী লীগের দ্বারা পরিচালিত পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার লড়াইকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, সমগ্র বাঙালী জাতি (পূর্ববাঙলার) এই বিচ্ছিন্নতা চেয়েছিলো, সুতরাং 'জনগণ যা চায়, কমিউনিষ্টদের নিশ্চয়ই তা সমর্থন করা উচিত।' জনগণ মুক্তির জন্যে যা চায়, তা সঠিক ভাবেই চায়; কিন্তু তারা কোন্ পথে ও কোন্ নেতৃত্বের দ্বারা সেই সঠিক মুক্তি পেতে পারে, তা বুঝতে পারে না, ফলে খুব সহজেই তাঁরা জোয়ারের মতো বাধন ভাঙা হয়ে সামনে যে নেতৃত্বের মহিমা কীর্তন শোনে—তারই পেছনে সারিবদ্ধ হয়। কমিউনিষ্টরা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী, সুতরাং তাঁদেরই দায়িত্ব হচ্ছে সঠিক পথে ও সঠিক নেতৃত্বের পতাকাতলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা। এক্ষেত্রে জনগণ ভুল করে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্যে

শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়াশীলতার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো ঠিকই, তাই বলে সমাজের সব চাইতে সচেতন ও বিপ্লবী অংশ কমিউনিষ্টদেরও সেই প্রতিক্রিয়াশীলতার পতাকাতলে দাঁড়ানো চলে না। বরং ওই পতাকার বিরোধীতা করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদিও উগ্রজাতীয়তাবাদের বন্যার জোয়ারে ভাসমান জনতার হাতে সাময়িকভাবে লাঞ্ছিত হতে হলেও, খুবই দৃঢ়তাব সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করাই হচ্ছে সাচ্চা কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার কমরেডদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। ই. পি. সি. পি. এম. এল জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছে। জনগণের জন্যে সঠিক মুক্তির পথ নির্দেশ করেই তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেছে। শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়াশীল পতাকার বদলে তুলে ধরেছে শ্রমিক-কৃষকের রক্তাক্ত বিপ্লবী পতাকা।

যা বলছিলাম, গণচীন বিরোধী ষড়যন্ত্রের জন্যে যে 'বাঙলাদেশ'-এর উদ্ভব ; সেই ষড়যন্ত্রকারীরা নিশ্চিত ভাবেই গণচীনের বিরুদ্ধে চালিয়েছে তীব্র অপপ্রচার। আর প্রতিক্রিয়াশীলদের সেই অপপ্রচারে বামপন্থীমহলের মধ্যেও একটা অংশ বিভ্রান্ত হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন মানবতার চাইতে আদর্শ বড়ো ; এই জন্যেই চীন মানবতার দিকে দৃকপাত করার প্রয়োজন বোধ করে নি। এই উক্তি ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একজন প্রখ্যাত আর. এস. পি নেতার। তিনি এই উক্তি করে গণচীনের প্রতি কটাক্ষই করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের অভিমান ভরা উক্তি কিম্বা করার কারণ হলো সঠিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর সঙ্গে একাত্মতার অভাব। অভাব সঠিক বিশ্লেষণ ও জনগণের সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্কের। অভাব—আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের চারিত্রিক বিশ্লেষণের। নইলে কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাও সে তুঙ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বামপন্থী বিপ্লবীর পক্ষে কি করে পূর্ববাঙলার ঘটনা প্রবাহের ব্যাপারে চীনের পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন তোলা সম্ভব ; ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। আমি আমার দীর্ঘ আলোচনায় আওয়ামী লীগ কি ; আওয়ামী লীগ কেন, এ ব্যাপারে খোলাখুলি ব্যাখ্যা দিয়েছি। আমার মনে হয় আলোচনা ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ যথেষ্ট না হলেও অন্ততঃ আওয়ামী লীগ কি তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। যে শেখ মুজিব বলতে পারে—"Is the West Pakistan Government not aware that I am the only one able to

save East Pakistan from Communism ? তা সেই উগ্রজাতীয়তাবাদের ফ্যাসিষ্ট নেতা শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ কি করে গণচীনের সমর্থন পেতে পারে ? পাল্টা প্রশ্ন উঠবেই, বেশতো গণচীন শেখ মুজিব কিম্বা আওয়ামী লীগকে সমর্থন না করুক ; ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী যে, লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনতাকে খুন করল—তার বিরুদ্ধে তো নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে পারতো ? কিন্তু একথাই কি প্রমাণিত হয়েছে যে, গণচীন এই হত্যাকাণ্ড সমর্থন করেছে ? ১৯৭১-এর ৬ই এপ্রিল চীন সরকার পরিষ্কারভাবে ভারত সরকারকে বিভিন্ন চীন বিরোধী কুৎসার জবাবে বলেছে যে "চীন কখনোই পূর্ববাঙলার ব্যাপক জনগণের স্বাধীনতার (আকাঙ্খার) বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করছে না।" এ কথার অর্থ কি এই যে, চীন জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দেয় নি ? পূর্ববাঙলার ঘটনা প্রসঙ্গে গণচীন বার বার একটা কথার উপরে জোর দিয়ে এসেছে, তা হলো—"পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পাকিস্তানের জনগণের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে। কোনো বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতির জটিলতাকেই বাড়িয়ে তুলবে।" চীনের এই কথা বলার কারণ কি ?

চরিত্রগত কারণেই চীন শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু জনগণের স্বপক্ষে সব সময়েই কথা বলেছে সে। ৭১'র জুলাই মাসের পিকিং রিভিউ পত্রিকায় চীন সরকারের ভাষ্যে বলা হয়েছে—"We support Pakistan Govt. against foreign aggression…" এই ভাষ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বাইরের রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করবে, কিন্তু পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যার বাপারে যে কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করা থেকে চীন বিরত থাকবে। বিশেষ করে ১৯৬৯ সনে চীনের নবম পার্টি কংগ্রেসে লিন পিয়াও তার রিপোর্টে চীনের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবেই উল্লেখ করেছিলেন যে—"আমরা নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন করি।…কিন্তু সেই সব দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার ও সমস্যাবলী সেই সব দেশের জনগণই সমাধান করবেন—আমরা এই নীতিকেই মেনে চলি।" পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে একই ভাবে মেনে আসছিল গণচীন। এবং এই নীতির বাস্তবতাই প্রমাণিত হয়েছে পূর্ববাঙলার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চীন কর্তৃক

"পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পাকিস্তানের জনগণের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে," এই উক্তিরই বারবার পুনরুক্তির ভেতরে। গণচীন পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন কোনো কোনো বাইরের রাষ্ট্র পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলানোর চেষ্টা করছে ; এটা কোনোক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভারতের কথা উল্লেখ করে চীন প্রশ্ন তুলেছে যে, ভারত সরকার পূর্ববাঙলায় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পূর্ববাঙলা দখল করে নিলে ; যদিও ভারত বলছে যে, পূর্ববাঙলার জনগণ স্বাধীনতা চায়, তাই বলে ভারতের এই প্রয়াসকে কখনই সমর্থন করা যায় না। এই প্রসঙ্গেই ভারতের বিদ্রোহী—নাগা-মিজোদের কথা উল্লেখ করে চীন খুব সঠিকভাবেই যুক্তি দেখিয়েছে যে, তারাও তো স্বাধীনতা চাইছে, তাই বলে বাইরের কোনো দেশ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাদেরকে 'স্বাধীন' করে দিতে পারে না। এবং ভারত সরকারও তা মেনে নেবে কেন ?

গণচীন সব সময়েই চেয়েছে পূর্ববাঙলায় যে লড়াই চলছে তার নেতৃত্ব মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের হাতে চলে যাক। প্রথম দিকে চীন তাই পূর্ববাঙলার ঘটনাবলীর কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই জন্যেই দেয় নি। কিন্তু এই লড়াই যখন দীর্ঘতর হতে লাগলো এবং সাত মাস অতিক্রান্ত হলো এবং দেখা গেল যে পূর্ববাঙলার অভ্যন্তরে মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিপ্লবী শক্তি বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক গেরিলা লড়াই চালিয়ে—পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের দেশ পূর্ববাঙলার প্রধান শোষক সামন্তবাদের বিরুদ্ধেও চালিয়ে যাচ্ছে বিপ্লবী লড়াই—জনগণ-তান্ত্রিক পূর্ববাঙলা গঠন করার জন্যে ; তখনই গণচীন ১৯৭১-এর অক্টোবর মাসে পিকিং রিভিউতে সরকারীভাবে স্বীকার করল—"Revolution is going in Pakistan." এক্ষেত্রে চীন বিপ্লবের কথা স্মর্তব্য। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রুশিয়ার সঙ্গে ওই সময় চীনের কুয়েমিনটাং সরকার চিয়াং কাইশেকের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ভালো থাকা সত্ত্বেও—মাও সে তুঙের নেতৃত্বে চীনের অভ্যন্তরে মহান লেনিনের সশস্ত্র পথ ধরেই কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াংকাইশেক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের বিরুদ্ধে অব্যাহত ভাবে প্রতিআক্রমণ চালিয়ে গেছে। এবং সোভিয়েত রুশিয়ার সঙ্গে চীন বিপ্লবের একটা পরোক্ষ সম্পর্ক সব সময়ের জন্যেই অঙ্গীভূত থেকেছে। পূর্ববাঙলার ক্ষেত্রেও ই. পি. সি. পি. এম. এল সেই নীতিই প্রয়োগ করেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির

জন্যে পাকিস্তানের সরকারের সঙ্গে গণচীনের যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক থাকা সত্বেও —ই. পি. সি. পি. এম. এল—সব সময়ের জন্যেই প্রতিক্রিয়াশীল প্যাকিস্তান সরকারের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চালিয়ে গেছে বীরত্বপূর্ণ লড়াই। এজন্যে গণচীনের সঙ্গে ই. পি. সি. পি. এম. এল-এর সম্পর্ক খারাপ হয় নি, বরং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের মিলিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) সশস্ত্র লড়াইকে রক্তিম অভিনন্দন জানিয়েছে। এজন্যেই ই. পি. সি. পি. এম. এল. এবং পূর্ববাঙলার অন্যান্য মাও সে তুঙ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বিপ্লবী বামপন্থীরা এই লড়াইকে দীর্ঘতর 'জনযুদ্ধে' রূপ দেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

প্রতিক্রিয়াশীলরা গণচীনের বিরুদ্ধে এত বেশী কুৎসা প্রচার করেছে যে, 'বামপন্থী' বলে বিদিত অনেক মহলের মধ্যে এবং জনগণের একটা অংশের মধ্যে একের পর এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভ্রান্তি খুবই চরম আকার ধারণ করে—জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে 'পূর্ববাঙলা'র ঘটনাবলী নিয়ে বিতর্কের সময়। ওই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন (অন্যান্য দেশের কথা গৌণ) একই প্রস্তাব সমর্থন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে চীন বিরোধীরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছে যে, 'বাঙলাদেশের দুশমন·· মাও সে তুঙ ও নিকসন।' এই শ্লোগান তুলেছে 'কমিউনিস্ট নামধারী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অনুচব সি. পি. আই. ও পূর্ববাঙলার মস্কোপন্থীরা। এই 'কমিউনিষ্ট' নামধারীরা মাও সে তুঙ ও নিকসনকে একই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আরো শ্লোগান দিয়েছে "ভারত রুশ চুক্তি—বাঙলাদেশের মুক্তি।" অর্থাৎ সি. পি. আই ও পূর্ববাঙলায় তাদের বশংবদরাই এখন দুই দেশে মহান লেনিনের বিপ্লবী পতাকায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে—ফাসিষ্ট ইন্দিরা গান্ধী ও তারই অনুচর শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী পতাকা তুলে নিয়ে তার মহিমা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা শেখ মুজিবকে 'মহান নেতা' বলে অভিহিত করেছে; তারা আরো শ্লোগান দিয়েছে 'ইন্দিরার উক্তি—বাঙলাদেশের মুক্তি' এই ধরণের লেজুড়বৃত্তি করেই তারা গণচীন ও তার মহান নেতা মাও সে তুঙের বিরোধীতা করেছে। বিরোধীতা করেছে মার্কসবাদ লেনিনবাদেরই। জাতিসঙ্ঘে গণচীন যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল এবং সমর্থন করেছিল তাতে পরিষ্কার ভাবে দাবী করা হয়েছিল—পূর্ববাঙলা

থেকে ভারতীয় দখলদার বাহিনীকে সরিয়ে নিতে হবে। এবং যুদ্ধপূর্বাবস্থায় ভারত ও পাকিস্তান তাদের নিজের নিজের বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। গণচীনের এই প্রস্তাব জাতিসঙ্ঘে শতাধিক দেশের প্রতিনিধিরা সমর্থন জানায়। কিন্তু ভারত ও সোভিয়েত রুশিয়া একগুয়েমী করে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে; এবং পূর্ববাঙলা থেকে দখলদার ভারতীয় বাহিনীকে প্রত্যাহার না করে 'বাঙলাদেশ'-এর জাতিসঙ্ঘে অন্তর্ভূক্তির জন্য পীড়াপিড়ি করতে থাকে।

এবং সোভিয়েত রুশিয়া ওই সময় তার মূল্যবান ভেটো পাওয়ারের নির্লজ্জ অপব্যবহার করেছে। সোভিয়েত প্রতিনিধি ইয়াকভ আলী প্রত্যেক বিতর্কে গণচীনকে আক্রমণ করেছে। গণচীনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে বিশ্বের কাছে। কারণ আর কিছুই নয়; পূর্ববাঙলার জনগণকে ধোঁকা দিয়ে, পূর্ববাঙলায় গণচীনের অবিসংবাদিত প্রভাবকে ক্ষুন্ন করে; সেখানে রুশ প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক একচেটিয়া শোষণের আগ্রাসনকে উচ্ছেদ করে স্বীয় সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

ওই সময়টাই ছিল সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একটা মোক্ষম সুযোগ। ওই সুযোগকে চলে যেতে দিলে আর কোনোদিনই পূর্ববাঙলায় সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ তারা থাবা বিস্তার করার কোনো রকম অবলম্বন পেত না। এজন্যেই জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে গণচীন সমর্থিত প্রস্তাবে হেরে গিয়ে সোভিয়েত প্রতিনিধি তার হাতের মূল্যবান ভেটো পাওয়ার অপব্যবহার করেছে বার বার। সোভিয়েত রুশিয়ায় এই ভেটো প্রয়োগ সমগ্র বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের অভিপ্রেতেরই নির্লজ্জ বিরোধীতা। নাচার হয়েই স্বীয় স্বার্থের খাতিরে সোভিয়েত রুশিয়া ভেটো প্রয়োগ করেছে গণচীনের সমর্থিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত রুশিয়ার যে রণসম্ভার; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অত্র অঞ্চলের শক্তির ভারসাম্যের তুলনায় তা সমধিক। এই শক্তি সম্ভার মূলতঃ গণচীনের বিরুদ্ধেই হুমকি স্বরূপ নিয়োজিত। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এক পা ইউরোপে আরেক পা এশিয়ায় বিস্তৃত করার সুযোগ পেয়ে গেল পূর্ববাঙলার ঘটনাবলীর ঘাড়ে চেপে বসে। নিঃসন্দেহে এই ঘাড়ে চেপে ভারত তথা পূর্ববাঙলায় সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ তার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের আগ্রাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো। এই সক্ষমতাও গণচীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে।

বর্তমানে পূর্ববাঙলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাইতে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনই হলো অধিক বিপজ্জনক।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, সোভিয়েত রুশিয়ার হাতে এখনো উল্লেখযোগ্য অসচেতন বিশ্ব জনগণকে ধোঁকা দেয়ার মতো একটা সাইনবোর্ড রয়েছে; তা হলো সমাজতন্ত্রের সাইন বোর্ড। পূর্ববাঙলায় রুশ অনুগামীরা সেই ভুঁয়ো সমাজতন্ত্রের শ্লোগান ও একই সঙ্গে ইন্দিরা শেখ মুজিবের মহিমা কীর্তন করে সামাজিক সাম্রজ্যবাদের আগ্রাসনের পথকে সুগম করে দিয়েছে। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় অনুচররা একই পতাকার তলে মার্কস-এঙ্গেলস্, লেনিন ও ইন্দিরা গান্ধী-শেখ মুজিবকে দাঁড় করিয়ে তাদের প্রভুর অশুভ আঁতাতকে শক্তিশালী করে তুলেছে। যদিও জনগণ এখন আর অতটা মোহগ্রস্ত নয়। যদিও ভারত ও রুশের প্রতি ক্রমশই পূর্ববাঙলা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছে। যাই হোক সোভিয়েত রুশিয়া সেই ভুঁয়ো সমাজতন্ত্রের সাইন বোর্ডকে সামনে রেখেই পূর্ববাঙলার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলো। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের এই সক্ষমতাই পূর্ববাঙলার জনগণকে আজ এক চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমান 'বাঙলা দেশ' সরকারের সমগ্র অস্তিত্ব বাধা রয়েছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সাম্প্রসারণবাদী চক্রের হাতের মুঠোয়। পূর্ববাঙলা আজ বিদেশী শোষক শ্রেণীর অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। জনগণ হয়েছে বলির পশু। তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে পরাধীনতার নতুন শিকল। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে একথা বলা যায় যে, অবিভক্ত পাকিস্তানই ছিলো বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থের আঁধার।

যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণী গণচীনের সহায়তায় তাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন করার সুযোগ পেয়ে—কিছুতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজবাদী চক্রের স্বার্থের অনুকূলে পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চাইছিলো না। মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণী যদিও নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই পূর্ববাঙলা হাতছাড়া করতে চাইছিলো না; কারণ পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণী খুব ভালো ভাবেই জানতো যে, পূর্ববাঙলা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কিম্বা শেখ মুজিব ক্ষমতায় গেলে সেখানে চীন বিরোধী ষড়যন্ত্র বলিষ্ঠতা লাভ করবে; ফলে তাদের স্বীয় স্বার্থ হবে বিঘ্নিত; এই আশঙ্কাতেই তারা শেখ মুজিবের

বিরোধীতা করছিলো; প্রতিক্রিয়াশীল মুৎসুদ্দি ধনিক চক্র এই স্বার্থরক্ষা করার উদ্যোগ হিসেবে পূর্ববাঙলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে টিকিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা; তা নিঃসন্দেহে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় গণচীন বিরোধী ত্রিশক্তি— সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ। সঠিক মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সে তুঙ চিন্তাধারায় আন্তর্জাতিক বর্তমান অবস্থায় পূর্ববাঙলা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণীর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্বেও বিশ্ব কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তা ছিলো নামে মাত্র বৈরী শক্তি। কার্যতঃ তা ছিলো দুর্বল ও পঙ্গু সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর শক্তি। কিন্তু পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন বর্তমান পূর্ববাঙলা হচ্ছে বিশ্ব বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। যদিও শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী শক্তির সমগ্রের তুলনায় তা হলো কাগুজে বাঘ। কিন্তু তবুও পাকিস্তান রাষ্ট্র কমিউনিষ্ট বিরোধী ঘাঁটি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিলো না। সেক্ষেত্রে পূর্ববাঙলার বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে গণচীন ও কমিউনিষ্ট বিরোধী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব বিরোধী বিচ্ছিন্নতা। এটা বিশ্ববিপ্লবের বিরুদ্ধে চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সক্রিয় কমিউনিষ্ট বিরোধী বিচ্ছিন্নতা। এখানে সমগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধী দেশী ও বিদেশী শক্তি হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চালানো হবে কমিউনিষ্ট বিরোধী কূটনৈতিক ও শারীরিক নির্যাতনের সমস্ত রকমের তৎপরতা। এই যুক্তির আলোক থেকেই আমি বলেছি যে, তুলনা-মূলক ভাবে—শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বিচ্ছিন্ন পূর্ববাঙলার চাইতে অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিলো বিশ্ব বিপ্লবের পক্ষপুষ্ট গণশক্তি। তাই বলে আমার এই মন্তব্যের ভুল প্রতিধ্বনি তুলে এটা মনে করার কারোও কোনো অবকাশ নেই যে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি ধনিক শ্রেণীকে প্রগতিশীল বলে আখ্যায়িত করছি। বার-বার আমি এই একই আলোচনার অবতারনা করেছি। এবং বলেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি ধনিক গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চাইছিলো না। আর এটাই ছিলো কমিউনিষ্ট আন্দোলনের তীব্রতার সুযোগ। এবং

সমাজতন্ত্রের দুর্গ গণচীনের পক্ষে সম্ভাব্য সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তোলার যথাযথ সময় লাভ। বর্তমানে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীচক্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তিতে শক্তিমান শেখ মুজিব সরকারের পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবকে দমন করার যে সম্ভাবনা পূর্ববাঙলায় যে ধরনের কুৎসিত চেহারায় আকার ধারণ করছে; পাকিস্তানের পক্ষে তা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিলো না। যেহেতু ধর্মীয় অন্ধত্বের চাইতে উগ্র জাতীয়তাবাদই হচ্ছে ফ্যাসিবাদ।

এই ক্ষেত্রে সোভিয়েত রুশিয়ার যে ভূমিকা তা নিরঙ্কুস মার্কসবাদ লেনিনবাদ বিরোধী ভূমিকা। সব কিছু জেনেশুনেই উগ্র জাতীয়তাবাদকে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে আগে থেকেই ভারতের সাহায্যে সে সমথন দিয়ে আসছিলো। এবং জাতিসঙ্ঘের বিতর্কের সময় এই উগ্রজাতীয়তাবাদ অর্থাৎ ফ্যাসিবাদকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সে নির্লজ্জভাবে গণচীন সমথিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করেছিলো। সোভিয়েত রুশিয়া এককভাবে শেখ মুজিবকেই নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলো। সম্মিলিত রাজনৈতিক দলের ফ্রণ্ট গঠন করার বিরুদ্ধেই সে শেখ মুজিবকে "মুক্তিযুদ্ধের" নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলো। যেহেতু সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করার পদক্ষেপ ছিলো সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে আত্মঘাতী পদক্ষেপ। কারণ তেমন কোনো সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠিত হলে—তার মধ্যে সাচ্চা বিপ্লবীদের নির্মূল করার জন্যেই সোভিয়েত রুশিয়া জাতিসংঘ 'বাঙলাদেশ'কে সদস্য করানোর জন্যে অত পীড়াপীড়ি করেছে। পূর্ববাঙলা থেকে ভারতীয় দখলদার বাহিনীকে প্রত্যাহার করার গণচীনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এই বিরোধীতাই হলো নির্লজ্জভাবে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ বিরোধী চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরে ভারত তার সশস্ত্র সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলো সোভিয়েত রুশিয়ার খুঁটির জোরেই। সে খুঁটি ছিলো নেপথ্যে। কিন্তু জাতিসঙ্ঘে যখন গণচীন পূর্ববাঙলা থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করে; তখন নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকে আর সোভিয়েত রুশিয়া তথাকথিত সমাজতন্ত্রের নামাবলীর আড়ালে চেপে রাখতে পারলো না। তারা নির্লজ্জভাবে মুখোশ থেকে বেরিয়ে এসে (সমাজতন্ত্রের দাবীদার একটি দেশ) গণচীনের প্রস্তাবের বিরোধীতা

করে প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাঙলায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থান করাকেই সমর্থন করলো। এটা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত রুশিয়ার নতুন কীর্তি নয়। তার এই কীর্তি সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষভাবেই দেখেছিলো পূর্ব ইউরোপের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ চেকোশ্লোভাকিয়ায় যখন সে তার সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে পাঠিয়েছিলো। সমগ্র বিশ্ব এই জঘন্যতম আক্রমণের বিরুদ্ধে বছর কয়েক আগে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং সেই সোভিয়েত রুশিয়া যে পূর্ববাঙলায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থানকে সমর্থন করবে; এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী (ফ্যাসিবাদী) রাজনৈতিক উত্থানের সহায়তা করবে—তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

দ্ব্যর্থহীন ভাবেই বলা যায় যে, পূর্ববাঙলার লড়াইকে সোভিয়েত রুশিয়া ও ভারত দীর্ঘস্থায়ী হতে না দিয়ে, কমিউনিষ্টদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ববাঙলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিল একটাই; পূর্ববাঙলা দখল করে নিয়ে সেখানে পুতুল সরকার বসিয়ে— কমিউনিষ্টদের প্রভাবকে নির্মূল করা; ও সেখানে ভারতের টাটা-বিড়লা গোয়েঙ্কা-ডালমিয়া ও মাড়োয়ারী ধনিকদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়া। আর সোভিয়েত রুশিয়া অন্যান্য বৃহত্তর বৈদেশিক লগ্নী পুঁজিকে কোনঠাসা করে—তার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের লীলাভূমি তৈরীর প্রয়াস হিসেবে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ববাঙলায় পাঠানোর ব্যাপারে—ভারতের পেছনে খুঁটি হয়ে শক্তি জুগিয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারত পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার মার্কিনী ষড়যন্ত্রে পার্শ্ব সহচর হয়ে কাজে নেমে, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল বলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থের ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার জন্যে ভারতের উপরে রুষ্ট হয়ে প্রকাশ্যভাবে জাতিসঙ্ঘে সে সোভিয়েত রুশিয়া ও ভারতের প্রস্তাবের বিরোধীতা করে। আমেরিকার এই বিরোধীতা করার নীতি কোনো মতাদর্শগত নীতি নয়; স্বার্থের প্রশ্নেই আমেরিকা এই বিরোধীতা করেছিল। আর গণচীনও এই সুযোগকে মতাদর্শগত দিক থেকে ব্যবহার করেছিল যথাযথ ভাবে।

গণচীন পূর্ববাঙলার জনগণের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খার বিরুদ্ধে কখনোই কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে নি। সে রকম কিছু করলে ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্র কখনোই পূর্ববাঙলার অভ্যন্তরে তার সেনাবাহিনীকে

পাঠাতে সাহস পেতো না। যতই 'রুশ-ভারত চুক্তি' সম্পাদিত হোক না কেন গণচীন বৃহত্তর আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সৃষ্টির কথা বললেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী কাগুজে বাঘ বেলুনের মতো চুপ্‌সে যেতো। কিন্তু গণচীন কখনোই আক্রমণ করার নীতিতে বিশ্বাস করে না। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ কখনোই আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাঘাত করে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই চীন নীতিগতভাবে জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় দখলদার বাহিনীর পূর্ববাঙলায় অবস্থানের বিরোধীতা করেছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত রুশিয়ার সঙ্গে তার স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্যেই সে নিজেই নিজের ফাঁদে আটকে গিয়ে ওই সময় গণচীনের প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দান করেছে। যাই হোক, গণচীন ওই সময় পূর্ববাঙলার ঘটনাবলী নিয়ে নীতিগত লড়াই চালিয়ে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাময়িক ভাবে হলেও পূর্ববাঙলায় তার সাম্রাজ্যবাদী সক্রিয় আগ্রাসন থেকে সরিয়ে রেখে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার হাত থেকে বিশ্বের জনগণকে একটা রক্তাক্ত পরিস্থিতির বাইরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলো বলা যায়। কারণ 'পূর্ববাঙলা'য় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ছিলো মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদেরই। এই ষড়যন্ত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বহুদিন থেকেই কামিয়াব করার চেষ্টায় ছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে যখন আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাতে ভারতের ও সোভিয়েত রুশিয়ার কাছে 'ল্যাং' খেয়ে নিরপেক্ষ সাধু বনে গিয়েছিলো। পূর্ববাঙলাকে কেন্দ্র করে খুবই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার। 'রুশ ভারত চুক্তি'ই এই সম্ভাবনাকে আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছিলো। এই চুক্তি স্বাক্ষর করার সময় [illegible]ই বোঝা গিয়েছিলো যে, ভারত সোভিয়েত রুশিয়ার শক্তিতে শক্তিমন্ত হয়ে পাকিস্তানকে সরাসরি আক্রমণ করবে এবং পূর্ববাঙলাকে দখল করে নেবে। বৃটেনও শেখ মুজিবের ওকালতি করছিলো। একদিকে সোভিয়েত রুশিয়া ও ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, অন্যদিকে স্বার্থের লীলাভূমি পূর্ববাঙলা থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হারাতে বসা নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে সেখানে তার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাকর হয়ে উঠছিলো; এবং গণচীন নীতিগতভাবে জাতিসংঘে যতই সশস্ত্র সজ্ঘর্ষ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালাক না কেন—আমেরিকা পূর্ববাঙলায় সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করলে—বাধ্য হয়েই চীনকে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়তে হতো পূর্ববাঙলার ঘটনা চক্রের সঙ্গে। কেন না গণচীন কিছুতেই তার সমাজতান্ত্রিক দুর্গকে মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মুখে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চুপ থাকতে পারতো না। আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশিয়া 'হটলাইন' মারফত বহুদিন থেকেই চেষ্টা করে আসছিলো গণচীনকে যুদ্ধে জড়িয়ে নিয়ে তাকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করতে। সুতরাং পূর্ববাঙলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে গণচীনকে সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হলে—অনিবার্যভাবেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতো। সমগ্র বিশ্ব এক মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।

এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আশি কোটি মানুষের নেতা মাও সে তুঙ দীর্ঘ আটবছর পরে প্রকাশ্যভাবে বিবৃতি দিয়ে কিছুদিন আগে বলেছিলেন "...দুনিয়ার জনগণ এক হও, মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদ ও তার পা-চাটা কুকুরদের পরাজিত করো।" চেয়ারম্যান মাও বিশ্বের জনগণকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, "...হয় বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে, না হয় বিপ্লবই বিশ্বযুদ্ধকে পদানত করবে।" এ জন্মেই আমেরিকার নিজস্ব ফাঁদে আমেরিকা যখন আটকে গেলো তখন গণচীন তার পররাষ্ট্রনীতির আলোকেই বিশ্ব-পরিস্থিতিকে শান্ত রাখা ও 'বিশ্বযুদ্ধের হুমকি থেকে' বিশ্বকে রক্ষা করার জন্মে (সাময়িকভাবে) আমেরিকাকে 'নিরপেক্ষ' থাকতে বাধ্য করেছে। আজকে যারা শান্তির ললিত বাণী দিয়ে—সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ও সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধীতা করে গণচীনের কুৎসা প্রচার করছে; তারা গণচীনের ওই সময়কার সঠিক ভূমিকার জন্মেই নির্বিঘ্নে তা করতে পা[illegible] তা না হলে আজো পর্যন্ত এক মহা ধ্বংস-যজ্ঞের বিবরে কুৎসা প্রচারকারীরা ও বিশ্বজনগণকে জড়িয়ে গিয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করতে হতো। বিশ্বযুদ্ধ কি জিনিস, সারা পৃথিবী দুই দুইবার সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে অতীতের বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় বর্তমান সময়ে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে—পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত উভয় শিবিরই সর্বাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, ফলে অতীতের তুলনায় তা হবে আরো ভয়ানক ও পঞ্চাশগুণ বেশী রক্তাক্ত যুদ্ধ। বিশ্বাসঘাতক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চান বিপ্লবের সময় —রাশিয়ার লাল ফৌজের অব্যাহত অগ্রগতি ঠেকানোর জন্মেই জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে আণবিক বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে ও ধ্বংস-যজ্ঞে যে নারকীয় ঘটনার সৃষ্টি করেছিলো, সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই হাতে এখন রয়েছে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র ও পারমাণবিক বোমা।

বিশ্বাসঘাতক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (কাগুজে বাঘ হলেও) যে, আবারও সেই হিরোশিমা নাগাসাকীর পুনরাবৃত্তি করবে না (যদিও সেই 'আণবিক বোমার ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী বর্তমানের বোমা) তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? প্রকৃতই যদি চীন পূর্ববাঙলার জণগণের বিরোধীতা করতো ; এবং মার্কিন সাম্রাজবাদেরই স্বার্থবাহী (!) হতো, তাহলে—মার্কিন সপ্তম নৌবহরের বঙ্গপোসাগরমুখী জঘন্য ধরনের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার স্বপক্ষেই সে কথা বলতো। কিন্তু চীন বিরোধীতা করেছে খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে। কারণ মার্কিন সপ্তম নৌবহরের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো—পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে উদ্ধার করার ধাপ্পা দিয়ে—পূর্ববাঙলার পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে—'নয়াউপনিবেশ' দখল করার প্রতিযোগিতায় হারানো নেতৃত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার ধিক্কারজনক উদ্দেশ্য। আমেরিকার 'বিশ্বযুদ্ধ' বাধাবার সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে গণচীনের দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলার ফলে। সি. পি. আই ও তাদের পূর্ববাঙলার দোসর মস্কোপন্থীরা যদিও বলে এসেছে এবং এখনো বলার অন্ত নেই যে, মার্কিনী সপ্তম নৌবহরের পেছু পেছু সোভিয়েত রুশিয়ার সাবমেরিনের পশ্চৎধাবন করার ফলেই মার্কিনী সপ্তম নৌবহর ভয় পেয়ে তার গতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ঘটনা প্রকৃতপক্ষে কি তাই? মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পেছনে সোভিয়েত রণতরীর পশ্চাৎধাবন করার ফলে 'বিশ্বযুদ্ধে'র সম্ভাবনা খুবই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিলো। অথচ কিউবায় সম্ভাব্য মার্কিনী আক্রমণের সময় ফিদেল কাস্ত্রোকে নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মার্কিনী হুমকির কাছে মাথা অবনত করে সংশোধনবাদের একনিষ্ঠ সেবক ক্রুশ্চভ তার রণতরীর গতিপরিবর্তন করে ফিরিয়ে এনেছিলো কেন? সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের বিপ্লবী দেশ কিউবার পক্ষে যে সোভিয়েত রুশিয়া সেদিন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহস পায়নি, কিম্বা করেনি ; সেই সোভিয়েত রুশিয়া কোন্ স্বার্থে পূর্ববাঙলার ব্যাপারে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পশ্চাৎধাবন করার মতো ঝুঁকি গ্রহণ করেছিল? এই ঝুঁকি নেয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিলো তা' হলো মানবতার সেবা করা নয়, পূর্ববাঙলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগামী শোষণের নেতৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে ভারতের মাধ্যমে নিজের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নেতৃত্ব কায়েম করা। আর স্বার্থের লীলাভূমি তৈরী করার প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই খানিকটা ঝুঁকি নিতেই হয়।

কিন্তু কিউবায় সেই স্বার্থরক্ষার একচেটিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সোভিয়েত রুশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সম্ভব ছিলো না বলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তৎকালীন মুখপাত্র জন. এফ. কেনেডীর কাগুজী হুম্‌কির কাছে পরাজয় মেনে নিয়ে সোভিয়েত রুশিয়া সেদিন তার রণতরী ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলো। যাইহোক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটা ধারণা জন্মেছিলো যে, জাতিসঙ্ঘে চীনের প্রস্তাব সমর্থন করে, সে চীনকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে; সুতরাং তার সপ্তম নৌবহরের চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে অভিযানকে চীন সমর্থন না করলেও অন্ততঃ বিরোধীতা করবে না। ফলে সে তার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে ভালোভাবেই চরিতার্থ করতে পারবে। কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা'— সমাজতন্ত্রের মহান দুর্গ গণচীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই আগ্রাসী নীতির বিরোধীতা করল খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে। ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ধোঁকা দেয়ার ফাঁদে পড়ে হাত পা ভেঙে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো তার সপ্তম নৌবহর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রয়াসকে গণচীন সমর্থন দান করলে —ভারত কিম্বা সোভিয়েত রুশিয়া হাজারো হুম্‌কি প্রদর্শন করলেও কিছুতেই ওই সপ্তম নৌবহর তার গতি পরিবর্তন করতো না। এ থেকেই গণচীন বিরোধীরা কি দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হবে না? আর জাতিসঙ্ঘে গণচীনের বক্তব্যের সঙ্গে ই. পি. সি. পি. এম. এল-ও একমত পোষণ করেছে। ওই সময় পূর্ববাঙলার জনগণ প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হলেও, বর্তমানে 'বাঙলাদেশ'-এর ব্যাপক জনগণ গণচীনের সেই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করছে—ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে। বিরোধীতা করছে ভারতীয় সম্প্রসারণবা[illegible]ক্রের নিরবচ্ছিন্ন শোষণের। পূর্ববাঙলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বুঝতে পেরেছে—খাল কেটে তাঁরা কুমীর এনেছে। বন্ধুর বেশ ধরে এসে ভারত এখন শত্রুর মতো তাদের উপরে আগ্রাসী শোষণের লোল্‌জিহ্বা মেলে ধরেছে। বুঝতে পেরেছে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ আর পশ্চিম পাকিস্তানী মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

'বাঙলাদেশ'-এর জনগণ বলছে, না, তাঁরা যে মুক্তি ও স্বাধীনতা চেয়েছিলো, এই 'মুক্তি' এই 'স্বাধীনতা' তার বিপরীত। পাকিস্তানের আমলে না খেয়ে অন্ততঃ গলায় ফাঁসি লটকে আত্মহত্যা করার ঘটনা খুবই বিরল, কিন্তু 'বাঙলা-দেশ' প্রতিষ্ঠার পরে অন্ততঃ কয়েক শত মানুষ অনাহারের জ্বালা সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে লাভ করেছে চরম 'স্বাধীনতা'। এমন স্বাধীনতার সত্যিই

কোনো তুলনা নেই। জনগণ এখন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের লোকজনের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখে, আর নিজেদের অনাহার, অনাশ্রয়ে, বে আব্রু-বেইজ্জতি হতে দেখে বুঝতে পারছে, এই জন্যেই চীন শেখ মুজিবকে সমর্থন দেয়নি, এই জন্যেই সে পূর্ববাঙলায় ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীকে ঢুকতে দেয়ার বিরোধীতা করেছে। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ই. পি. সি. পি. এম. এল বর্তমানে সি. পি. এম. এল-এর সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটছে খুবই দ্রুতভাবে। এগিয়ে চলেছে সি. পি. এম. এল চারু মজুমদারের ভুল রণকৌশল পরিত্যাগ করে নতুন রণকৌশলকে মার্কসবাদ লেনিনবাদ এর সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আকড়ে ধরে।

উনিশ

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পূর্ববাঙলায় ঢুকে তিনটি দায়িত্ব পালন করেছে খুবই যোগ্যতার সঙ্গে। (১) 'মুক্তিবাহিনী'র পথ নির্দেশে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট ঘাঁটিসমূহ বিধ্বস্ত করে—ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট হত্যা। (২) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছ থেকে দুই হাজার কোটি টাকারও উপরে অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ ও সামরিক সাজসরঞ্জাম দখল করে ভারতে পাচার করা ও জনগণের এবং অফিসসমূহের মূল্যবান বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং (৩) ভারতের ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক আওয়ামী লীগের পুতুল সরকারকে পাহারা দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে [illegible] এগুলো যথাযথভাবেই সম্পাদিত করেছে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী।

পাবনা জেলা ও কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তের মাঝখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিশাল পদ্মানদী। যুদ্ধের পরে ওই এলাকায় সফর করতে গেলে স্থানীয় লোকজনই প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলেছে যে, অতবড় সারার সেতু পাকিস্তানী সেনারা ধ্বংস করার সময় পায়নি। ভারতীয় বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে ওই সেতুর তিনটি কালভার্ট উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বোমাবর্ষণ করার আগেই পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ওই স্থান ত্যাগ করে কিছু রসদপত্র ফেলে রেখে, কিছু যানবাহন ধ্বংস করে সিরাজগঞ্জের দিকে ও পাবনার নগরবাড়ি ঘাটের দিকে ঢাকায় যাওয়ার জন্যে সরে গিয়েছিলো। অথচ ভারতীয় বিমান তারপরে বোমা ফেলে সারার সেতুর তিনটি মূল্যবান কালভার্ট উড়িয়ে দিয়ে জোর

প্রচার করতে আরম্ভ করে যে, পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী পূর্ববাঙলাকে একেবারে শ্মশান করে দিয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সারার সেতুর মতো আরো বহু মূল্যবান সম্পদ বিধ্বস্ত করে ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্র—পূর্ববাঙলাকে ভারতের উপরে নির্ভরশীল করে রাখার জন্যেই এই ধরণের ক্ষতিসাধন করে পূর্ববাঙলাকে 'ঠুটো জগন্নাথ' বানিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। আবার পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী যাতে পালিয়ে যেতে না পারে—এই যুক্তি দেখিয়ে ভারতের স্থলবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মানেকশর নির্দেশে ভারতীয় বিমান বহর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও চাল্না বন্দরের সমস্ত জলযান বেপরোয়া ভাবে বোমা ফেলে ডুবিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে ধ্বংস করেছে বড় বড় সেতু ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। সুদীর্ঘ নয় মাসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা ক্ষতি না করেছে; কয়েকদিনেই ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী তার কয়েকগুণ বেশী ক্ষতিসাধন করেছে। যে ক্ষতিপূরণ করার জন্যে পূর্ববাঙলাকে ভারতের সাহায্যের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। একথা সূর্যালোকের মতোই সত্যি যে, ষোলোই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর আগে পর্যন্ত ঢাকায় প্রাণহানির সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মতো হলেও বিষয় সম্পত্তি ও দোকান পাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। কারণ ঢাকায় অহরহ বিদেশী সাংবাদিক ও অন্যান্য বাইরের নেতৃবৃন্দ এসেছে। তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই পাকিস্তান সরকার পূর্ববাঙলার রাজধানী ঢাকাকে অক্ষত রেখেছে। যে কারণেই হোক ঢাকা শহর মোটামুটি সচল ছিল, কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীই ঢাকাকে দেউলিয়া করেছে—ঢাকার সোনা ও ঘড়ির এবং ফরেন গুডস্-এর সমস্ত দোকানগুলোয় তাদের লোলুপ থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। অবাধে আত্মসাৎ করেছে মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী। আর সব থেকে বেশী লাভ হয়েছে তাদের 'চোরের উপরে বাটপারী' করে। কেন না পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী পূর্ববাঙলার সমস্ত শহর ও গ্রামে গ্রামে বেপরোয়া লুটতরাজ চালিয়ে কোটি কোটি টাকা সোনারূপার দ্রব্য সামগ্রী ও মূল্যবান যেসব জিনিস-পত্র আত্মসাৎ করে নিজেদের কাছে রেখেছিলো, সেগুলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর সুযোগ ও সময় পায় নি তারা। সেই সব গুছিয়ে রাখা টাকা-পয়সা সোনারূপা দ্রব্য সামগ্রী ভারতের সেনাবাহিনীর লোকেরাই হস্তগত করে তা আত্মসাৎ করেছে। এই টাকা-পয়সা, সোনারূপা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকা।

পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ক্রমশই ঢাকার দিকে এগিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে ছিল ৫০ হাজারেরও বেশী 'মুক্তিবাহিনী'র সশস্ত্র লোকেরা। শুধু পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর লোকেরাই নারীত্বের লাঞ্ছনা করে নি; তারা হয়তো হাজার হাজার পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে; কিন্তু ভারতের সশস্ত্র বাহিনী কয়েক ডজন হলেও পূর্ব বাঙলায় নিঃস্ব বাঙালী মেয়েকে বলপূর্বক ধর্ষণ করেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর এইসব জঘন্য কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখে কয়েক মাসের মধ্যেই 'বাঙলাদেশ'-এর জনগণ তাদের উপরে রুষ্ট হয়ে উঠেছে। রুষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতের সম্প্রসারণবাদী সরকারের উপরেও। রুষ্ট হয়ে উঠেছে আরো একটি কারণে, তা হলো ভারত সরকার কর্তৃক 'বাঙলাদেশ' সরকারের নোট ভারতের মাটিতে ছাপানো হলেও. ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় 'বাঙলাদেশ' সরকারের টাকার দাম শতকরা পয়তাল্লিশ টাকা। যদিও ভারত সরকারী ভাবে এই মূল্যমানের কথা কিছুই বলেনি; কিন্তু মাড়োয়ারীদের দৌরাত্মে 'বাঙলাদেশ' সরকারের টাকার এই পরিণতি হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেকে বলেছে যে, 'বাঙলাদেশ'-এর এই বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও তার হাতে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ মজুত না থাকায় এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু 'বাঙলাদেশ'-এর সর্বপ্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ 'পাট সম্পদ' তাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মণ পাট চোরাই পথে প্রত্যহ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাওয়ায় 'বাঙলাদেশ'-এর পুতুল সরকার স্বাধীনভাবে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছে না। সে অধিকারও তার নেই। এবং ভারতীয় পণ্যসামগ্রীও তেমনি চোরাই পথে 'বাঙলাদেশে' চলে আসছে; আর তা বিক্রি হচ্ছে এক টাকার মাল পাঁচ টাকায় ও সাত টাকায়। অবস্থা দৃষ্টে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যতদিন না পর্যন্ত 'বাঙলাদেশ'-এর ভারতীয় স্বার্থবাহী পুতুল সরকারের পরিবর্তন না ঘটছে, ততদিন 'বাঙলাদেশ'-এর জনগণের অব্যাহতি নেই—তীব্র শোষণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার। 'বাঙলাদেশ' স্বাধীন হয়নি, নতুন করে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজিপতি গোষ্ঠীর শোষণের অবসান হলেও—'বাঙলাদেশ'এর জনগণের উপরে বেড়ে গেছে আরো নতুন দুই বৈদেশিক শোষণ। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজিবাদই ছিল পূর্ববাঙলার তিন

প্রধান শত্রু। কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর পর থেকে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজির বদলে বাঙালী মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ, এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এখন চেপে বসেছে 'বাঙলাদেশ'-এর কয়েক কোটি নিপীড়িত-লাঞ্ছিত-ক্ষুধিত জনগণের ঘাড়ের উপরে।

আর পাঁচটি দেশী ও বিদেশী শোষকের স্বার্থবাহী বর্তমান 'বাঙলাদেশ' সরকার—এই সব শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সি. পি. এম. এল-এর কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে রাত্রির অন্ধকারে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে করছে হত্যা। ষোলোই ডিসেম্বরের পর থেকে এপর্যন্ত 'বাঙলাদেশ' এর বিভিন্ন জেলায় দুই হাজারেরও বেশী বিপ্লবীকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে—শেখ মুজিবের ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাবাহিনী। আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে 'বাঙলাদেশ'এর কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক একটি কাগজ 'সমীক্ষা'র (সম্পাদক শামসুল হুদা) ১৯৭২ সনের ১লা মে'র একটি ছোট্ট "নকশাল পন্থী বলে কাদের হত্যা করা হবে" শীর্ষক নিবন্ধের পুরোটাই নিচে উদ্ধৃত করছি; "গত ৩১শে মার্চ 'বাঙলাদেশ' সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান কালে 'নকশালপন্থীদের' দেখামাত্র গুলি করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ওই সভায় আরো বলেন যে, কিছু লোক 'ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রী চুক্তি' সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে এবং বলছে এই চুক্তি করা ঠিক হয়নি।" তিনি এই লোকদের হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন "আমি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানি এবং কিভাবে তাদের শায়েস্তা করতে হবে তাও জানি।" গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এতদিন আমরা তাই শুনে এসেছি (অবশ্য শোষক শ্রেণীর কাছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অর্থ হলো তাদের শ্রেণী স্বার্থের পাহারা দেওয়া)। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেখা মাত্র 'নকশালপন্থীদের' গুলি করার ঢালাও নির্দেশ দিয়ে পুলিশের হাতে প্রকারান্তরে বিচার বিভাগের দায়িত্বই তুলে দেন নাই কি? যে কোনো অপরাধের জন্য—সে অপরাধ যত গুরুতরই হোক না কেন, শাস্তিবিধানের ভার পুলিশের উপর অর্পন করলে বিচার বিভাগের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না কি? বিচারকের কাছে বিচার দাবী এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি মানুষের জন্মগত; কোনো অজুহাতেই তা

হরণ করা চলে না। কেবলমাত্র ফ্যাসিষ্টরাই বিনা বিচারে নরহত্যা চালায় কিম্বা তা সমর্থন করে। যেমন হিটলার-মুসোলিনী করেছিলেন। ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজিরা যা করেছে আমাদের দেশে রক্তাক্ত নয় মাসে। হিটলার-মুসোলিনী আর নেই—ইয়াহিয়া-টিকার বর্বর শাসন-পীড়নেরও অবসান ঘটেছে। কিন্তু হিটলার-মুসোলিনী-টিক্কার প্রেতাত্মা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের দেশে। সেই ফ্যাসিষ্টদের কণ্ঠস্বরই আমরা নতুন করে শুনতে পাচ্ছি না কি? শুধু খুলনার জনসভায় নয়, এবং শেখ সাহেবই নন, 'বাঙলাদেশের' সর্বত্র বিভিন্ন সভায় সরকারী দলের নেতা উপনেতারা একই হুমকি নানা ভাষায়, নানা কায়দায় দিয়ে চলেছেন এবং বেনামে তা কার্যকরী করার চেষ্টাও হচ্ছে। আর এরই পাশাপাশি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে'র মুখোশ পরে আরো দুটি রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা শেখ সাহেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সরকারী মেগাফোনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এরা সবাই বলছে, তাদের আদর্শ হলো—গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। 'দেশ ও জনসাধারণের স্বার্থেই' নাকি সরকার-বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা, দমন করা ও গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়াও সঙ্গত। কি অদ্ভুত যুক্তি! 'দেশ ও জনসাধারণের স্বার্থেই' পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান মুসলীম লীগ সরকারের বিরোধীদের মাথা কেটে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তৎকালীন মুসলীম লীগ সভাপতি কাইয়ুম খান 'দুশমনদের রক্ত দিয়ে হোলী খেলা হবে' বলে মুসলীম লীগ বিরোধীদের শাসিয়েছিল। (নূরুল আমীন সরকার ১৯৫০ সালে রাজশাহী কারাগারে বন্দী দেশপ্রেমিকদের এবং ১৯৫২ সালে ভাষার দাবীতে আন্দোলনকারী ছাত্র মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করেছিল, তাও 'দেশ ও জনগণের স্বার্থেই।') আর আয়ুব-মোনেম দশ বছরে যা করেছে, কিম্বা ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজি-ফরমান আলীরা মুক্তি সংগ্রামে নয় মাসে যে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ চালিয়েছে তাও কিন্তু 'দেশের অখণ্ডতা, সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থেই।' গত দুই যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতা এদেশের মানুষের রয়েছে।

প্রকৃত দেশ প্রেমিকদেরকেই কিভাবে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, কিভাবে গত চব্বিশ বছর গণতান্ত্রিক সংগ্রামী কর্মীদের উপর 'দেশ ও জনগণের স্বার্থের' নামে নির্যাতন চালানো হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার "প্রগতিশীল" ভক্তদের তা অজানা থাকার কথা নয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই 'শত্রু দেশের চর' 'কমিউনিষ্ট' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত

যাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের খড়্গ নেমে আসতো, তাঁরা যে, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক, তা ক্ষমতায় আসীন কিম্বা ক্ষমতা প্রত্যাশী "প্রগতিশীল গণতন্ত্রীরা" ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু দেশের কোটি কোটি অধিকার সচেতন মানুষ ভোলেন নি। 'নকশালপন্থীদের' সম্পর্কে নানা কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু 'নকশালপন্থী' আসলে কারা, সে সম্পর্কে জনগণের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি? মনে হয় না। আমাদেরও নেই। তবে আমাদের যেটা জানা আছে তা হলো এই যে, নকশালবাড়ি পশ্চিম-বাঙলার অন্তর্ভুক্ত একটি জায়গার নাম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়—এই নকশালবাড়িতে ১৯৬৭ সালে শোষিত-নিপীড়িত কৃষকেরা শোষক জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করে—ইন্দিরা সরকার তাকে 'নকশালপন্থীদের বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে সেই সংগ্রামকে দমন করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে কেউ নিজেদের 'নকশালপন্থী' বলে পরিচয় দেয় বলে আমরা শুনিনি। এই 'নকশালপন্থী' নাম নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রচুর অবকাশ রয়েছে। যেমন ধরুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'নকশালপন্থীদের' দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তা কার্যকরী করার জন্য পুলিশও তৎপর রয়েছে। এখন যেহেতু কারো গায়ে 'নকশাল' বলে কিছু লেখা নেই, সেই হেতু পুলিশ কি করে চিনবে কে 'নকশাল' আর কে 'নকশাল' নয়। তা ছাড়াও দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশকে কিছু লোক ব্যক্তিগত শত্রুতা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যে-মওকা হিসেবে কাজে লাগাবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে? মনে করা যাক—'ক' এলাকায় 'খ' নামের ব্যক্তির সঙ্গে 'গ' নামের ব্যক্তিটির পারিবারিক কোন্দল রয়েছে। 'খ' নামের ব্যক্তিটি সরকারী দলের সদস্য এবং স্থানীয় নেতা 'গ' নামের ভদ্রলোক হয়তো কোনো রাজনীতি করে না, কিম্বা অপর কোনো দল করে, এই অবস্থায় "খ" ভদ্রলোক পুলিশের কর্তাদের জানালেন, তার এলাকায় "গ" নামের ব্যক্তিটি একজন কট্টর "নকশাল"। পুলিশ যথারীতি দেখামাত্র তার দায়িত্ব পালন করলে দেশময় যে অরাজকতা ও আইন হীনতা চলতে থাকবে—তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একবার ভেবে দেখেছেন কি? প্রসঙ্গত—মওলানা ভাসানীর কথা স্মরণ করা যায় "গুলি করার কথা বলো কেন? 'নকশাল' কি কারো গায়ে লেখা থাকে? যদি কেউ স্বাধীনতার বিরোধীতা করে, তাহলে তাকে ধরো, বিচার করো, শাস্তি দাও, দ্বীপান্তর দাও, দোষী

হলে ফাঁসিতে ঝুলাও, কিন্তু গুলির ভয় দেখিও না।" ইয়াহিয়া-টিকা-নিয়াজিরা—"দেশদ্রোহী" "বিচ্ছিন্নতাবাদী" আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে এদেশের জনগণের উপরে হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ; কে জানে, 'নকশাল-পন্থী' নাম দিয়ে এবার কাদের হত্যা করা হবে!"

কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'সমীক্ষা' পত্রিকার উদ্ধৃত নিবন্ধের মধ্যে বাস্তব ঘটনা ছাড়া তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যের উপস্থাপনার সব বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত না হলেও শেখ মুজিবের ফ্যাসিবাদী উক্তির ব্যাপারে তাদের এই আলোচনাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে এই ধরনের অরাজক উক্তি বেরুতে পারে ; সেই দেশে তারই উগ্রকমিউনিষ্ট বিরোধী আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ কি ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। শেখ মুজিবের ওই উক্তি যে ইন্দিরা গান্ধীকে খুশী করার জন্যেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারেই যে পূর্ববাঙলায় ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে ব্যাপকভাবে বিপ্লবী বামপন্থীদের খুন করা হয়েছে এবং এখনো অহরহ খুন করা হচ্ছে—তা দ্ব্যর্থহীন ভাবেই বলা যায়। এক কথায় বলা যায়—যারা শ্রমিক শ্রেণীর রক্তাক্ত পতাকা ফেলে দিয়ে—শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী পতাকার তলে সমবেত হয়ে রাজনীতি করবে, একমাত্র তারাই 'বাঙলাদেশে' মান-সম্মান নিয়ে টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু যারা এই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করবে, তাদের উপরেই নেমে আসবে স্বর্ণ ঈগলের প্রেতাত্মার তীক্ষ্ণ থাবা। ছিঁড়ে নেয়া হবে ধড় থেকে মুণ্ডুটাই। সে যেই হোক না কেন। 'বাঙলাদেশ'-এর অভ্যন্তরে যেভাবে বিপ্লবী কমিউনিষ্টদেরকে খুন করা হচ্ছে, বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, পরিবার-পরিজনদের উপরে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ; এই সব পরিকল্পনার পেছনে বর্তমানে কিম্বা 'বাঙলাদেশ' গঠন করার পর থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাইতে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবই বেশী পরিমাণে কাজ করছে। জানা যায় যে ভারতে রুশ অ্যামবাসীর মাধ্যমে 'গুরগানভ' নামে একজন সুদক্ষ রুশ গোয়েন্দা সংস্থার উপদেষ্টা ইন্দিরা-গান্ধীর সরকারকে 'নকশালপন্থী' দমন ও সি. পি. এম.-এর অগ্রগতি রোধ করার কাজে পরামর্শ দেয়ার জন্যে ভারতে পাঠানো হয়েছিলো। 'গুরগানভ'-এর ষড়যন্ত্রের নকশা ধরেই ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবাঙলায় 'নকশালপন্থী'দেরকে নির্মম

ভাবে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে সি. পি. এম. কর্মী ও নেতাদেরকে। এবং 'নকশালপন্থী'দেরকে জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যেই রুশ গোয়েন্দা উপদেষ্টার পরামর্শে সি. পি. আই. (এম-এল)-এর ভেতরে 'বিপ্লবী'র ছদ্মবেশে প্রচুর সমাজবিরোধী লোকজনকে টাকা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। যারা ছিনতাই ও নারী নির্যাতনের মতো বহু রকম জঘন্য কাজ করে—সি. পি. আই. (এম-এল)-এর দুর্নাম ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। যদিও চারু-মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ওই পার্টির রণকৌশল ছিলো ভুল ও হঠকারী রণকৌশল। কিন্তু ওই পার্টির প্রকৃত আত্মত্যাগী বিপ্লবীরা কখনোই ছিনতাই কিম্বা নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য কাজের দিকে নিজেদেরকে টেনে নিয়ে যায় নি। তাঁরা দেশে বিপ্লব চেয়েছিলো। তাঁরা চেয়েছিলো মহান 'জনগণ-তান্ত্রিক ভারত' প্রতিষ্ঠা করতে। এ জন্যেই তাঁরা নিজেদের অমূল্য জীবনকে উৎসর্গ করার মতো প্রেরণা পেয়েছিলো। কিন্তু চারু মজুমদারের ভুল রণকৌশলের জন্যে তাঁরা সফল হতে পারে নি। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, হাজার হাজার সাচ্চা বিপ্লবী শহীদের রক্ত কখনোই বিফলে যাবে না। যেতে পারে না। এই সাচ্চা বিপ্লবী রক্তেই একদিন বান ডেকে উঠবে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। জেগে উঠবে আসমুদ্র হিমাচল। জনতার রুদ্ররোষে ভেঙে পড়বে ইন্দিরা গান্ধীরা, গুরগানভেরা।

বিপ্লবী হত্যার কুখ্যাত রুশ গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ 'গুরগানভ' 'বাঙলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পরে 'বাঙলাদেশে'র রাজধানী ঢাকায় গিয়েছিলো যথা সময়েই। এবং 'নকশালপন্থী'র ধুয়া তুলে ব্যাপকভাবে সাচ্চা বিপ্লবীদেরকে খুন করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল হাতকে যথাযথ ভাবেই মদত দিয়েছিলো 'গুরগানভ' সাহেব। আর 'গুরগানাভ' সাহেবদের 'বাঙলাদেশীয়' স্যাঙাতরা—'বাঙলাদেশের দুশমন মাও সে তুঙ ও নিকসন' এই স্লোগান তুলে ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবের সাচ্চা কমিউনিষ্ট হত্যার ঘৃণ্য প্রয়াসকেই শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলো। 'বাঙলাদেশে'র বিপ্লবীদের জন্যে বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাইতে রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বেশী বিপজ্জনক। এখনো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার একচ্ছত্র নেতৃত্ব কায়েম করতে পারে নি 'বাঙলাদেশে'। মস্কো-ওয়াশিংটনের এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গোপন কামড়াকামড়ি 'বাঙলাদেশ'-এর জন্যে আরেকটি রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে—এ ধারনা অমূলক নয়। 'বাঙলাদেশ'কে কেন্দ্র

করে এখনো চলছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। আর এই ষড়যন্ত্র মস্কো কিম্বা ওয়াশিংটন যে শিবির থেকেই চলুক না কেন—নিঃসন্দেহে তা গণচীন বিরোধী ষড়যন্ত্র। নিঃসন্দেহে তা 'বাঙলাদেশে' সম্ভাব্য সি.পি.এম.এল-এর 'জনগণতান্ত্রিক দেশ' গঠনের বিপ্লব বিরোধী ষড়যন্ত্র। 'বাঙলাদেশ'-এর দরিদ্র জনগণ আর তাঁদের সৃষ্ট সম্পদ সুসমভাবে ভোগ করতে পারলো না, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া তা সম্ভবও নয়; কেন না 'বাঁদরের পিঠে ভাগের' মতো এখনো 'বাঙলাদেশ'কে ছিঁড়ে কুটে ভাগ বাটোয়ারা করে খাওয়ার জন্যে বিশ্বের বৃহত্তর দুই শিবির মস্কো ও ওয়াশিংটনের চলছে কামড়াকামড়ি। বেড়ালের পিঠে আর বেড়াল পাবে কি করে? চতুর বাঁদর তা মেপে মেপে 'সমান করার ধোঁকা দিয়ে' সবটাই নিঃশেষ করে খেয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে।

জানা সম্ভব হয়নি সেই কুখ্যাত 'গুরগানভ' এখনো ঢাকায় অবস্থান করছে কি না। এখনো শেখ মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করার জন্যে ষড়যন্ত্রের নকশা নতুন করে অঙ্কন করছে কি না। তবে এটা ঠিক যে, 'গুরগানভ' না থাকলেও 'গুরগানভ'-এর অভাব হবে না। রুশ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চক্রের হাতে অনেক 'গুরগানভ' মজুত রয়েছে। এখনো 'বাঙলাদেশে' সাচ্চা কমিউনিষ্টদের হত্যা করার লোকের অভাব হবে না। ক্ষমতায় বসে আছেন হিটলার-মুসোলিনীর 'বঙ্গসংস্করণ' স্বয়ং শেখ মুজিবর রহমান। আর পেছনে রয়েছে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্র। রয়েছে অসংখ্য সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী। রয়েছে পুলিশ, রয়েছে মিলিটারী। পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে ফ্যাসিবাদ তার সর্বগ্রাসী আগ্রাসন দেশের অভ্যন্তরে চালাতে পারে না; কেন না জনগণ তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে; তাই ফ্যাসিবাদ দেশের ভেতরকার প্রগতিশীল শক্তিকে দুর্বল ও নির্মূল করে দেয়ার প্রাথমিক আক্রমণগুলো পরিচালনা করে—তার নিজস্ব দলীয় 'সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী'র দ্বারা। যেমন করে হিটলার করেছিলো, মুসোলিনী করেছিলো, যেমন করে করছে—ইন্দিরা গান্ধী; ঠিক তেমনি করেই অনুগত শেখ মুজিবও করছেন। আর কি আশ্চর্য হিটলার থেকে শেখ মুজিব পর্যন্ত প্রত্যেকের মুখেই সেই একই শ্লোগান—'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র!' শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী এরা 'খাঁটি সমাজতন্ত্রী'; আর 'খাঁটি সমাজতন্ত্রী' বলেই এরা হত্যা করছে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদেরকে! যাই হোক, 'বাঙলাদেশে' ষড়যন্ত্র চলছে অব্যাহত গতিতেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও মরীয়া হয়ে তার নেতৃত্ব

প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এই কারণেই 'রুশ ঘেষা' ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে নতুন করে সাহায্য দিতে অস্বীকার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটা 'বাঙলাদেশে' 'নয়া উপনিবেশ' কায়েমের ষড়যন্ত্রে ইন্দিরা সরকারের বিশ্বাসঘাতকতারই পরিণতি। তাই ইন্দিরা গান্ধীকেও মার্কিনী চাপের কাছে বাধ্য হয়েই মাথা নত করতে হচ্ছে। মাথা নত করতে হচ্ছে শেখ মুজিবকেও। এমনিতেই আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে 'মার্কিন ঘেষা' সদস্যের সংখ্যা বেশী; তার উপরে মার্কিনী সাহায্য না দেয়ার 'চাপ' আসার সম্ভাবনা থাকায়—মার্চ মাসের নির্বাচনের পরেই, একথা বলা যায় যে, 'বাঙলাদেশে' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে দ্রুত পালাবদল ঘটতে শুরু হয়েছে দেখা যাবে।

কিন্তু রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদও সহজেই 'বাঙলাদেশে' তার প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব হারাতে রাজি হবে কেন? 'বাঙলাদেশে' যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ রয়েছে; তেমনি রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদেরও রয়েছে মণি সিং-এর নেতৃত্বাধীন 'বাঙলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি', রয়েছে মস্কো সমর্থক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। যারা এখন থেকেই একদিকে যেমন আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে—রুশ প্রভাবকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যে, অন্যদিকে তেমনি সমাজতন্ত্রের দুর্গ গণচীনের বিরুদ্ধেও চালাচ্ছে জঘন্য কুৎসা প্রচার। এই অবস্থায় রুশপন্থীরাও চাইছে 'বাঙলাদেশ' প্রশ্নে সোভিয়েত রুশিয়ার সক্রিয় সমর্থনের আকাশকুসুম মহিমা কীর্তন করে—ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগ-বাটোয়ারায় নিজেদের অংশগ্রহণ করার পথকে সুগম করতে। ফলে 'ক্ষমতার হালুয়া-রুটি' ভাগাভাগির স্বার্থের জন্যেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদেরই 'বি. টিম' 'বাঙলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি' ও মস্কো সমর্থক 'ন্যাপ'-এর একটা তীব্র কোন্দল শুরু হয়ে যাবে। এবং তা কোথাও কোথাও সশস্ত্র হতে বাধ্য। প্রতিক্রিয়াশীলরা এইভাবেই স্বার্থের সংঘাতে কামড়াকামড়ি করে নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই মুখ থুবরে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। আর সাচ্চা বিপ্লবীরা 'প্রতিক্রিয়াশীলদের এই হাত পা ভাঙা' পরিস্থিতিতে হানে বিপ্লবী আঘাত। এগিয়ে চলে শ্রমিকশ্রেণীর রক্তাক্ত পতাকা।

কুড়ি

আরেকবার আমরা একটু পিছিয়ে গিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই আলোচনা যদিও বিতর্কের অপেক্ষা রাখে, তবুও এই আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে। কারণ এতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অনেকখানিই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি অনেক জায়গায়—ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও 'বাঙলাদেশে' অনেকের কাছেই একটা জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি; তা হলো—শেখ মুজিবকে হঠাৎ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো ছেড়ে দিলেন কেন? এর পেছনে কি আরো কোনো গোপন অভিসন্ধি আছে? ভুট্টো সাহেব তো খুব সহজেই শেখ মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে ভারতে আটক তার সশস্ত্র বাহিনীর এক লক্ষ সৈন্যকে ছাড়িয়ে আনতে পারতেন। তিনি তা করলেন না কেন? ভারত সরকারই বা কেন এই বিপুল সৈন্য বাহিনীকে আটক রেখে তাদের ভরণপোষণের জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে? তাদের বিচারের কথা বলা হলেও—তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন? নাকি এই সৈন্যবাহিনীকে মুক্তি দিলে পূর্ববাঙলায় বিপুল হত্যাযজ্ঞ চালানোর নায়ক নিয়াজি ও রাও ফরমান আলীর কাছ থেকে মারাত্মক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে? যার সঙ্গে ভারত সরকারেরও প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার গোপন তথ্য বিশ্ববাসী জেনে ফেলবে?

এই সব প্রশ্ন নিঃসন্দেহে জটিল। পুরোপুরি তথ্য ও দলিল ছাড়া এই সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি বাস্তব ঘটনার দৃষ্টান্ত থেকে কিছুটা আলোকপাত করা যায়। এই সব প্রশ্ন যাদের কাছ থেকে এসেছে, তাঁরা প্রায় সবাই প্রগতিশীল চিন্তাবিদ। সুতরাং এই প্রশ্নের পেছনে তাঁরা এমন কিছু কিছু বাস্তব নজীর খুঁজে পেয়েছেন—যার সমাধান বের করতে গিয়েই এই প্রশ্নগুলোকে তাঁদের সামনে রেখেছেন। আমি আগেই অবশ্য এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কথা বলেছি। উল্লেখ করেছি—আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সাজানো নাটকের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শেখ মুজিবর রহমান। শেখ মুজিবকে যখন যেভাবে ঘটনাচক্রের বিভিন্ন দৃশ্যে অভিনয় করতে বলা হয়েছে, তখন সেই সব ক্রমানুপাতিক দৃশ্যে সে তেমনি করেই অভিনয় করেছে।

ঘটনার উপসংহার তার জানা থাকলেও, অনেক পরিস্থিতি অজানা ভাবেই তার সামনে এসে হাজির হয়েছে, কিন্তু তার সৌভাগ্য যে, সেই সব রিহার্সেল বিহীন দৃশ্যতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে তার সাহায্যকারী হিসেবে পর্দার অন্তরালে কাজ চালিয়ে গেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত রুশিয়া ও ভারত। এই পর্দার অন্তরালের সাহায্যের জন্যেই শেখ মুজিব আজ 'বাঙলাদেশে'র প্রধানমন্ত্রী। পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতের দ্বারা প্রতারিত হলে, সেই নেতৃত্ব চলে যায় সোভিয়েত রুশিয়ার হাতে, ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্বে রুষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘে চীনের প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দান করলেও—সে শেখ মুজিবের উপর থেকে বিশ্বাস হারায় নি। কারণ এটা তার জানা ছিলো যে, সময় এলেই শেখ মুজিবকে দিয়েই একদিকে পূর্ববাঙলাকে যেমন 'নয়া ঔপনিবেশিক' শোষণের যাঁতাকলে ফেলা যাবে ; অন্যদিকে তেমনি চীনের বিপ্লবী প্রভাবকে উৎখাত করা ও পূর্ব বাঙলার সাচ্চা বিপ্লবীদেরকে ঠ্যাঙানোর কাজ খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করা যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে অক্ষতভাবে রেখেছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই ভবিষ্যত পরিকল্পনার আগ্রাসী নীতি বাস্তবায়িত করার ষড়যন্ত্রের জন্যেই শেখ মুজিব অক্ষত ছিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের (সি. আই. এ'র) গোপন আঁতাত ছাড়া শেখ মুজিবের পরিত্রাণ লাভের কোনো পথই ছিলো না। ভারত কিম্বা সোভিয়েত রুশিয়ার কোনো প্রচেষ্টাই মুজিবকে রক্ষা করতে সমর্থ হতো না।

যাই হোক আমেরিকা খুবই ভালোভাবে জানতো যে, শেখ মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগ অস্তিত্বহীন একটা কলাগাছ মাত্র। শেখ মুজিবই হচ্ছে আওয়ামী লীগ, ফ্যাসিষ্ট নেতৃত্ব তাই হয়ে থাকে। সুতরাং যে বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের সশস্ত্র মুক্তাঞ্চল ও যুদ্ধে তাঁদের যে নেতৃত্ব কায়েমের সম্ভাবনাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পূর্ববাঙলা দখল করে নিয়েছে, সেই উদ্দেশ্য শেখ মুজিব ছাড়া সফল হতে পারবে না। বরং শেখ মুজিব যতদিন পশ্চিম পাকিস্তানে 'আবদ্ধ' থাকবে, যতদিন শেখ মুজিব বিহীন 'বাঙলা দেশে'র নয়া সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করার চেষ্টা করবে—তা হবে খুবই দুর্বল ও বিশৃঙ্খল সময়ক্ষেপ···যার ফলে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে নেতৃত্বহীন 'পুতুল' সরকারকে উচ্ছেদ করে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

এবং তা করলে ওই নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের থাকবে না। কারণ আওয়ামী লীগ সংগঠন হিসেবে জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। পূর্ববাঙলার স্থানীয় এলাকার জনগণ প্রত্যেকেই তাদের স্বস্থানের দুর্নীতিপরায়ণ আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদেরকে জেনে এসেছে দীর্ঘকাল ধরেই। এই জন্যেই গণধিকৃত ওই সব নেতৃবৃন্দকে নির্বাচনে দাঁড়া করিয়ে ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকার জন্যেই শেখ মুজিবকে তার সৃষ্ট ইমেজ দিয়ে জনগণের কাছে বলতে হয়েছিলো যে, "আমি কাকে দাঁড় করিয়েছি; আপনারা তা দেখবেন না, আমি আপনাদেরকে 'কলাগাছকে' ভোট দিতে বলছি। আপনারা সেই, 'কলাগাছকেই' ভোট দিন; তাহলেই আমার কাছে তা পৌছাবে।" সেই জনগণ কিছুতেই শেখ মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগের ওই সব নেতৃবৃন্দের কোনো কথায় কর্ণপাত করবে না; যার ফলে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা খুব সহজেই আওয়ামী লীগের 'পুতুল সরকারকে' যে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হবে; তাও আমেরিকার অজানা থাকার কথা নয়। সুতরাং শেখ মুজিব যতদিন পশ্চিম পাকিস্তানে 'আটক' থাকবে—ততদিনই পূর্ব বাঙলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমাধিলাভের কাজ এগিয়ে চলবে দ্রুত গতিতে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিয়ে পূর্ব-বাঙলায় এনে ক্ষমতায় বসানো যায়, ততই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কল্যাণকর।

একমাত্র শেখ মুজিবই পারে পূর্ববাঙলায় শক্তিশালী কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদেরকে স্তব্ধ করতে; যদিও প্রতিক্রিয়াশীলরা—ইতিহাসের পাঠকে মনে রাখে না, যদিও তারা যুগে যুগে ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারীতার জন্যে বিধ্বস্ত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, নির্মূল হয়েছে; যেমন হিটলার, যেমন মুসোলিনী, তেজো, রাশিয়ায় জার; তবুও তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ক্ষমতাসীন হয়ে মনে করে তাদের সশস্ত্র গুণ্ডারাহিনী আছে, পুলিশ আছে, মিলিটারী আছে, রাশি রাশি টাকাকড়ি আছে, নিজেদের সরকার আছে; সুতরাং তারা প্রগতিশক্তিকে খুবই অবলীলাক্রমে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু তারা মনে রাখে না "আঘাত যত বেশী হবে, প্রতিরোধ তত দৃঢ় হবে" এই ঐতিহাসিক বাস্তবকে। চীন বিপ্লবের সময়, বিপ্লবের নেতা মাও সে-তুঙ 'জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন' এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন "কুয়োমিনটাং এখন তাদের 'দুর্গ-নীতি' অনুসরণ

করছে ; প্রচণ্ড ভাবে তাদের 'কচ্ছপের খোলা' নির্মান করে যাচ্ছে তারা মনে করে সেগুলো কি প্রকৃতই লৌহ-প্রাকার? মোটেই না। আপনারা দেখুন, হাজার বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটদের প্রাচীর-পরিখা ও প্রাসাদগুলো কি শক্তিমান ছিলো না? তবুও যখনই জনসাধারণ জেগে উঠেছেন তখনই সেগুলো একের পর এক ধ্বসে গিয়েছে। রাশিয়ার জার ছিলো পৃথিবীর অন্যতম নিষ্ঠুরতম শাসক, তবু যখন সর্বহারা শ্রেণী ও কৃষকদের বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটলো তখন কি এই জারের অস্তিত্ব ছিলো? না, কিছুই ছিলো না। আর লৌহ-প্রাকার? সব ধ্বসে গেছে। কমরেডগণ, সত্যিকারের লৌহ প্রাকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, যাঁরা বিপ্লবকে অকৃত্রিমভাবে ও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ-প্রাকার, এটাকে বিনাশ করা, যে কোনো শক্তির পক্ষেই অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই বরং তাকে বিনাশ করবো।" মহান মাও সে তুঙের এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সফল করে তুলেছিলো চীনের কোটি কোটি কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবী জনগণ। কিন্তু চীনের বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর অধিকারী চিয়াং কাইশেক ও তার সহচররা ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে নি যে, তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছত্র-ছায়ায় তাইওয়ানে পালিয়ে গিয়ে নির্বাসিত কাল কাটাতে হবে। তেমনি বিশ্বাস করেনি হিটলার, বিশ্বাস করেনি মুসোলিনী, বিশ্বাস করেনি জার। বিশ্বাস করছে না ক্ষুদে ফ্যাসিষ্ট ইন্দিরা গান্ধী, আর তার অনুগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফ্যাসিষ্ট শেখ মুজিব। বিশ্বাস করে না তাদের নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

বিপ্লবী শক্তির মূল লৌহ-প্রাকার যে, জনগণ ; এটা প্রতিক্রিয়াশীলরা মনে রাখে না বলেই—পূর্ববাঙলাকে ভারতের সশস্ত্রবাহিনী দখল করে, সেখানে হাজার হাজার কমিউনিষ্টকে ও তাদের সমর্থকদেরকে খুন করেছে। অবশ্য পরবর্তী সময় থেকে সেই খুন করার দায়িত্ব নিয়েছে ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী। যাই হোক, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব-বাঙলা দখল করে সেখানে ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট নিধন শুরু করলে ; সি. পি. এম. এল. এবং অন্যান্য বিপ্লবী শক্তি এই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও রুখে দাঁড়ায়। একমাত্র যশোহর ও খুলনায় প্রায় ছয়-সাতশো কমিউনিষ্টকে খুন করে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপে আওয়ামী লীগ

গুণ্ডারা আত্রাইতে হত্যা করে কয়েকশত বিপ্লবীকে। নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, ঢাকা, বরিশাল, রাজশাহী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিং, টাঙ্গাইলসহ সর্বত্র একই ভাবে পরিচালিত হয় কমিউনিষ্ট নিধন যজ্ঞ। আর এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তি প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে শুরু করলে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত। সোভিয়েত সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এ.পি.এন.-এর সাংবাদিক সুপরিকল্পিতভাবে 'স্বাধীনতার বিরোধী' এই ধুয়া তুলে সংগ্রামী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার বিরুদ্ধে শুরু করে কুৎসা প্রচার। পশ্চিমবাঙলার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুষ্ট কাগজ আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরও সোভিয়েত রাশিয়ার 'প্রাভদা'র সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'তোহালীগ্রুপ' ভারত সীমান্তের কাছে 'স্বাধীনতা বিরোধী' কার্যকলাপ চালাচ্ছে ও 'মোহাম্মদ তোয়াহা মুর্শিদাবাদে এসে নকশালপন্থীদের সঙ্গে বৈঠক করছে' ইত্যাদি ধরনের মিথ্যে অপপ্রচার শুরু করে দেয়। বি. বি. সি. ও ভয়েস অব আমেরিকা ও ভারতীয় বেতারে 'দেবদুলালী' নাঁকি কণ্ঠস্বরে চিৎকার শুরু হয়ে যায়—'গেলো গেলো—সব গেলো' 'স্বাধীনতা গেলো'। এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারনার জবাব অবশ্যই দিয়েছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁর সম্পাদিত 'গণশক্তি' পত্রিকার মাধ্যমে। এবং তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও বি. বি. সি. র একই ধরণের যুগপৎ কমিউনিজম্ বিরোধী চিৎকারের মূল্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রগতি শিবিরকে সতর্ক করে দিয়ে এই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। যাই হোক, শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে ব্যাপক কমিউনিষ্ট হত্যা সংঘটিত হওয়ায় সমস্ত 'কাগুজে বাঘেরাই' ভয় পেয়ে যায়। তারা জানতো যে, পূর্ববাঙলায় ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর অনুপ্রবেশ করাকে কিছুতেই সেখানকার বিপ্লবী শক্তি ভালো নজরে দেখছে না; এবং জনগণ সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত হলেও খুব শীগ্গিরই তাদেরও সেই বিভ্রান্তি যে কেটে যাবে, এবং ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট নিধন করায় কমিউনিষ্টরা যে পাল্টা আঘাত হানবেই; এবং জনগণের মেহনতি অংশও যে, কমিউনিষ্টদের পতাকাতলে সমবেত হবে, এইসব কারণে শেখ মুজিবকে খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যে 'বাঙলাদেশে'র ক্ষমতায় তাকে অধিষ্ঠিত করার।

কিন্তু প্রয়োজন যতই হোক, যে পূর্ববাঙলাকে নিয়ে এতসব কীর্তিকলাপ, এত হত্যা, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবতারনা, এবং যার 'মধ্যমণি' হচ্ছে শেখ মুজিব। তাকে কি অত সহজেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসা সম্ভব? সম্ভব যদিও ছিল, কিন্তু বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেয়াও তো মুখের কথা নয়? এই জন্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। বিশ্বজনমত শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠার সময়ের জন্যে। এ ব্যাপারে ভারত ও রুশিয়া, বৃটেন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবস্থা জিইয়ে রাখতে থাকে। বৃটেন খুবই সোচ্চার হয়ে ওঠে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে। এই সময় সরকারীভাবে ভারতের কাছ থেকেও আভাস পাওয়া যেতে থাকে শেখ মুজিবের মুক্তি আসন্ন। নটের নাট্যকার আমেরিকা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলে বিশ্ব জনমতের কাছে নিজেকে বাঙলাদেশ বিরোধী হিসেবে ইতিমধ্যেই দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিল; সুতরাং সে মনে করেছিল যে, শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ তার অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে ঘটলে—বিশ্ববাসী এ ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ করতে পারবে না (এ ব্যাপারে লেখকের বক্তব্য এই নয় যে, শেখ মুজিব মুক্তি না পাক) যে, এতে তার কোনো হাত রয়েছে। এটাই হচ্ছে ঘটনার চমৎকারীত্ব। এই ভাবেই সি. আই. এ. তার কাজ চালায়। তারা 'চোরকেও বলে চুরি করতে, গৃহস্থকেও বলে সজাগ থাকতে।' দুইপক্ষের কাছেই তারা ভাল থাকতে চায়। আর দুইয়ের দ্বন্দ্বের ও সংঘর্ষের মাঝখান দিয়ে তারা তাদের স্বার্থের ক্ষেত্র প্রসার করে নেয়।

যে পূর্ববাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে (গণচীন বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করার জন্যে ও পূর্ববাঙলার আসন্ন সর্বহারা বিপ্লব উচ্ছেদের জন্যে) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুদীর্ঘকালের সঙ্গোপন প্রস্তুতি; সেই পূর্ববাঙলায় শেখ মুজিবের অনুপস্থিতির জন্যে যদি কমিউনিষ্টরাই সেখানে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তাহলে তার চাইতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মঘাতী আর কি হতে পারে? সে জানে, পূর্ববাঙলার কমিউনিষ্ট শক্তিকে একবার যদি পঙ্গু করে ফেলা যায়, তাহলে সোভিয়েত রুশিয়া ও ভারতের কাছ থেকে শোষণের নেতৃত্ব কেড়ে নিতে তার কোনো অসুবিধাই হবে না। কেন না শেখ মুজিব তার নিজের মনের মতো করে গড়া। এবং তার পরোক্ষ অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার জনগণ খুব তাড়াতাড়ি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারবে না;

কারণ সে শোষণ চালাবে বাঙালী মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের মাধ্যমে। জনগণ শোষক হিসেবে তাকে দেখবে না, দেখবে বাঙালী ধনিকদেরকেই। সে হিসেবে ভারতের শোষণের চেহারা হবে প্রত্যক্ষ। কারণ পূর্ববাঙলা হচ্ছে ভারতের পকেটের মধ্যে। সেই হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার জনগণ খুব তাড়াতাড়িই রুষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে রুশিয়ার প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

স্থতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে সোভিয়েত রুশিয়া কিম্বা ভারত কোনো সমস্যা নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বড় সমস্যা হলো পূর্ববাঙলার বুকে কমিউনিষ্ট শক্তির দুর্বার ব্যাপকতা লাভ। এই জন্যেই শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী বিভিন্ন দেশ থেকে উত্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই—আচমকা কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই ভূট্টোর মাধ্যমে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে দেয়া হলো। সমগ্র বিশ্ব শেখ মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লণ্ডনে উড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রথমটায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জেগেছিল এ কেমন করে সম্ভব হল? কেমন করে সম্ভব হল, এর পরেও কি সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন আছে কি কেন জুলফিকার আলী ভূট্টো শেখ মুজিবকে আটকে রেখে ভারতে তার একলক্ষ সশস্ত্র বাহিনীর বন্দী সৈন্যকে মুক্ত করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে পারলেন না? একদিকে পূর্ববাঙলা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর অবাধ পুঁজি সৃষ্টির কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে; তার উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথার বিরুদ্ধাচরণ করে কিছুতেই পাকিস্তানের পুঁজি-পতিরা সাগরে ঝাঁপ দিতে পারে না; স্থতরাং তারা মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। এবং ভারতের কাছে একলক্ষ পাকিস্তানী সৈন্য আটকে থাকায় আমেরিকার পক্ষে খুবই ভাল হয়েছে; কেন না এতে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধাবস্থা বজায় (যতই যুদ্ধপূর্ব সীমানায় উভয়পক্ষ তাদের স্ব-স্ব বাহিনীকে সরিয়ে নিক না কেন) না থেকেই পারে না। ফলে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের নতুন ষড়যন্ত্রের পথ আবিষ্কারের উপায় বর্তমান থেকে গেল। যাই হোক; শেখ মুজিব ঢাকায় এসেই জানালেন—"জুলফিকার-আলি ভুট্টো একজন মহৎ মানুষ। তিনিই ইয়াহিয়ার হাত থেকে তার প্রাণ রক্ষা করেছেন।" এই সেই শেখ মুজিব; যার দল ভুট্টোর মুখে জুতো মেরেছিল; এবং ভুট্টো-মুজিব স্বার্থের যে কামড়াকামড়ির জন্যে কয়েক লক্ষ নিরীহ মানুষের জীবন গেল, কোটি কোটি টাকার ধনসম্পত্তি ধ্বংস হল; এবং যার পরিণতি

হিসেবে শেখ মুজিবকে 'বন্দী' করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল—সেই শেখ মুজিব—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লণ্ডন এবং লণ্ডন থেকে ঢাকায় ফিরে এসেই—সেই ভুট্টোকে বললেন 'একজন মহৎ মানুষ।' তাহলে কি অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, মুজিব-ভুট্টো এবং ভুট্টো-মুজিব-ইন্দিরার মধ্যে একটা গোপন আতাত ছিল ; তাই ঠিক ?

অদ্ভুৎ এই 'বঙ্গবন্ধু' মানুষটি। অদ্ভুৎ তার সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসের ভূমিকা। অদ্ভুৎ তার কমিউনিষ্ট হত্যা করার মানসিকতা। সত্যিই অদ্ভুৎ তার সাজানো নাটকে নায়কের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয়ের। যাই হোক খুনী ভুট্টোকে খুনী শেখ মুজিবের পক্ষেই 'একজন মহৎ মানুষ' বলা সম্ভব। ভুট্টো সাহেবরা হাত রাঙিয়েছেন পূর্ববাঙলার জনতা হত্যা করে ; আর শেখ মুজিব তার হাত রঞ্জিত করেছেন বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের হত্যা করে ; রঞ্জিত করেছেন —পূর্ববাঙলায় হাজার হাজার অবাঙালী হত্যা করে। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পূর্ববাঙলা দখল করলে—আওয়ামী লীগ শুধু মাত্র কমিউনিষ্টদেরকেই হত্যা করে নি। হত্যা করেছে অপরাধী-নিরপরাধী-নির্বিশেষে, নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ ও শিশু সহ হাজার হাজার অবাঙালী জনগণকে। এই হত্যাকাণ্ড চলেছে শেখ মুজিবের পূর্ববাঙলায় ফিরে আসার পরেও। এখনো সুযোগ পেলে, 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে' চালানো হচ্ছে ব্যাপকভাবে 'বিহারী' নিধন। বেশ তো—বিহারীরা না হয়—পশ্চিমপাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করেছে, লুটতরাজ করেছে ; ধরে নিলাম তারা অপরাধী। কিন্তু তাই বলে তাদের হত্যা করার অধিকার আওয়ামী লীগকে কে দিয়েছে ? তাহলে তো ভারতের কাছে পাকিস্তানের যে একলক্ষ সৈন্য আত্মসমর্পন করেছে ; তারাও তো অপরাধী ; তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হলো না কেন ? না, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে (জেনেভা কন্‌ভেনশন অনুযায়ী) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ছাড়া শাস্তি দান করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিহারীদের বেলায় তা হলো না কেন ? যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে গ্রেফতার করে, বিচার করে শাস্তি দেয়াই তো 'গণতান্ত্রিক রীতি নীতি' বলে প্রচার করা হয়। আর শুধু কি বিহারীরাই পূর্ববাঙলায় লুটতরাজ করেছে ? বাঙালীরা কি মিলিটারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাঙালীদের বিষয় সম্পত্তি লুটতরাজ করে নি ? তারা কারা ? আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে একথা বলতে পারি যে, পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শোষক ও শাসকেরা বাঙালী সরলপ্রাণ দরিদ্র মানুষদেরকে বাধ্য

করেছে অমুসলীমদের বিষয় সম্পত্তি লুটতরাজ করতে। বহুক্ষেত্রে এরকম নজীর আছে যে, দিনমজুর শ্রেণীর মানুষদের পাক-মিলিটারীরা ধরে এনে অমুসলীম ও অন্যান্য বিরোধী দলীয় কর্মী ও নেতাদের বাড়িঘর ও তাদের সমর্থকদের দোকান পাট লুট করিয়ে—'মোট' বহন করে তারা চলে যাওয়ার সময় শয়তান পাকসেনারা পাইকারী হারে তাদের উপর গুলি চালিয়েছে। ছবি তুলেছে। ছবি তুলেছে—বিশ্বকে প্রতারিত করার জন্যে। কারণ পাকিস্তান সরকার ওই ছবি ছাপিয়ে বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছে যে পাক-সেনারা পূর্ববাঙলায় কোনো লুটতরাজ করে নি। বাঙালীরাই বাঙালীদের বিষয় সম্পত্তি লুট করেছে।

তবুও আমার বক্তব্য, ঢাকায় শেখ মুজিবের উপস্থিতি সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বিহারী জনগণ কি করে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো? কি করে খুলনার খালিশপুরে এই কিছুদিন আগে সুপরিকল্পিতভাবে শিশু সহ কয়েক হাজার বিহারী খুন হলো? কি করে—ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, খুলনা ও ঢাকার মীরপুর, মুহম্মদপুর, ঠাটারী বাজার, যোগীনগর, উত্তর মৈশুণ্ডি, দক্ষিণ মৈশুণ্ডি, ও নবাবপুর রোডের বিহারী অধ্যুষিত এলাকা আজ বিহারী শূন্য হলো?

আমার বক্তব্য—প্রখ্যাত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী সাহিত্যক ও চলচ্চিত্র পরিচালক জহীর রায়হান 'বাঙলাদেশ' গঠনের পরে কেন মর্মান্তিক-ভাবে খুন হয়েছেন। এই খুনের পেছনে কাদের হাত রয়েছে? প্রচার করা হয়েছে যে, "জহীর রায়হানের বড়ো ভাই প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ্ কায়সার (পাক সেনাদের হাতে নিহত) বেঁচে আছেন এবং বিহারীরা তাঁকে মুহম্মদপুরে আটকে রেখেছে; এই খবর পেয়ে শহীদুল্লাহ্ কায়সারের খোঁজে কিছু সংখ্যক পুলিশ নিয়ে—জহীর রায়হান মুহম্মদপুর গেলে বিহারীরা তাদের উপরে আক্রমণ চালায়, এবং সংঘর্ষে জহীর রায়হান নিহত হন।" নিশ্চয়ই জহীর রায়হান, বড়োভাই শহীদুল্লাহ্ কায়সারের অনুসন্ধান করতে মুহম্মদপুর গিয়েছিলেন; কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি বিহারীদের হাতে নিহত হন নি। জহীর রায়হানের ডেডবডি আজো খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু এটা ঠিক, জহীর রায়হান বেঁচে নাই। এক সুপরিকল্পিত ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েই প্রাণ হারিয়েছেন জহীর রায়হান। প্রাণ হারিয়েছেন তিনি—সমাজবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী হিসেবেই। নিঃসন্দেহে এটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। কারণ—পূর্ববাঙলার

ঘটনাবলী নিয়ে জহীর রায়হান একটি বাস্তব ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, নিঃসন্দেহে যা সামন্তবাদ, ফ্যাসিবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ হতো…; যা হতো শ্রেণী সংগ্রামের বক্তব্যে উদ্দীপ্ত; জহীরের ক্ষমতা ছিলো, তিনি চলচ্চিত্রে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটাতে নিশ্চয়ই সক্ষম হতেন, তাঁর 'জীবন থেকে নেয়া' (যদিও অনুত্তীর্ণ ছবি) ছায়াছবিটি পূর্ববাঙলার ব্যাপক আলোড়োন সৃষ্টি করেছিলো। 'জীবন থেকে নেয়া' ছিলো তাঁর নিরীক্ষামূলক প্রথম প্রয়াস। তাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টিশীল প্রয়াস ছিলো—ইংরেজী ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট।' এতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে রক্তাক্ত বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী মানুষকে লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে তিনি তুলে ধরেছিলেন 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছবিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই আন্তর্জাতিকতার আবেদনশীল ছবিটি পূর্ণাঙ্গ তৈরী হওয়ার আগেই পূর্ববাঙলায় অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ছবিটি মুক্তিলাভ করতে পারেনি শেষাবধি। যাই হোক, পূর্ববাঙলার লড়াই নিয়ে জহীর রায়হানের ছায়াছবি নির্মাণের যে পরিকল্পনা ছিলো; এবং এই ছবি তৈরীর প্রাথমিক মাল-মশলা তিনি নিজের কাছে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এই ছবি নির্মিত হলে সারা বিশ্বে একটা তুমুল আলোড়োন উঠতো; যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধেই জনমত গড়ে তুলতো—; রায়হানের সেই বিপ্লবী প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যেই তাঁকে হত্যা করার ফাঁদ পাতা হয়। তাঁকে মিথ্যে খবর দেয়া হয় যে, শহীদুল্লাহ্ কায়সার জীবিত আছেন। তাঁকে মুহম্মদপুরে রাখা হয়েছে। এবং তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব। এই ভাবে জহীর রায়হানকে প্রলুব্ধ করে মুহম্মদপুরে নিয়ে গিয়ে 'বিহারীদের' সঙ্গে গোলোযোগ করার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ফ্যাসিষ্ট বাহিনীই গুম্ করে খুন করে।

নিহত অগ্রজের অনুসন্ধানে গিয়ে অনুজ জহীর রায়হানও খুন হলেন। দুই ভায়ের সদ্যবিধবা দুই বউ শাদা পোশাকে গেলেন শেখ মুজিবের কাছে বিচার-প্রার্থী হয়ে। কিন্তু 'বঙ্গবন্ধু' "ওদেরকে চলে যেতে বলো আমার সামনে থেকে" বলে শোক প্রকাশের অভিনয় করে ফরিয়াদীদেরকে সরিয়ে দিলেন। কোনো তদন্ত হলো না। কোনো বিচার হলো না। পূর্ববাঙলার সচেতন জনগণ "বঙ্গবন্ধু"র এই আচরণে বিস্মিত হয়েছিলো সেদিন। কিন্তু এতে বিস্ময় প্রকাশ করার কিছু নেই। শেখ মুজিব নিরুপায়; জহীর রায়হানের

খুনে "বঙ্গবন্ধু"র নিজের হাতই যে, রক্তাক্ত। কাকে তিনি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন? তাহলে যে নিজেকেই গিয়ে দাঁড়াতে হয়—আসামীর কাঠগড়ায়। কিন্তু মহাকালের অমোঘ নিয়মে সত্যিই যদি একদিন শেখ মুজিবকে আসামীর কাঠগড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়?

একুশ

মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গে বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে আমি আমার জানা দরকার এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম। সময়টা ছিলো ১৯৭২ সনের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। ওই সময়টা ছিলো কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের জন্যে দুর্যোগপূর্ণ। যত্রতত্র ফ্যাসিষ্ট বাহিনী পূর্ববাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিষ্টদের উপরে একে একে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলো। শত শত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর রক্তে বাঙলার সবুজ প্রান্তর হয়ে উঠেছিলো রঞ্জিত। চারদিকে ভয়ানক একটা থমথমে পরিবেশ। কেউ গলা চড়িয়ে কথা বলার সাহস পাচ্ছিলো না। জনসাধারণের মনেও গভীর আতঙ্ক। কারো মনে প্রফুল্লতা নেই। আনন্দ নেই। আনন্দ আর প্রফুল্লতা যেন গুটি কয়েক মানুষের ঘরে তখন বন্দী হয়ে রয়েছে। জনগণ সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত। মনে হাজারো শঙ্কা। এই বুঝি কি হয়। এই বুঝি অত্যাচারের খড়্গ ঘাড়ের উপর নেমে আসে। রাজধানী ঢাকা শহরে একেবারেই প্রাণস্পন্দন নেই। এ যেন ঢাকা নয়। এ যেন শ্মশানের শূন্যতাভরা কোনো বিরানভূমি। সেই বিরানভূমিতে নিরাপত্তাহীন আমি যেন নিজেকেই শুধালাম; দেশ কি 'স্বাধীন' হয়েছে? যদি একটা শ্রেণীর 'স্বাধীন' শব্দটি বাস্তব হতো তাহলে 'স্বাধীনতা'র পরে জনগণ ভীত কেন? এখন তো আর ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজি, ফরমান আলীর 'গেট রেডি-চার্জ' কম্যাণ্ড নেই? তাহলে এই হতাশা, এই আতঙ্ক, এই নিরানন্দতা কেন? কেন আমি নিজেও আজ নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছি না? ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চ থেকে দীর্ঘ নয়মাস বেপরোয়া নরহত্যা আর গোলাবারুদের গন্ধমাখা পরিবেশে নিজেকে যেমন চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে সদা সতর্ক করে রেখেছি, নিজেকে যেমন নিরাপত্তা বিহীন মনে করেছি, এখনো তেমনিই পরিস্থিতি আমার চারপাশ ঘিরে আক্রমণাত্মক। যে কোনো মুহূর্তের জন্যে নিজেকে তৈরী রাখতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তর যেন খুঁজে

পেয়েছি। হ্যাঁ, 'স্বাধীনতা' ঠিকই এসেছে। সে 'স্বাধীনতা' আমাদের জন্যে নয়, সে 'স্বাধীনতা' হচ্ছে বিশেষ একটা শ্রেণীর জন্যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠীর জন্যে। আমাদের জন্যে আপাততঃ অধীনতা। এই অধীনতা বেশ কয়েক বছর একটানা চলতে থাকবে। তারপর একদিন মহাকাল তার অমোঘ নিয়মের চাকা ঘুরিয়ে দেবে। পবিত্র রক্তপাতে ফসিল পূর্ববাঙলায় জেগে উঠবে নতুন এক মহাসূর্য।

না, ঘটনা লিখতে বসে কাব্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আত্মপ্রচারও আমার উদ্দেশ্য নয়। কাব্য অনেক করেছি। কাব্য দিয়ে কোনো ফসল ফলাতে পারিনি। মেহনতি জনতার ঘামে ভেজা রক্তের কসম খেয়ে যে কাব্য আয়ুব আর ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে লিখেছি; আজ তার কোনো মূল্য নেই। যে দেশের জন্যে, যে জনতার জন্যে বেপরোয়া দুঃসাহসে আয়ুব-ইয়াহিয়ার জেল-জুলুম-দৈহিক অত্যাচারকে হাসিমুখে সহ্য করেছি; সেই দেশে নিজেকে আবারো পরাধীন করলাম। কোনো অধিকার রইলো না কথা বলার; অন্যায়ের প্রতিবাদ করার। মাথার উপরে খড়্গ। চারদিকে অক্টোপাসের থাবা। হ্যাঁ, এ এক বিচিত্র অনুভূতি। এই অনুভূতি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় এসেছি। পূর্ববাঙলায় রটনা হয়ে গিয়েছিলো—ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে আমি নিহত হয়েছি। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় মাসিক সাহিত্য পত্রিকায়, বিভিন্ন জার্ণালে, ঢাকার বাঙলা একাডেমির শোকসভায় আমি নিহত। সুহৃৎ কবি বন্ধুদের কবিতায় আমি শহীদ। বাঙলা একাডেমির 'হে স্বদেশ' কবিতা সঙ্কলনের ভূমিকায় দেখলাম আমি শহীদ হয়েছি। আমি নিহত হয়েছি। পরিচিতরা চোখের জল ফেলেছে। আমি বেঁচে নেই এই সংবাদ তাঁদেরকে ব্যথিত করেছে। কুষ্টিয়া শহরে পা দিয়ে বুঝলাম আমার সুহৃদরা, পূর্ববাঙলার বিপ্লবী সূর্যমুখরা কি বেপরোয়া আন্তরিকতা নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলো। ১৯৭২ সনের মার্চ মাসের চার তারিখে কুষ্টিয়ার অন্বেষা গোষ্ঠীর সূর্যমুখরা সম্বর্দ্ধনা জানালো আমাকে। সেই আমি প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখনো কুষ্টিয়ার বুকে চলছিলো প্রগতিশীলদের হত্যাকাণ্ড। সেই রক্তাক্ত মুহূর্তে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম—শোনো পূর্ববাঙলার মানুষ, স্বাধীনতার নামে নতুন করে আমরা আবার পরাধীন হলাম। এই শিকল পরা পরাধীনতা আরো ভয়ানক আরো কঠিন। কুষ্টিয়ার শ্রমিকরা, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা, প্রগতিশীল

বুদ্ধিজীবিরা আমাকে ঘিরে রেখেছিলো বেশ কিছুদিন। তাঁরা সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছিলো আমাকে। ঢাকা আসার পথে আমি তাঁদের ভালোবাসা-সিক্ত উপদেশকে স্মরণ করে রেখেছিলাম। ঢাকা শহরে পা দিয়ে উপলব্ধি করলাম, হ্যাঁ, পরিস্থিতি প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে অকৃটোপাসের মতো তীক্ষ্ণ থাবা বিস্তার করে রেখেছে। তবুও আমি বেঁচে আছি এই সংবাদে আমার পরিচিত বহু তরুণ ছুটে এসেছিলো। পূর্ববাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমন্ত্রণ এসেছিলো—সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁদের সঙ্গে শরীক হওয়ার জন্যে। ভেবেছিলাম এবার সর্বশক্তি নিয়োগ করবো—সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্যে। কিন্তু তা আর হলো না। পরিবেশ আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। জানতাম না তিনি কোথায় আছেন। কেমন আছেন। কি করছেন। শুনেছিলাম আবদুল হক সাহেবের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে রাজনৈতিক মত-বিরোধের দরুণ। আবদুল হক সাহেবরা 'বাঙলাদেশ'কে মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও কামড়াকামড়ি তা প্রকৃতপক্ষে পাটক্ষেতের মধ্যে শিকার নিয়ে দুই শেয়ালের পারস্পরিক শক্তি পরীক্ষার নামান্তর। দুই শেয়ালের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ফলে অবশ্যই কিছু পাটগাছ নষ্ট হয়েছে; এটা হবেই। তেমনি ইয়াহিয়া-মুজিবের পারস্পরিক আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ফলে কিছু প্রাণহানী অবশ্যই হয়েছে; কিন্তু এটা নাকি জনগণের উপরে আক্রমণ নয়। দুই শেয়ালের ঝগড়ায় পাটগাছ নষ্ট হওয়ার মতো কিছু প্রাণহানী হয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহা এই যুক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি। মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছেন যে, নিশ্চিত ভাবেই ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী জনগণের উপরে আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েক লক্ষ নিরীহ জীবন নষ্ট হয়েছে, জনগণের বিষয় সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়েছে। লুন্ঠিত হয়েছে। নারীত্বের উপরে চালানো হয়েছে পৈশাচিক বর্বরতা। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা জনগণের উপরে আক্রমণ। জনগণ পাটগাছ নয়। আবদুল হক সাহেবরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যেহেতু পূর্ববাঙলা মুজিবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে, তার নেতৃত্বে পূর্ববাঙলা বিচ্ছিন্ন হলে, সেখানে গণচীন বিরোধী ও কমিউনিষ্ট বিরোধী ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি তৈরী হবে, সেইহেতু পাকিস্তানকে অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে প্রয়োজন হলে—চরম প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধর্মীয় অনুচর আবুল আলা মওদুদীর জামাতে ইসলাম

ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে—ইয়াহিয়ার পক্ষে দাঁড়ানোই নাকি যুক্তিসঙ্গত ছিলো।

মোহাম্মদ তোয়াহা আবদুল হক সাহেবদের এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন—জনগণ যে পক্ষ দ্বারাই আক্রান্ত হোক না কেন, জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোই হলো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এবং মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা নিজেদের রণকৌশল ও শক্তি নিয়েই সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে—লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত। যদিও আবদুল হক সাহেবরা মোহাম্মদ তোয়াহা ও তার অনুসারীদেরকে ঠাট্টা করে বলেছেন যে, মোহাম্মদ তোয়াহারা হচ্ছে 'মার্কসবাদী আওয়ামী লীগ।' আবদুল হক সাহেবদের এই রসিকতা প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদীদের হাতকেই শক্তিশালী করেছে। যেহেতু সমস্ত দেশীয় ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মোহম্মদ তোয়াহা ও সি. পি. এম. এল। সেই হেতু আবদুল হক সাহেবদের এই অরাজনৈতিক রসিকতা মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতকেই শক্তিশালী করবে—তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। প্রগতিশীলদের এই অনৈক্যের ফলেই পূর্ববাঙলার হাজার হাজার কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের জীবন দিতে হয়েছে ফ্যাসিবাদের খড়্গের নীচে।

সি. পি. এম. এল বলেছে 'বাঙলাদেশ'কে মেনে না নেবার কোনো বাস্তব যুক্তি নেই। 'বাঙলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত সত্য। পূর্বপাকিস্তান কিম্বা পূর্ববাঙলা থেকে সাইনবোর্ড পাল্‌টিয়ে 'বাঙলাদেশ'-এর সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়েছে মাত্র। এই সাইনবোর্ডই বাস্তবসত্য। কিন্তু জনগণের মুক্তি আসেনি। অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মুক্তির বদলে জনগণ নতুন করে জাতীয় অধীনতার শিকারে পরিণত হয়েছে। একটি দেশে বসবাস করতে হলে সেই দেশের সাইনবোর্ডের পরিচয় দরকার হয় সবার আগে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সি. পি. এম. এল. 'বাঙলাদেশ'কে বাস্তব সত্য বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু তাই বলে কি সি. পি. এম. এল তাঁদের ঐতিহাসিক বিপ্লবী কর্মসূচী থেকে বিচ্যুত হয়েছে? সি. পি. এম. এল যদি 'মার্কসবাদী আওয়ামী লীগ' হতো তাহলে তাঁদের উপরে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা আক্রমণ চালাতে থাকবে কেন? কেন শত শত কমরেডদেরকে হত্যা করবে ফ্যাসিবাদীরা? বরং 'মার্কসবাদী আওয়ামী লীগ' হলে ভারতের সি. পি. আই ও তাদের পূর্ববাঙলার বশংবদ বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মতোন ভারতের

নব কংগ্রেস কিম্বা পূর্ববাঙলার আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্রছায়ায় বহাল তবিয়তে থাকতে পারতো নিশ্চিন্তে। ভারতের সি. পি. আই-এর নব কংগ্রেসের সঙ্গে তথাকথিত প্রগতিশীল মোর্চা গঠন করার মতো সি. পি. এম. এল আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে সুখে স্বচ্ছন্দে 'হেইয়ো মারো' দায়িত্ব পালন করে নেতা ও দল দুইকেই বাঁচাতে পারতো। কিন্তু সি. পি. এম. এল তা করেনি। বরং নির্দ্বিধায়, নির্বিশঙ্ক চিত্তে, নির্ভিক দৃঢ়তার সঙ্গে বাঙলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পরে পরেই সমস্ত রকমের দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্র ও গণবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সি.পি.এম.এল একটানা প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে। সঠিক নীতি নির্দ্ধারনী বক্তব্য; জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। কিন্তু গণশক্তির টুঁটি টিপে ধরা হলো। 'বাঙলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পরে প্রথম 'গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' 'জাতীয়তাবাদ' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পরম পরাকাষ্ঠা দর্শিত হলো গণশক্তি কাগজের কণ্ঠরোধ করে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়েছিলো যে, 'বাঙলাদেশ' গঠনের পরে গণশক্তির আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পূর্ববাঙলা থেকে কি বিপুল সাড়া জেগেছিলো। দেখতে দেখতে গণশক্তির প্রচার সংখ্যা আশাতীত হয়ে উঠেছিলো। কেবলমাত্র পার্টির সদস্য ও সমর্থকরাই গণশক্তি পড়েনি প্রকৃত তত্ব ও তথ্য পাওয়ার আশায় জনগণের এক ব্যাপক অংশও গণশক্তি পাঠ করতে শুরু করেছিলো। আমি নিজে পূর্ববাঙলার এক মস্তবড়ো সরকারী আমলাকে তার অফিসের ড্রয়ারে তালাচাবি দিয়ে গণশক্তি আটকে রাখতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি গণশক্তি পড়েন কেন? আওয়ামী লীগের কেউ এটা জেনে রিপোর্ট করলে তো আপনার চাকরী চলে যাবে! ভদ্রলোক উত্তরে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গণশক্তি পড়ার অপরাধে আমার চাকরী চলে গেলে—সরকারী প্রশাসন থেকে অন্তত কয়েক হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাই করতে হবে। যেহেতু তারাও নিয়মিত গণশক্তি পড়ে। ভদ্রলোক বলেছিলেন আমরা সবাই যে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করি এটা মনে করছেন কেন? চাকরী হচ্ছে জীবিকা। দেশ ও জনগণ জীবিকার উর্দ্ধে। দেখবেন, কালক্রমে আওয়ামী লীগ ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হবে। ফ্যাসিবাদ চিরস্থায়ী নয়।

যাইহোক, আমি অনেক চেষ্টা করে মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলাম। প্রায় একবছর পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি করার সময় সব সময়ই তাঁর সাহচর্য পেয়েছি।

কিন্তু ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রির পরে এই প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে মনে হলো কত যুগ পরে পূর্ববাঙলার ধান-মাটি-কাব্যের দেশের প্রকৃত নেতার মুখোমুখি হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। কারণ ফ্যাসিবাদের গোপন প্রেতাত্মা তখন তাঁকে খুঁজে ফিরছিলো। যদিও তখনো ওয়ারেন্ট বেরোয়নি, কিন্তু গুপ্তঘাতকের দল তাদের শ্যেণ দৃষ্টি সজাগ রেখেছিলো। তাই মোহাম্মদ তোয়াহাকে বাধ্য হয়েই সূর্যালোকের জগত থেকে নক্ষত্রলোকের জগতে বিচরণ করতে হচ্ছিলো। আমি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করবো বলে। মনে মনে গভীর আতঙ্ক, কি জানি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তিনি যদি কোনো বিপদে পড়েন? যদি কোনো মারাত্মক ক্ষতি হয়? তাহলে আমিই হব অপরাধী। চিরদিন আমাকে অনুতাপে দগ্ধ হতে হবে। কারণ আগেই বলেছি যে ওই সময়টা ছিলো সাচ্চা কমিউনিষ্টদের জন্যে একটা গভীর দুর্যোগপূর্ণ সময়। কমিউনিষ্টদেরকে গ্রেফতার না করে যত্রতত্র গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিলো। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে দেশী ও বিদেশী চক্রের সাজানো পরিকল্পনা। কারণ যে কোনো হত্যাই ছিলো সুপরিকল্পিত। এবং যারা খুন হচ্ছিলো তাঁরা সবাই প্রগতিশীল বামপন্থী। আর এজন্যে কোনো সরকারী আইন আদালত ছিলো না। ফ্যাসিষ্টদের প্রত্যেকের হাতেই সাজানো আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে তাদের কোনো অসুবিধে ছিলো না। খুন করার দায়ে গ্রেফতার হওয়ারও কোনো ভয় ছিলো না। In the name of Nakshal সমগ্র পূর্ববাঙলায় চলছিলো ব্যাপক কমিউনিষ্ট নিধনযজ্ঞ। স্বয়ং 'জাতির পিতা' শেখ মুজিব 'নকশাল দেখা মাত্র গুলি করো' নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং হত্যাকারীরা আর কাকে পরোয়া করে!

অবশেষে আমার ধারণা অমূলক করে মোহাম্মদ তোয়াহা রাত্রির অন্ধকারে আমার সামনে এসে হাজির হলেন। এসেই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন। নেতার চোখে আনন্দের অশ্রু। বললেন—আমরা জানি তুমি শহীদ হয়েছ কবি। আবার তোমাকে যে ফিরে পাবো তা মনে করিনি। অশ্রু আমার চোখেও। সেই মুহূর্তে কেন যেন আমার মনে হলো—না, পূর্ববাঙলায় একদিন প্রকৃত মুক্তি সূর্য উঠবেই। কোনো অশুভ শক্তিই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না। সূর্য উঠবেই। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবেই। এদেশে এখনো আত্মত্যাগী স্বাগ্নিক পৌরুষ বেঁচে রয়েছেন।

যার একক অস্তিত্বের প্রাণ স্পন্দনে অঙ্গীভূত করেছে আত্মত্যাগের মহান চেতনা। সেই দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি বসে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলাম। আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিলো। আমি অসংকোচে সেই সব প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

যেমন, ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী পূর্ববাঙলায় নির্বিচার গণহত্যা চালানোর পরে বি. বি. সি. বেতার থেকে প্রচার করা হতে থাকে যে, সীমান্ত অরক্ষিত থাকার দরুণ ভারতের পশ্চিম বাঙলা থেকে হাজার হাজার 'নকশাল পন্থী' পূর্ববাঙলায় ঢুকে পড়েছে এবং তাঁরা মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এবং লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায়ও ওই সময় এই একই ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এই সব প্রচারনার নেপথ্যে যে উদ্দেশ্য ছিলো; তা হলো যাতে এই লড়াই-এর নেতৃত্ব মোহাম্মদ তোয়াহার হাতে না চলে যায়। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যাতে সময় থাকতে সচেতন হয়ে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বকে খতম করতে পারে; বি.বি.সি.র প্রচারনা ছিলো এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যদিও এই ধরনের প্রচারনার জন্যে বামপন্থী কিছু মহলের মধ্যে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো। কেন তোয়াহাকে নিয়ে বি. বি. সি. এত প্রচার চালাচ্ছে? এই বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যে আমি মোহাম্মদ তোয়াহাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বি. বি. সি. র প্রচারনার কথা আমরা জানি; কিন্তু গার্ডিয়ান পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ বেরিয়েছে—তাতে কিছু কিছু সঠিক তথ্য রয়েছে। এগুলো ওরা সংগ্রহ করলো কিভাবে? আপনার সঙ্গে কি ওদের কারো যোগাযোগ হয়েছিলো? মোহাম্মদ তোয়াহা হাসি মুখে বলেন—হ্যাঁ, আমি তখন নোয়াখালিতে। প্রাথমিক আক্রমণে কমরেডরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে নোয়াখালির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আমাকে ছুটোছুটি করতে হয় তাঁদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ও আসন্ন দায়িত্ব পালনের কর্মসূচী তাঁদের সামনে তুলে ধরার জন্যে। আমরা তখন (ই. পি. সি. পি. এম. এল) লড়াই শুরু করে দিয়েছি। গণফৌজ গড়ে তুলছি। নিজেদের গেরিলা বাহিনীকে বিভিন্ন আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মাঝখান দিয়ে অস্ত্র সজ্জিত করছি। গ্রাম থেকে শত্রুবাহিনীর এজেন্টদেরকে নির্মূল করছি। গণআদালতের সামনে অপরাধীদের বিচার করছি। শোষক জোতদারদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে গরীব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করার কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের

'মুক্তিবাহিনী' সেইসব জোতদার ও মহাজন ইজারাদারদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের গণবাহিনীর সদস্যদের উপরে বিভিন্ন কায়দায় ভারতীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ চালানো শুরু করে দিয়েছে। আমরা যথাসম্ভব সেই আক্রমণ এড়িয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগের 'মুক্তিবাহিনীকে' আমাদের উপরে আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে চলেছি। পরিস্থিতিটা ছিলো খুবই মারাত্মক।"

একটু দম নিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা। তারপর বলতে লাগলেন, "একদিকে খান সেনারা, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের 'মুক্তিবাহিনী'র লোকেরা আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো। এই পরিস্থিতিতে আমরা ভাবছিলাম, আওয়ামী লীগের 'মুক্তিবাহিনী'র দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকলে—আমরা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কিনা। এই রকম সময়ে ঢাকায় আগত গার্ডিয়ান পত্রিকার একজন সাংবাদিক ঘুরতে ঘুরতে নোয়াখালিতে চলে আসে। এসে আমার খোঁজ করতে থাকে। তোমরা জানো, নোয়াখালি আমার জন্মস্থান; এই জেলায় আমার ছোটোখাটো একটা পরিচয় রয়েছে। এবং ওই সময়টা আমাদের কমরেডরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন। যাই হোক আমি তখন গ্রামাঞ্চলে। বহু চেষ্টা করে সেই সাংবাদিক আমার কাছে খবর পাঠায়। প্রথমে আমি দেখা করতে চাইনি। পরে গার্ডিয়ানের সাংবাদিক, ওরা কিছুটা সঠিক তথ্য পরিবেশন করে থাকে, আর আমাদের যা অবস্থা, বিশ্ববাসীকে সঠিক খবরও জানানো দরকার; এই সব ভেবেই আমি গার্ডিয়ানের সেই সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাত দান করি। এবং তাকে সেই অবস্থায় আমাদের কি বক্তব্য তা ব্যাখ্যা করি। কিছু প্রচারপত্র ছিলো—তা দেখাই। এবং ভালোভাবেই তাকে বলেছিলাম যে, আমাদের সম্পর্কে তোমরা অতিরঞ্জিত কিছু প্রচার না করে, সঠিক খবরটুকুই কেবল তুলে ধরবে। গার্ডিয়ানের সেই সাংবাদিক আমার সঙ্গে আলোচনা করে খুবই খুশী হয়েছিলো। আমাকে বলেওছিলো, সে তার পত্রিকায় যথাযথ ভাবে এই পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য-আদর্শ তুলে ধরবে। বি. বি. সি গার্ডিয়ানের খবর থেকেই প্রচার চালিয়েছে। অপব্যাখ্যা করেছে তত্ত্ব ও তথ্যের। বি. বি. সি. এটা করবেই। এ নিয়ে যদি বামপন্থী মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। আমরা কুৎসার

যা—   ংসা দিয়ে নয়। আমাদের জবাব হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-চিন্তাধারার সঠিক প্রয়োগে। যারা কুৎসায় বিভ্রান্ত হয়, তারা জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কমিউনিষ্টদের চেতনা ভাববাদ দিয়ে সংহত নয়; বস্তুবাদ দ্বারা সংহত। তার বিকাশ হবে কাজে, কুৎসায় নয়। ঐতিহাসিক ভাববাদ হচ্ছে মেহনতি জনগণের আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে নিহীত। বস্তুবাদ ছাড়া ঐতিহাসিক ভাববাদের সৃজন হয় না। পৃথিবীর সমস্ত সাচ্চা কমিউনিষ্টরা হচ্ছে অভিন্ন আত্মা। ঐতিহাসিক ভাববাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও নর্মান বেথুনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যাইহোক, ভাববাদ আর ঐতিহাসিক ভাববাদের মধ্যে তফাত আছে। এ জন্যেই বলেছি কমিউনিষ্টরা বস্তুবাদ দ্বারা সংহত। তাঁরা কেন কুৎসায় বিভ্রান্ত হবে? যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হয়, বুঝতে হবে—তারা সখের কমিউনিষ্ট। কখনোই তারা জনগণের কাছে যায় নি। জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেনি।"

"এই ত্যাখো, ভারতের পশ্চিম বাঙলার প্রগতিশিবির যে উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াই শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্দিরা সরকারের উপরে 'বাঙলাদেশ'কে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করলো, অস্ত্র দেয়ার জন্যে আন্দোলন করলো, এটা তাঁরা যে উদ্দেশ্যে করেছিলো, হলো তার উল্টো। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার চেয়েছিলো প্রগতিশিবির থেকে এই ধরণের দাবী উঠুক। অর্থাৎ দাবী উঠলে নিজেদের বাছাইকরা এজেন্টদের হাতে অস্ত্র দিয়ে পূর্ব-বাঙলার প্রগতিশিবিরের উপরে হামলা শুরু করলে তখন আর পশ্চিমবাঙলার প্রগতিশীলরা বলতে পারবে না যে, অস্ত্র দেয়া বন্ধ করো। হলোও তাই। প্রগতিশীলদের 'অস্ত্র দাও' এই দাবীকে হাতিয়ার করে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ভারতে আশ্রয়রত আওয়ামী লীগের মন্ত্রীপরিষদের মাধ্যমে বাছাই করা এজেন্টদেরকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে পূর্ববাঙলার অভ্যন্তরে শুরু করলো কমিউনিষ্টদের উপরে হামলা। স্থানে স্থানে খুন করতে লাগলো কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্মীকে। পশ্চিম বাঙলার প্রগতিশীলরা এসব জেনেও তখন আর এর প্রতিবাদ করতে পারলো না। কেননা তখন প্রতিবাদ করার পরিস্থিতি সেখানে ছিলো না। অর্থাৎ প্রগতিশীলরা চাইলো এক প্রতিক্রিয়াশীলরা করলো আর এক। এ ক্ষেত্রে 'অস্ত্র দাও' দাবী না করাটাই ছিলো পশ্চিম বাঙলার প্রগতিশীলদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এই একই সাহসে সাহসী হয়ে এই লড়াইকে দীর্ঘস্থায়ী হতে

না দিয়ে ফ্যাসিষ্ট ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পূর্ববাঙলার অভ্যন্তরে প্রায় দুই লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য পাঠাতে সাহস করেছিলো। আমরা চেয়েছিলাম এ লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হোক। আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করবো। কেন অশুভশক্তি পূর্ববাঙলা দখল করে তাদের আন্তর্জাতিক গণবিরোধী ষড়যন্ত্র সফল করুক আমরা কখনোই তা চাই নি। জোর করে আমাদের ঘাড়ের উপরে 'স্বাধীনতা'র নামে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পরাধীনতার জগদ্দল পাথর।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—বিরোধীরা বলছে আপনি নাকি সুদীর্ঘ এক ফিরিস্তি লিখে ভারতে 'বাঙলাদেশের' প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন ?

মিথ্যে কথা। বলেন মোহাম্মদ তোয়াহা।

প্রশ্ন করেছিলাম—নিয়াজির কাছে আপনি নাকি চিঠি দিয়েছিলেন—পূর্ববাঙলার স্বাধীনতা বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত ? সেই চিঠি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেবার হুমকি দিয়েছেন শেখ মুজিব ?

মোহাম্মদ তোয়াহার হাসিমুখ জবাব—বেশতো—শেখ মুজিবের হাতে প্রমান থাকলে—তিনি তা প্রকাশ করে দিলেই তো ভালো হয়।

আমার প্রশ্ন—আপনার সুদীর্ঘদিনের সহকর্মী আবদুল হক সাহেবকে কি পার্টি থেকে বহিষ্কার করছেনে ? তাঁর সঙ্গে কি আলোচনা করতে ইচ্ছুক নন ?

তোয়াহার উত্তর—সকলের জন্যে আমাদের দুয়ার উন্মুক্ত। একবার কেন, হাজারবার আমরা মতবিরোধ নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হতে রাজি আছি। কেউ আলোচনায় না বসলে—কার সঙ্গে আলোচনা করবো ? না, আমরা কমরেড আবদুল হককে বহিষ্কার করিনি। আমি এখনো আশা করি তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন।

আমার প্রশ্ন—আপনার বিরুদ্ধে একযোগে ভারত, সোভিয়েত রুশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক সুরে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য ?

তোয়াহার উত্তর—এটা খুবই স্বাভাবিক। সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ও সাম্রাজ্যবাদের এটাই চরিত্র।

আমার প্রশ্ন—'বাঙলাদেশে' প্রত্যাবর্তনের পরে তাজউদ্দিন আহমদ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ; এ নিয়ে বিরোধীরা নানা রকম অপপ্রচার করছে কেন ?

তোয়াহার উত্তর—যারা আমার জীবনকে জানে না তারা এরকম বলবেই। বিরোধীরা তাজউদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেই সঠিক উত্তর পাবে বলে মনে করি আমি।

আমার প্রশ্ন—সি. পি. এম. এল.-এর দায়িত্ব এখন কি?

তোয়াহার উত্তর—দায়িত্ব অপরিসীম। আমাদের আরো দু'টো শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে দু'টো হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের সামনে রয়েছে জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন। এ সম্পর্কে পরে আমরা আমাদের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরবো। তবে একটা বিপদের মধ্যে পড়েছি আমরা, তা হলো—ভারতের শোষক-সম্প্রসারণবাদী চক্রের বিরুদ্ধে আমরা যেসব বক্তব্য রাখছি, এদেশের দক্ষিণপন্থী সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা সেটা সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে—হিন্দু মুসলমান বিরোধ হিসেবে। এই মারাত্মক বিপজ্জনক প্রবনতাকে যে কোনো মূল্যে রুখতে হবেই। ভারতের শোষক ও সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠী যেমন ভারতের জনগণের শত্রু, তেমনি আমাদেরও শত্রু। ভারতের মহান জনগণ আমাদের বন্ধু, আমাদের প্রতিবেশী সুহৃদ। এজন্যে আমরা গর্বিত। তাই ভারতের মহান জনগণের সামনেও আমাদের বক্তব্য আছে; আমরা নিশ্চয়ই বলবো—আপনারা আপনাদের সম্প্রসারণবাদী ইন্দিরা গান্ধীর ফ্যাসিষ্ট সরকারকে রুখুন। পূর্ববাঙলা থেকে ফ্যাসিবাদের অশুভ হাতকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করুন। যেমন আমেরিকার সচেতন জনগণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সরকারের হাত গুটিয়ে নেয়ার জন্যে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলো। ভারতের জনগণের কাছে আমরা বলতে চাই—আপনাদের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার পূর্ববাঙলায় নির্বিচারে কমিউনিষ্ট হত্যার মদত জুগিয়ে চলেছে। এই অশুভ তৎপরতাকে আপনারা নিষ্ক্রিয় করুন। এটা আপনাদেরও ঐতিহাসিক দায়িত্ব। আমার বিশ্বাস, ভারতের সংগ্রামী জনগণ আমাদের পাশে দাঁড়াবেন।

আমার প্রশ্ন—আপনি কি মনে করেন যে, ভোটের মাধ্যমে পূর্ববাঙলার জনগণের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মুক্তি আসতে পারে?

তোয়াহার উত্তর—এ প্রশ্নের উত্তর অনেক আগেই আমি দিয়েছি। ভোটের মাধ্যমে পূর্ববাঙলার জনগণের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মুক্তির বদলে সমস্তরকমের সঙ্কট আরো ঘনীভূত হবে দিনকে দিন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই

এবং কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বেই জনগণের প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে। এখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সীমিত সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে শাসকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্ট গোষ্ঠীর হাতে। ক্রমাগত এই সম্পদ আরো কুক্ষিগত হবে। একদিকে সামন্তবাদ টিকে রয়েছে, অন্যদিকে যে কারণে 'বাঙলাদেশ' গঠন করা, অর্থাৎ বাঙালী মুৎসুদ্দিদের পুঁজির বিকাশ লাভ করানোর জন্যে অব্যাহত শোষণ, তারপরেও ভারতের, সোভিয়েতের ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন। ফলে পূর্ববাঙলার জনগণ একেবারে দেউলিয়া হয়ে যাবে। এ দেশ প্রকৃত শ্মশানে পরিণত হবে। দেশে যতই গণতন্ত্রের, সমাজতন্ত্রের ঢাক পেটানো হোক না কেন, যতই ভোট অনুষ্ঠিত হোক না কেন, শ্মশান হওয়ার পথ থেকে পূর্ববাঙলাকে কেউ সরিয়ে আনতে পারবে না। সামনের দিন আসছে আরো ভয়াবহ, আরো সঙ্কটময়। শাসক ও শোষকশ্রেণীও ক্রমাগত দেশকে বিপ্লবের হাত থেকে রোখার জন্যে চালাবে কমিউনিষ্টদের উপরে নির্বিচার আক্রমণ। তাই কমিউনিষ্টদের মধ্যে একতা ও জোটবদ্ধতা এই মুহূর্তে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারের মধ্যে একটা প্রবনতা খুবই লক্ষ্যণীয়। এরা সাচ্চা কমিউনিষ্টদেরকে হই-চই করে গ্রেফতার করছে না। হয় গুম্ করে দিচ্ছে, না হয় ঘটনাস্থলেই গুলি করে হত্যা করছে। এ জন্যে কমিউনিষ্টদের উচিত অত্যন্ত সজাগ হয়ে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাওয়া। কাজ থেকে মুহূর্তের জন্যেও বিরত থাকা নয়। প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। লক্ষ্যণীয় ঘটনা হচ্ছে দেশের বুদ্ধিজীবিরা প্রায় সবাই এখন তাদের মাথা বিক্রি করে দিয়েছে শোষক ও শাসকশ্রেণীর কাছে। সুতরাং এটাও কমিউনিষ্টদের জন্যে একটা বিপদের কারণ। যারা এখনো মাথা অবিক্রিত রেখেছে—তাঁদের পক্ষে প্রকাশ্যে বেঁচে থাকাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সুযোগ মতো পেলে তাঁদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করা হবে। ইতিমধ্যে অনেককেই জীবন দিতে হয়েছে।

তোমরা হয়তো জানো আমাদের দেশের অভ্যন্তরে বর্তমানে তিনটি দেশের চীন বিরোধী গোয়েন্দা সংস্থা ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কে. জি. বি, র‍্যাড ও সি. আই. এ। অর্থাৎ সোভিয়েত রুশিয়া, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই তিনটি দেশের সংস্থা নিষ্ঠুরতা ও কমিউনিষ্ট হত্যার ষড়যন্ত্রের দিক থেকে কারো চেয়ে কেউ খাটো নয়। এরা পূর্ববাঙলাকে আরেকটা ভিয়েতনাম না করে ছাড়বে না।

আমার জিজ্ঞাসা—এ সম্পর্কে আপনি কিছু লিখুন। ১৯৪৭ সন থেকে এ পর্যন্ত প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার সঠিক ইতিহাস কেউ লেখেননি। আমরাও অনেক কিছু জানি না। আপনার কাছে আমরা সেইসব ইতিহাস জানতে চাই। এবং তার প্রয়োজনীয়তাও রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট।

মোহাম্মদ তোয়াহা বললেন—হ্যাঁ, আমি লিখছি। লেখার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছি দীর্ঘদিন থেকেই। কিন্তু একের পর এক কাজের চাপে সময় করে উঠতে পারছি না। এখনো অনেকেই জানে না যে, পূর্ববাঙলা মুসলীম ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা কে? এখনো অনেকেই জানে না যে, বাঙলাভাষার প্রশ্নে ১৯৪৮ সনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সঙ্গে কে বাদানুবাদ করেছিলো? কোত্থেকে ভাষা আন্দোলোনের সূত্রপাত? এসব খোলাখুলিভাবেই আমি আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

আমি বলেছিলাম—আপনার সময় না থাকলে, যদি সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য আমাকে দেন, তাহলে আমিই সেই অজানা, অলিখিত ইতিহাস লেখার দায়িত্ব নিতে পারি।

এখানে বলে রাখছি, সেইসব মূল্যবান ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে আমি আমার এই বই-এর পরবর্তী খণ্ডে বিশদভাবে আলোচনা করবো। অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ এবং ১৯৭১-এর পরবর্তী অধ্যায় তাতে লিপিবদ্ধ করবো।

মোহাম্মদ তোয়াহাকে আমি সর্বশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বিপ্লব অত্যাসন্ন কি না। তিনি হেসে বললেন—"Revolution is inevitable।"

বাইশ

"Revolution is inevitable".

মেহনতি জনগণের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের উদ্‌গাতার এই শাশ্বত উক্তি মোহাম্মদ তোয়াহার মুখে শুনে আমি নিজেও মনে মনে আবৃত্তি করেছিলাম কথাটা।

কারো কারো মনে হতে পারে আমি মোহাম্মদ তোয়াহার ব্যক্তি-কীর্তন করছি। না, ব্যক্তি-কীর্তন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পূর্ববাঙলার বামপন্থী আন্দোলনের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যাকে সামনে আনতে

হয়, তিনি মোহাম্মদ তোয়াহা। যাকে কেন্দ্র করে দেশী ও বিদেশী সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা আজ আক্রমণ চালাচ্ছে একের পর এক। চালাচ্ছে মিথ্যে অপপ্রচার। প্রতিক্রিয়াশীলদের এই আক্রমণ চালানো অবশ্যই অর্থবহ। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক বাঘা-বাঘা কমিউনিষ্টই তাদের মাথা বিক্রি করে রীতিমতো ভোগবিলাসী জীবনযাপন করছেন। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের সারিতে মুষ্টিমেয় যে ক'জন ব্যক্তি এখনো থাই পাহাড়ের মতো অটল ও দৃঢ়— তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা অন্যতম পুরোধা। যিনি নোয়াখালির বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল দখল নিয়ে গরীব ভূমিহীন কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে লাঠি ধরে শোষক জোতদার শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে শত শত বার লড়াই করেছেন। যিনি পূর্ববাঙলার এক ব্যাপক অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে মাটির মতো মিশে রয়েছেন। শহরে এলে শ্রমিক আর গ্রামে গেলে কৃষকদের সঙ্গে যিনি একাকার, এমন ব্যক্তিত্বের মানুষ পূর্ববাঙলায় ক'জন আছেন আমি জানি না, তবে দ্বিতীয় মোহাম্মদ তোয়াহাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছুতেই, একথা নিঃসন্দেহে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি।

মার্কসবাদী লেনিনবাদী একজন সাচ্চা কমিউনিষ্ট নেতার মধ্যে যেসব গুণ আবশ্যক, মোহাম্মদ তোয়াহার মধ্যে তার কোনোটিরই অভাব চোখে পড়েনি। আত্মম্ভরীতাহীন, বাগাড়ম্বরতাহীন, নেহাৎ সাধারণ মানুষ যেমন, মোহাম্মদ তোয়াহাও ঠিক তাই। অর্থাৎ জনগণের একেবারে প্রাণের মানুষ তিনি। জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বক্তৃতার ময়দানে নয়; উৎপাদনের ক্ষেত্রে, লড়াইয়ের ময়দানে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন। এই জন্যেই দেশী ও বিদেশী সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী চক্র মোহাম্মদ তোয়াহার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত। ইন্দিরা, নিকসন, কোসিগিন, মুজিব ভয় করে মোহাম্মদ তোয়াহাকে। এরা জানে, পূর্ববাঙলায় জেল-জুলুম-অত্যাচার-উৎপীড়ন করে আর যাকেই রোখা যাক, মোহাম্মদ তোয়াহাকে রোখা যায় নি, রোখা যাবেও না। তাই গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রতিক্রিয়াশীলরা এখন একযোগে তোয়াহা বিরোধী সঙ্গীতের তান তুলেছে। তারা ভালো করেই জানে, তাদের বাড়াভাতে ছাই ঢেলে দেয়ার একমাত্র ক্ষমতা রাখে সি. পি. এম. এল.। আর তার সুযোগ্য অন্যতম নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা। ১৯৪৮ থেকে সত্তরের দশক অবধি যিনি একইভাবে লড়াই করে চলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু একথাও

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ যুগের নতুন গোয়েবলস্‌রা যতই অপপ্রচার চালাক না কেন, তাতে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এ রকম প্রচেষ্টা পুরানো হয়ে গেছে। সি. আই. এ'র দলিলকে কেন্দ্র করে বহু জলঘোলা করা হয়েছে। তাতে সি. পি. এম. এল. মরেনি, মোহাম্মদ তোয়াহার অপমৃত্যু হয়নি। বরং যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের সেই অপপ্রচারে চিৎকার করেছে, গলাবাজী করেছে, আজ তারা আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত। জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। এটাই ইতিহাসের রায়। এটাই অমোঘ পরিণতি।

যারা একদিন মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গে সি. আই. এ'-এর কাল্পনিক সম্পর্ক আবিষ্কার করে রে-রে করে তেড়ে উঠেছিলো, তারা আজো বেঁচে আছেন। কিন্তু কই, শেখ মুজিব যখন গণশক্তি পত্রিকার কণ্ঠরুদ্ধ করে—মোহাম্মদ তোয়াহার স্ত্রী ও কন্যাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়ে উৎপীড়ন করলো; কই তখন তো তারা কেউ তার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন না?

ধন্য শেখ মুজিব, ধন্য তোয়াহা বিরোধী বিপ্লবীরা। আপনারা প্রতীক্ষা করুন, ইতিহাসের নিরীখে কোথায় আপনাদের ঠাঁই হয়; দেখতে পাবেন সুনিশ্চিত ভাবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই শেখ মুজিব সম্পর্কে নিন্দুকেরা বলতে শুরু করেছে যে, 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারত'-এর ইন্দিরা সরকারের পুরুষ আমলাদের হাতে যেমন করে সেখানকার নারীরা—পশ্চিমবাঙলার অসীমা পোদ্দার, অঞ্জলি সাহা, গীতা দেবীর মতোন হাজারো মেয়েরা লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, বেআব্রু হয়েছে, ঠিক সেই 'বিধি সম্মত' ট্রাডিশন নিয়েই নাকি শেখ মুজিবের সরকার এগিয়ে চলেছেন। মোহাম্মদ তোয়াহার উপরে প্রতিশোধ নিতে না পেরে, তার স্ত্রী কন্যাকে বেইজ্জৎ করাটাই মনে হয়—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার কাণ্ডারী শেখ মুজিব সরকারের বিধিসম্মত ব্যবস্থা বা আচরণ। এরকম অবস্থা 'বাঙলাদেশে' ব্যতিক্রম ঘটনা নয়, প্রায়শই এরকম ভাবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে প্রগতিশীলদের পরিবারের উপরে চালানো হচ্ছে অত্যাচার। কিন্তু প্রগতিশীলদেরও তো ধৈর্যের একটা বাধন আছে? সহ্যের একটা সীমা আছে? কোনো সাচ্চা কমিউনিষ্টই যা সমর্থন করে না; কিন্তু তবুও যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে কোথাও কোথাও পাল্‌টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়? তাহলে তাকে কি দিয়ে ঠেকাবেন 'বাঙলাদেশ' সরকার? কোনো সাচ্চা কমিউনিষ্ট কখনোই কোনো

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের পরিবারের নিরীহ সদস্য ও সদস্যার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। ইতিহাসে এরকম কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু 'বাঙলাদেশে' যা করা হচ্ছে; তাতে সাচ্চা আত্মত্যাগী কমিউনিষ্টরাও শঙ্কিত না হয়ে পারেন না। তাঁদের পরিবারের উপরে যেরকম ভাবে ফ্যাসিবাদী কায়দায় অত্যাচার চলছে; তাতে পাল্টা ব্যবস্থা (বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও) গ্রহণ হওয়ার সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। শাসকশ্রেণীও তাদের অনুসারীদের এই ভবিষ্যতের কথাটুকু নিশ্চয়ই ভুলে গেলে চলে না। 'বাঙলাদেশের চল্‌তি একটা প্রবাদ আছে, ইঁট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। তেমনি অত্যাচারের মাত্রা, যার তার হাতে অস্ত্র দিয়ে নির্বিচার গুণ্ডামি করার সীমা যদি অবশ্যম্ভাবীই অতিক্রম করে, তাহলে রক্তাক্ত ভবিষ্যত তাকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করতে পারে না।

ফ্যাসিবাদীরা নিজেদের চরিত্র ঢেকে রাখতে পারে না। চরিত্রের বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটলে তাকে চেনা যায় না। চরিত্রের বাহ্যিক প্রকাশই বুঝিয়ে দেয়, কে সমাজতন্ত্রী, কে পুঁজিবাদী, কে ফ্যাসিবাদী। তেমনি বামপন্থীরা 'বাঙলাদেশে'র প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কমিউনিষ্ট বিরোধী উগ্র কথা-বার্তাতে (হুমকি) একটুও বিস্মিত নয়। একদিকে বাইরে বাইরে কমিউনিষ্ট দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার গালভরা বুলি আউড়ে—সেই শেখ মুজিবই কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য করে 'লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে তটস্থ করবেন' বলে হুমকিও দিয়েছেন বড়ো গলায় সকলের সামনেই। ৯ই মার্চ ১৯৭৩ সনের আনন্দবাজার পত্রিকাই আমার একথার প্রমান। কিন্তু শেখ মুজিব কি ভুলে গেছেন— দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ফ্যাসিজমের নায়ক হিটলারের শোচনীয় পরিণতির কথা? শেখ মুজিব কি জানেন না যে, উগ্রজাতীয়তাবাদের জোয়ার চিরস্থায়ী নয়? একটা সময়ের জন্যে উগ্রজাতীয়তাবাদ বিকশিত হয় মাত্র। শেখ মুজিব যদি ইতিহাসের পাঠকে বিশ্বাস করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে হুম্‌কির পথ পরিহার করা উচিত। ঠাণ্ডা মাথায় স্বদেশে বিদেশী চক্রের অবাধ লুণ্ঠনকে ঠেকানো উচিত। জানি, তিনি তা করবেন না। করতে পারেনও না। স্বদেশে শোষক ও বিদেশী শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবেই তিনি ক্ষমতাধিষ্ঠিত। তাই এসব আলোচনা করতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে অরণ্যে রোদন করারই পরিণতি মাত্র।

ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজি আর ফরমান আলীরা সমগ্র বিশ্বজনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

দেখিয়ে পূর্ব বাঙলায় যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে; পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত তা ঘৃণার্হ হয়েই সমগ্র বিশ্বের কাছে কলঙ্কময় ইতিহাস হয়ে থাকবে। পূর্ব-বাঙলার মানুষও সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের শোণিত ধারার গন্ধ পাবে, আর পুরুষানুক্রমে থু থু দেবে হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে। যা অন্যায়, তা চিরদিনই অন্যায়। যা সাধু, তা চিরদিনই সাধু। অন্যায়কে যেমন গোয়েবলসীয় প্রচার ধারায় ন্যায় করে তোলা সম্ভব হয়নি; তেমনি ন্যায়কেও গোয়েবল্সীয় অপবাদ দিয়ে অন্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। তেমনি আজকের 'বাঙলাদেশে' কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধিত রেখে, তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়ে, শেখ মুজিব কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যে ভাবে বিষোদ্গার করছেন, নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিচ্ছেন, এবং তারই নিয়োজিত লোক দ্বারা যথেচ্ছ ভাবে প্রগতিশীলদের দেহের রক্ত ঝরাচ্ছেন; তাকে আজকের ক্ষমতাসীন শক্তিমত্ত অবস্থায় যতই তিনি ন্যায় বলে চালাতে চেষ্টা করুন না কেন—ইতিহাস তাকে অন্যায়, অত্যাচার বলেই অভিহিত করবে।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ৭ই মার্চ ১৯৭৩-এর পরবর্তী অধ্যায়গুলো হবে দেশের উন্নতির নামে নির্বিচার শোষণ আর কমিউনিষ্টদের উপরে যথেচ্ছ আক্রমণ। ঢাকায় বসে ৯ই মার্চ ১৯৭৩-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় শেখ মুজিব দম্ভোক্তি পাঠ করে এই ধারণা সুনিশ্চিত হতে বাধ্য। এটা আমার মনগড়া কথা নয়। আওয়ামী লীগ কিম্বা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা নয়। নেটিভ ক্রীশ্চানরা যেমন লণ্ডনে লালবাতির আলোকসজ্জার খবর শুনে উল্লসিত হয়ে ওঠে, তেমনি ঢাকায় শেখ মুজিবের সুকলে আনন্দবাজার-যুগান্তরের গোষ্ঠীও করতালি দিয়ে থাকে। সুতরাং সেই আনন্দবাজার কিম্বা যুগান্তরের পূর্ববাঙলার ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ শেখ মুজিব, আনন্দবাজার, যুগান্তর গোষ্ঠীরা একে অপরের পরিপূরক। আনন্দ-বাজারে ঢেকে চেপে না রেখে মন্তব্য করা হয়েছে যে, শেখ মুজিব বিরোধী শক্তিকে আর বরদাস্ত করবেন না কিছুতেই। এই মন্তব্যের অর্থ কি? অর্থ খুবই পরিস্কার। যারা আজ 'মুজিববাদ' বলে চেঁচাতে শুরু করেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদকেই সংহত শক্তিতে পরিণত করতে চাইছেন। অর্থাৎ হিটলারবাদ, মুসোলিনীবাদ আর তেজোবাদেরই উজ্জীবন ঘটাতে আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছেন পূর্ববাঙলায়।

ভবিষ্যতের আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করেই মোহাম্মদ তোয়াহার মতো

কমিউনিষ্ট নেতা—বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপরে—একবছর আগেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলরা আজ ঐক্যবদ্ধ—সেই ক্ষেত্রে কমিউনিষ্টরা আজ বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে আত্মঘাতী। এক্ষেত্রে যেমন বৃহত্তর ভারতের অবস্থা, তেমনি ক্ষুদ্রতর পূর্ববাঙলার অবস্থা। বামপন্থীদের ভেতরে এই বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য পর্যায়ক্রমে চলতে থাকলে—এর পরিণতি হবে খুবই মারাত্মক। বামপন্থী ঐক্য আজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন। কি ভারত, কি পূর্ববাঙলায়, বামপন্থীরা এখনো বিচ্ছিন্ন থাকলে—ফ্যাসিবাদ তার আক্রমণের থাবা আরো বিস্তৃত করার অবকাশ পাবে। যে থাবার আগ্রাসনে ইতালীর মতো সুবৃহৎ কমিউনিষ্ট পার্টি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। হিটলারের হাতে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়েছিলো জার্মানের কমিউনিষ্টরা। ইতিহাসের এই পাঠ থেকে যদি ভারত, কিম্বা পূর্ববাঙলার বামপন্থীরা সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে, উপযুক্ত ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারে, তাহলে উভয় দেশে—জর্মান বা ইতালির কমিউনিষ্টদের শোচনীয় পরিণতিরই শিকার হতে হবে তাদেরকেও। এ থেকে কিছুতেই তাঁদের পরিত্রাণ নেই। মোহাম্মদ তোয়াহার ভবিষ্যত বাণীই অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হবে।

"Revolution is inevitable" এই শাশ্বত উক্তিকে বাস্তবায়িত করতে হলে, ফ্যাসিবাদকে রুখতে হলে, শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও নেতৃত্বকে সুসংহত করতে হবে। ফ্যাসিবাদকে রুখতে পারে একমাত্র সুসংহত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব। অন্য কোনো শ্রেণীর পক্ষেই ফ্যাসীবাদকে রোখা সম্ভব নয়। এই যুক্তি ঐতিহাসিক; আমার মনগড়া কথা নয়; ভাবাবেগের পরাকাষ্ঠা নয়। তাই মোহাম্মদ তোয়াহার 'প্রগতিশিবির জোট বাধুন' এই আহ্বানেরই পুনরুক্তি করে বলছি—হ্যাঁ, প্রগতি শিবির জোট বাধুন। ঐক্যবদ্ধ হউন। কি পূর্ববাঙলা, কি ভারত, উভয় দেশের প্রগতিশীলদেরই আজ এই আহ্বান সম্পর্কে স্ব-স্ব দেশে সচেতন ও মতদ্বৈধতাহীন প্লাটফরমে এসে দাঁড়াতে হবে।

আমি আগেই বলেছি, শেখ মুজিব আজ একা নন; ইন্দিরা গান্ধীও আজ বন্ধুহীন নন। পাশাপাশি দুই প্রগতিহননের ক্ষমতাসীন প্রতিবেশী সরকার। আর এদের পেছনে একই আন্তর্জাতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে রয়েছে—মস্কো ও ওয়াশিংটন কোম্পানী। পূর্ববাঙলায় যে ভাবে কমিউনিষ্ট বিরোধী স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে এবং নিকট ভবিষ্যতে যার মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত রক্তাক্ত পিচ্ছিলতায় পর্যবসিত হবে, তারই অশুভ থাবা নেমে আসবে ভারতের

প্রগতিশীলদের মাথার উপরে। অন্ততঃ এই বাস্তব পরিস্থিতিটুকুকে যদি উভয় দেশের প্রগতিশীলরা মস্ত বড়ো তত্ত্বাড়ম্বড়তার অহংকারে হেসে একটা মাত্র ফুৎকারে উড়িয়ে দেন; তাহলে সেই অসচেতন ফুৎকারই একদিন ছুরি হয়ে ফিরে আসবে নিজেদের বুকে। তখন আর পরিত্রাণের কোনো পথ থাকবে না। তাই বলছি—এখনো সময় আছে জোট বাধার। এখনো সময় আছে প্রগতি-শক্তিকে সংগঠিত করার। পূর্ব বাঙলায় সি. পি. এম. এল আজ সেই দায়িত্ব নিয়েই নির্বিশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে চলেছে। সামনে তাঁদের জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন। প্রশ্ন আরো অনেক। প্রশ্নের এক একটা পাহাড়। তবুও যে কোনো মূল্যে যে কোনো ত্যাগের মাধ্যমে এই সব প্রশ্নের পাহাড়কে অতিক্রম করতে হবেই। নইলে পূর্ববাঙলায় নেমে আসবে শ্মশানের বিরাণ শূন্যতা। এক সময়ের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সোনার বাঙলায় উর্বর জনপদে বসতি হবে শেয়াল শকুনের। তারই অশুভ সঙ্কেত ধ্বনি আজ পূর্ববাঙলার আকাশে-বাতাসে।

আমি জানি, আমার এই সব বক্তব্যকে সামনে রেখে শোষক শ্রেণী ও তাদের দাসানুদাসেরা ঠাট্টা করবে, রসিকতা করবে, রাগে রক্তচক্ষু নাচাবে। রে-রে করে তেড়ে আসবে আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে। কিন্তু ইতিহাসকে তো স্তব্ধ করে দেয়া যায় না? ইতিহাসকে তো ফাঁসি দেয়া যায় না? ইতিহাসকে তো বুলেট বিদ্ধ করা যায় না? ইতিহাস বেঁচে থাকে—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষেরই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মধ্যে। ইতিহাস তাই অত্যাচারের উর্দ্ধে।

ব্যক্তির সামনে অত্যাচার আসে। শ্রেণী ও তার শোষণ বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন আসবেই। অত্যাচারের মুখোমুখী আমাকেও দাঁড়াতে হয়েছে। এখনো দাঁড়িয়ে আছি। সূর্যোলোকের জগত থেকে আশ্রয় নিয়েছি নক্ষত্রলোকের জগতে। বুকে বুকে উচ্চারিত একটিমাত্র ধ্বনি—আমার প্রাণপ্রিয় পূর্ববাঙলা আমার জন্মভূমি জননী। আর এই উচ্চারিত ধ্বনি বুকে আকড়ে ধরে যদি তার জন্যে বুকের রক্ত ঝরাতে হয়; মনে হবে—হ্যাঁ, সেই হলো পূর্ববাঙলার দুর্ভিক্ষের কবির সব চাইতে বড়ো পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ সম্মান।

তেইশ

রক্তাক্ত পূর্ববাঙলা। বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত-শোষিত-লাঞ্ছিত পূর্ববাঙলা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ পূর্ববাঙলা। শোষণে-শোষণে, পীড়নে-পেষণে ক্ষয় হওয়া হাড় জিরজির সাড়ে সাত কোটি কঙ্কালের দেশ পূর্ববাঙলা। কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনতার দেশ পূর্ববাঙলায় এত রক্তের ঢল বয়ে গেল; কিন্তু মুক্তি এলো না। স্বাধীনতা এলো না। এলো ফ্যাসিবাদ। অশুভ হিটলার-মুসোলিনীর প্রেতাত্মার তীক্ষ্ণ নখের থাবা নেমে এলো পূর্ববাঙলায়।

হিটলার-মুসোলিনীর সেই অশুভ প্রেতাত্মা পূর্ববাঙলায় এখন তৎপর, বিপ্লবী শক্তির 'শোণিত নির্যাস' পান করার জন্যে। কিন্তু একটা কথা জানে না ফ্যাসিবাদের সেই অশুভ প্রেতাত্মা যে, বিপ্লবী শক্তি নিশ্চুপ হয়ে ধড় থেকে আর তাঁদের মাথাটাকে ছিড়ে নিতে দেবে না। মাথা নিতে এলে সম্মুখীন হতে হবে দুর্বার প্রতিরোধের, দুর্বার পাল্টা আঘাতের। এটাই হলো ইতিহাসের রায়।

চিরকালের দাম্ভীক শেখ মুজিব এই ইতিহাসের রায় কি বস্তু তা জানেন না। তার ইতিহাস পাঠ করার প্রয়োজনও কখনো হয়নি। কারণ তিনি চিরকালই পরিচালিত। পরিচালিত হয়েই তিনি 'পরিচালনা'র ডাক দেন। তবু, শেখ মুজিবের হাতে সময় আছে; পূর্ববাঙলাই হোক আর 'বাঙলাদেশ'ই হোক, সেই সোনার স্বদেশকে ভারতের সম্প্রসারণবাদী চক্রের কাছে যেন আর বন্ধক না রাখেন। দেশের আজ বিধ্বস্ত পঙ্গু অর্থনীতি। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি-পরায়ণ গণধিক্কৃত নেতা ও কর্মীরা রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছের মতোনই ভিক্ষুক থেকে রাজা হয়ে গেছে। তাদের ঘরে আজ রাশি রাশি সম্পদ, স্তুপাকার প্রাচুর্য। অন্যদিকে সর্বত্র, গ্রাম গ্রামান্তরে খাদ্যের জন্যে, জ্বালানির জন্যে, সর্বহারা মানুষের যে আর্তনাদ উঠেছে; তা অবিশ্বাস্য বাস্তব। অকল্পনীয় আজ গ্রাম-বাঙলার দুরবস্থা। মানুষ মরছে। না খেয়ে অনাহারে ধুকে ধুকে মানুষ মরছে গ্রাম বাঙলায়। মরছে কৃষকেরা। ক্ষেত মজুরেরা। শতকরা সত্তর-বাহাত্তর জন কৃষকের হাতে জমি নেই। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। রুটি-রুজির সংস্থান নেই। চারিদিকে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' হাহাকার। এই হাহাকারে ভারাক্ত আজ 'বাঙলাদেশের' আকাশ-বাতাস-মৃত্তিকা। নেই চাল, ডাল, তেল,

নুন, জ্বালানি। একসের কেরোসিনের দাম সাতটাকা। একসের চিনির দাম আঠারো টাকা। একটা মোটা কাপড়ের দাম কুড়ি টাকা। একসের জিরের দাম বিয়াল্লিশ টাকা। একসের ডালের দাম ছয় টাকা। একসের চালের দাম, দু'তিন টাকা। এক প্যাকেট ষ্টার সিগারেটের দাম (যার মূল্য ছিল পঁচিশ পয়সা) দু'টাকা। একটা সাধারণ লুঙ্গির দাম পনেরো টাকা। একটা গায়ে মাখা সাবানের দাম আড়াই টাকা। দাম তো আছেই, কিন্তু তাও কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না? যা পাওয়া যায়—তার সবই প্রায় কালোবাজারে ভারতীয় পণ্য। ভারত সরকার 'বাঙলাদেশের' 'বন্ধু'। তাই এই কালোবাজার। তাই আজ 'বাঙলাদেশে' কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে প্রশ্ন—ভারত সরকার কার বন্ধু? 'বাঙলাদেশের' জনগণের; না 'বঙ্গবন্ধুর'? 'বঙ্গবন্ধু' বলেছেন—যারা 'ভারত বাঙলাদেশ মৈত্রী চুক্তি'র বিরুদ্ধাচারণ করছে; তারা 'দেশের শত্রু'; 'তাদের শায়েস্তা করা হবে' বলে শাসাচ্ছেন। ক'জনকে 'বঙ্গবন্ধু' আজ শাসাবেন, কিম্বা শাস্তি দেবেন? একমাত্র আওয়ামী লীগের 'শাপে বর' নেতা ও কর্মী ছাড়া 'বাঙলাদেশের' সাড়ে সাত কোটি মানুষই আজ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। 'বঙ্গবন্ধু' কি তাহলে সাড়ে সাত কোটি মানুষকেই এখন শাস্তি দিতে চান? পারবেন কি তাই তিনি? না, তিনি তা পারবেন না। তিনি পারবেন 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাতে। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তিনি চালাবেন তার ফ্যাসিবাদের স্টীম রোলার। দায়ী করবেন কমিউনিষ্টদেরকেই। আর বেছে বেছে তাঁদের উপরে চালাবেন দমন-পীড়ন, জেল-জুলুম, খুন-জখম যত রকমের অত্যাচারের কৌশল তার হাতে রয়েছে, তার সবটাই তিনি প্রয়োগ করেছেন এবং প্রয়োগ করবেন। কিন্তু তাতে কি তিনি ঠেকাতে পারবেন সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠস্বরকে? ঠেকাতে পেরেছে কি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী 'লৌহ মানব' ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান? ঠেকাতে পেরেছে কি—পাক-সেনবাহিনীর হিটলার নরঘাতক ইয়াহিয়া খান কিম্বা তার দোসর টিক্কা-নিয়াজী-ফরমান আলীরা? গত চব্বিশ বছর ধরেই তো প্রগতিশিবিরের দেশপ্রেমিকদেরকে শুনতে হয়েছে 'দেশদ্রোহী', 'ভারতের অনুচর', 'রাশিয়ার অনুচর', 'চীনের অনুচর', 'সংহতির দুশমন', 'ইসলামের দুশমন' আরো কত রং-বেরংয়ের মিথ্যে অপবাদ।

শেখ মুজিবের কি মনে আছে? মনে না থাকলে—এই বই তার হাতে

পড়লে—তিনি মনে করবার চেষ্টা করবেন। ১৯৫৭ সনে আওয়ামী লীগের রাজত্বকালে পূর্ববাঙলার বিপ্লবী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহাকে—তিনি (শেখ মুজিব) স্বয়ং "হ্যালো মিষ্টার নেহ্‌রু এডেড পার্টি" বলে সম্বোধন করে ঠাট্টা করেছিলেন কি না? অর্থাৎ মোহাম্মদ তোয়াহা তখন কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই সংক্ষেপে N. A. P. অর্থাৎ 'ন্যাপ'। N. A. P.'কেই ঠাট্টা করে শেখ মুজিব 'নেহ্‌রু এডেড পার্টি' বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ 'ন্যাপ' হচ্ছে ভারতের দালাল। কিন্তু আজ যদি 'বঙ্গবন্ধুকে' মোহাম্মদ তোয়াহা জিজ্ঞেস করেন 'আপনি কে'? কি জবাব দেবেন 'বঙ্গবন্ধু'? জবাব দিতে পারেন না। ক'টা প্রশ্নের তিনি জবাব দেবেন? পৃথিবীতে 'গোয়েবল্‌স'দের প্রচারনাকে ধরে ফেলেছে সচেতন জনগণ। নতুন 'গোয়েবল্‌স'রা যতই রং-বেরঙের পোশাক পরে 'কমিউনিষ্ট'দের উপরে দোষ চাপাক না কেন; স্থিতিকালে তা শিশিরবিন্দুর সমান। তাই বলছি আজ যখন ভারতের সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসনে 'বাঙলাদেশের' জনগণ ক্রমশই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে তখন সেই পুরোনো কায়দায় দেশপ্রেমিকদেরকে বলা হচ্ছে 'স্বাধীনতার শত্রু'। কিসের 'স্বাধীনতা'র বড়াই করেন শেখ মুজিব? 'বাঙলাদেশের' জনগণ নতুন করে কোন্‌ 'স্বাধীনতা' পেয়েছে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই 'বাঙলাদেশের' জনগণ 'স্বাধীনতা' পেয়েছে। সে 'স্বাধীনতা' হচ্ছে না খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরার 'স্বাধীনতা'। সে 'স্বাধীনতা' হচ্ছে কথা বলার স্বাধীনতা হারানোর 'স্বাধীনতা'। সে 'স্বাধীনতা' হচ্ছে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে রক্ষা করার ফ্যাসিবাদী খড়্গের নিচে ঘাড় এগিয়ে দেয়ার 'স্বাধীনতা'। সে 'স্বাধীনতা' হচ্ছে তস্করদের সশস্ত্র আক্রমণের ভয়ে গ্রামে গ্রামে বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটাবার 'স্বাধীনতা'। সে 'স্বাধীনতা' হচ্ছে সশস্ত্র গণবিরোধীদের হাতে খুন হওয়ার 'স্বাধীনতা'। সে স্বাধীনতা হচ্ছে 'বাঙলাদেশ' থেকে সোনালী আশ—লক্ষ লক্ষ মন পাট নির্বিবাদে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পাচার হয়ে যাওয়ার 'স্বাধীনতা'। সে 'স্বাধীনতা' হচ্ছে সামন্তবাদ, বাঙালী মুৎসুদ্দী পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে ধুকে-ধুকে অনাহারে-অনিদ্রায় কঙ্কালসার হয়ে সমাধিলাভের নিরঙ্কুশ 'স্বাধীনতা'।

না, আমি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপপ্রচার করার কাজে নিয়োজিত

নই। যারা বলছেন যে, সদ্য 'স্বাধীন' দেশে বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্যে সময় দরকার; জনসাধারণের জীবন-যাত্রার সুষ্ঠ পুনর্বিন্যাসেরও সময় প্রয়োজন। তাদের উদ্দেশ্যে আমার প্রশ্ন: তাহলে যে শেখ মুজিব আজ 'সমাজতন্ত্রের' শ্লোগান দিচ্ছেন, যে আওয়ামী লীগ 'সমাজতন্ত্র' কায়েমের কথা বলছে; কই তাদের অবস্থার উন্নতি কিম্বা পুনর্বিন্যাসের জন্যে তো কোন রকম সময়ের দরকার হলো না? তারা আজ রাতারাতি গাড়ি, বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য আর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মালিক হলো কি করে? আমার জিজ্ঞাসা—শেখ মুজিব কি তদন্ত করাতে পারবেন—কোত্থেকে আওয়ামী লীগের নেতারা ও পরিচিত কর্মীরা হঠাৎ করে এত ধন সম্পত্তির মালিক হলো? না, শেখ মুজিব তাও পারবেন না। পারার কোনো প্রয়োজনও তার নেই। কেননা ওই 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হওয়ার জন্যেই তো আওয়ামী লীগ। জনগণের কল্যাণের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের একাগ্রতা থাকলে তো নতুন করে মওলানা ভাসানী, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখদেরকে আর 'ন্যাপ' গঠন করতে হতো না। তাই আমার প্রশ্ন—শেখ মুজিব একদিন যাঁদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন "নেহ্‌রু এডেড পার্টিম্যান" বলে; সেই মোহাম্মদ তোয়াহা আজও সংগ্রাম করছেন—সমস্ত রকমের শোষণের বিরুদ্ধে। আর শেখ মুজিব? আজ যদি কেউ তার সরকারকে বলে—"ইন্দিরা এডেড গভর্ণমেণ্ট" তাহলে তা কি কুৎসার পর্যায়ে থাকবে? নিশ্চয়ই তা থাকবে না। কুৎসা, সব সময়েই কুৎসা। বাস্তব সব সময়েই বাস্তব। ইতিহাস বড়ো নির্দয়, বড়ো বেশী ক্ষমাহীন। শেখ মুজিব কি জানতেন, কিম্বা ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, একদিন তার সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ —শেল হয়ে নিজেরই বুকে এসে বিধ্‌বে? না প্রতিক্রিয়াশীলরা কখনোই সে রকম ধারণা করে না। তারা ইতিহাস পড়ে, কিন্তু ইতিহাসের পাঠকে ভুলে যায়।

শেখ মুজিবের অবশ্যই ইতিহাস পাঠ করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তিনি নিজেকেই ইতিহাস মনে করেন, তাই ইতিহাস পাঠ করার কোনো প্রয়োজন তার নেই। তাই তো শেখ মুজিবের 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে মোহাম্মদ তোয়াহাকে এখনো 'নিষিদ্ধ' জীবনযাপন করতে হচ্ছে। তাঁর সম্পাদিত 'গণশক্তি'র কণ্ঠরোধ করে, অফিস ভেঙে চুড়ে দিয়ে, তাঁকে আত্মসমর্পণের নোটিশ দেয়া হয়েছে। এই নোটিশ দেয়ার একটাই অর্থ, তা হলো তাঁকে গ্রেফতার করা। কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা। এটা যেমন করেছিল নূরুল আমীন,

যেমন করেছিল আবু হোসেন সরকার, যেমন করেছিল খান আতাউর রহমান যেমন করেছিল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাবর্দী, যেমন করেছিল ইস্কানদার মীর্জা, আয়ুব খান, যেমন করেছিল ইয়াহিয়া, টিক্কা-নিয়াজী-ফরমান আলীরা; তেমনি—'গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার' অনুগত সেবক 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমানের ক্ষমতাসীনকালেও—মোহাম্মদ তোয়াহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে; স্ত্রী ও কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়েছে এবং তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে (যদিও অলিখিত)।

মোহাম্মদ তোয়াহার অপরাধ ছিল 'বাঙলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি'র বিরোধীতা করা। কারণ এটা মৈত্রী চুক্তি হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা 'যৌথ সামরিক চুক্তি' এবং নিঃসন্দেহে তা গণচীনের বিরুদ্ধে দুই দেশের আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করার জন্যেই। এ ব্যাপারে আমি কোল্‌কাতার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার 'হিউম্যানিটি অ্যাণ্ড ইণ্টারেষ্ট' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"...কোনো সময়ই ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো রকম আক্রমনাশঙ্কা করেনি। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, পঁচিশ বছর মেয়াদী চুক্তিটি চীনের সম্ভাব্য তৎপরতারোধেরই বর্মস্বরূপ! সম্প্রতি দিল্লীর এক সেমিনারে লেঃ জেঃ হরবক্‌স্ সিং মনের কথা চেপে রাখতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন যে, ভারত-বাঙলা দেশ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে চীন সামরিক দিক থেকে অসুবিধায় পড়বে। চুক্তির এই অনুকরণ এটাই প্রমাণ করে যে, বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের হস্তক্ষেপ চীন বিরোধী তৎপরতারই সামিল বলে চীন যে আশঙ্কা করেছিল তা খুবই সঙ্গত। অবশ্যি কেবল মাত্র ভারতের দিক থেকে সামরিকভাবে চীনের ভয় করবার কিছু ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে ভারত অন্য একটি 'মৈত্রী চুক্তি'র মারফত রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বসে আছেন। রাশিয়া চীনের ভূখণ্ড গত নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার জন্য আজ উদ্যত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলেই তন্ত্রের স্থলে 'এশীয় যৌথ নিরাপত্তা' কায়েমের এক মহাপরিকল্পনা ফেঁদেছে সে।"

'বঙ্গবন্ধুর' উচিত, ফ্রন্টিয়ার পত্রিকাকেও বেআইনী ঘোষণা করা। কিন্তু 'বাঙলাদেশের' বাইরে কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার ক্ষমতা 'বঙ্গবন্ধুর নেই বলেই তিনি তা পারেননি। অবশ্য তিনি না থাকলেও তার পরিচালিকা 'ভারত রত্ন' ইন্দিরা গান্ধী রয়েছেন। এদিক থেকে 'বঙ্গবন্ধু' আশ্বস্ত। কিন্তু

মোহাম্মদ তোয়াহা সম্পাদিত 'গণশক্তি'র কণ্ঠরোধ করতে একটুও বেগ পেতে হয় নি 'বঙ্গবন্ধুর'। তাই বলেছিলাম 'বাঙলাদেশের' জন্ম হয়েছে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের তৎপরতা নির্মূল করা ও গণচীনের বিরোধীতা করার জন্যেই। সুতরাং শেখ মুজিব সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার সঠিক দায়িত্ব পালন করবেনই, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবু উপসংহারে আমি বলছি; 'বাঙলাদেশে' আবার ঝড় উঠে আসার লক্ষণ ক্রমশই সুস্পষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে। আবার 'বাঙলা দেশের' পথে পথে মিছিল বেরুচ্ছে। সূর্যরোদ্দুরে প্রখর সংগ্রামী জনতার বজ্রমুষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আকাশের দিকে প্রতিবাদে-প্রতিবাদে, অধিকারের দাবীতে দাবীতে জ্বলে উঠছে শহর। জ্বলে উঠছে নগর। জ্বলে উঠছে বন্দর। জ্বলে উঠছে কল-কারখানা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে গ্রাম, ক্ষেত ও খামার। সাড়ে সাতকোটি মানুষ আবারও শুনতে পাচ্ছে রক্তপতাকা হাতে মহাকালের গতি পরিবর্তনের আহ্বান…

ক্ষেতে কিষাণ কলে মজুর
জোট বাঁধো তৈরী হও
আসছে দিন জোর লড়াই
কাস্তে হাতুড়ি শান্ চালাও।